সঞ্চিতা

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত।
চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল ঘোষকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৫। যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৬। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মীরা চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৮। রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), ফণিভূষণ অধিকারী, সরযূবালা অধিকারী, যাদুমতি মুখোপাধ্যায়, আশা অধিকারী ও ভক্তি অধিকারীকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী। রাণু দেবীকে লিখিত
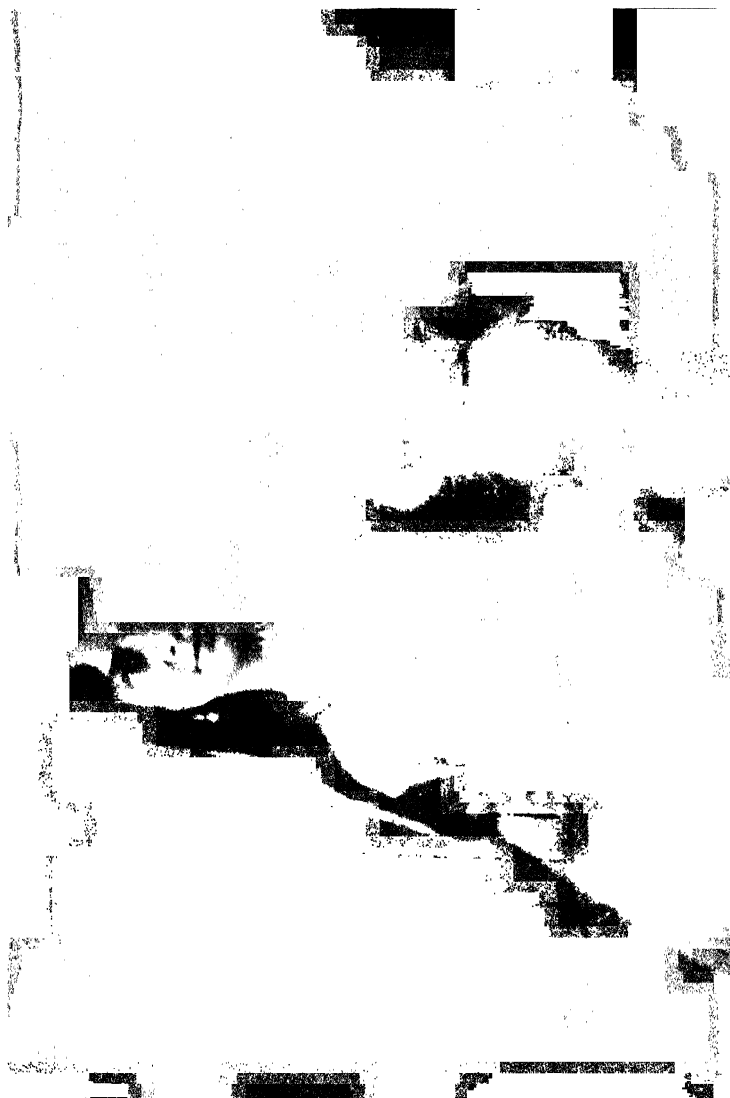
তৃতীয় খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ।। তৃতীয় খণ্ড

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯
সংস্করণ বৈশাখ ১৪১০

সম্পাদনা: শ্রীমতী সাধনা মজুমদার

ISBN-81-7522-341-3 (V.3)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

অক্ষর বিন্যাস বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা ১৭

মুদ্রক দি নিউ অরোরা প্রেস
১৫/১ মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট। কলকাতা ৯

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৬৭টি চিঠি সংকলিত হয়ে অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে চিঠিপত্র ৩ প্রকাশিত হয়। এই বইটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে ১১৫টি চিঠি এবং বিস্তৃত গ্রন্থপরিচয় সহ নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল। বইটি প্রকাশিত হওয়ায় রবীন্দ্র-অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন আশা রাখি।

চিত্রসূচী

১
৭ জুলাই ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা ত কাল অনেক স্রোত ঠেলে সমস্ত দিন নদীর ধারার সঙ্গে লড়াই করে রাত্রে শিলাইদহে এসে পৌঁচেছি।

এখানে কাজকর্ম্মের ভিড় যথেষ্ট। কতদিন থাক্‌তে হবে এখনো ঠিক বল্‌তে পারি নে।

কিন্তু তোমার পড়ার পাছে ব্যাঘাত হয় এই উদ্বেগ আমার মনে আছে। তোমাকে পড়াবার জন্যে অজিতকে বলে এসেছিলুম সেইমত তোমার পড়া চল্‌চে ত? ইংরাজিপাঠ প্রথম ভাগ ত হয়ে গেছে— আর একটা বই তোমার জন্যে ঠিক করে দিয়েছিলুম সেটা বেশ বুঝতে পারচ ত? সে বইটা ইংরাজিপাঠের চেয়ে ভারী নয় বরঞ্চ হালকা।

হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো। বানানটা যাতে ক্রমে বিশুদ্ধ হয় সেই চেষ্টা কোরো।

আর তোমাকে আমার একটি উপদেশ আছে প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ো।

অনেকদিন পরে আমি পদ্মায় এসেছি। আজ সকালে সুন্দর রৌদ্র উঠেছিল। নদী একেবারে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। আজ সকালবেলা যখন বোটের ছাদের উপর বসে উপাসনা করছিলুম আমার মনের ভিতরটি আলোকে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই জল স্থল আকাশের মাঝখানে বসে তাঁকে চিত্তের মধ্যে অনুভব করতেই আমার খুব ভাল লাগ্‌চে। ইচ্ছা করে অনেকদিন ধরে এই রকম এখানে শান্তি ও নির্ম্মলতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু যিনি প্রভু তিনি ছুটি না দিলে

কিছুই হবে না— তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৩শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
৯ জুলাই ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আজ শুনলুম অজিতের চোখ উঠেছে। তাহলে ওর কাছে কোনোমতেই পোড়ো না। চোখ ওঠা ভারী ছোঁয়াচে। এতদিনে সন্তোষ নিশ্চয় ফিরেছে। তুমি তোমার ঠাকুরপোর কাছে পোড়ো— সে খুব যত্ন করে তোমাকে পড়াবে।

আমি এখানকার কাজে কিছুদিনের মত জড়িয়ে পড়েছি। এখানে বোটে করে দুই এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে— তার পর এখানকার কাজ শেষ হলে কালিগ্রামে যাব। থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্চে, থেকে থেকে রোদ উঠ্‌চে। নদীর জল প্রতিদিনই বাড়চে। তুমি এখন বুঝি নীচের বাংলায় আছ? হেমলতার কাছে বাংলা কিছু কিছু পড়চ কি?

উমাচরণ এখানে ইলিষ মাছ খাবার লোভে এমন নৃত্য করতে করতে এল কিন্তু তার কপালগুণে এবার ইলিষ মাছের জাল এখানে পড়ে নি। রথীর জন্যে ছোট ছোট পুকুরের পোনা মাছ দিয়ে যায়— তাতে ওর সুবিধা হয় না। ও সেই জন্যে কাছারিতে গিয়ে খেয়ে আসে। কালিগ্রামে

গেলে ইলিয মাছ পাবে না বটে কিন্তু ওর খাবার দুঃখ সেখানে ঘুচে যাবে।

লাবণ্যর কি রকম চল্‌চে? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৫শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
[অগস্ট ১৯১০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠি দুখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি।

আমরা এখন ঠিক শিলাইদহে নেই। নানা কাজের হাঙ্গামায় বোটে করে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি। সমস্ত দিন প্রজা ও আমলাদের দরবারে কিছু মাত্র সময় পাই নি। এইমাত্র স্নান করে এসে তোমাকে তাড়াতাড়ি দু লাইন লেখ্‌বার জন্যে বসে গেছি। আবার আমাদের খাওয়া হয়ে গেলেই লোকজন আস্‌তে আরম্ভ করবে— তার পরে রাত্রি পর্য্যন্ত আর সময় পাওয়া যাবে না।

এখানকার কাজ শেষ করে তার পরে কালিগ্রাম যেতে হবে— তার পরে বোলপুরে ফেরবার ছুটি পাব। ফিরে গিয়ে দেখব বৌমা ইংরিজিতে খুব পণ্ডিত হয়ে উঠেছে— কিন্তু আর যাই হোক্ ঠাকুরপোর কাছে বিশেষ্য বিশেষণ নিশ্চয়ই তেমন এগচ্চে না।

কিছুই হবে না— তিনি এখনো আমার হাতে কাজ রেখে দিয়েছেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৩শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৯ জুলাই ১৯১০

ওঁ

শিলাইদা

নদিয়া

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আজ শুনলুম অজিতের চোখ উঠেছে। তাহলে ওর কাছে কোনোমতেই পোড়ো না। চোখ ওঠা ভারী ছোঁয়াচে। এতদিনে সন্তোষ নিশ্চয় ফিরেছে। তুমি তোমার ঠাকুরপোর কাছে পোড়ো— সে খুব যত্ন করে তোমাকে পড়াবে।

আমি এখানকার কাজে কিছুদিনের মত জড়িয়ে পড়েছি। এখানে বোটে করে দুই এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে— তার পর এখানকার কাজ শেষ হলে কালিগ্রামে যাব। থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্চে, থেকে থেকে রোদ উঠ্‌চে। নদীর জল প্রতিদিনই বাড়চে। তুমি এখন বুঝি নীচের বাংলায় আছ? হেমলতার কাছে বাংলা কিছু কিছু পড়চ কি?

উমাচরণ এখানে ইলিষ মাছ খাবার লোভে এমন নৃত্য করতে করতে এল কিন্তু তার কপালগুণে এবার ইলিষ মাছের জাল এখানে পড়ে নি। রথীর জন্যে ছোট ছোট পুকুরের পোনা মাছ দিয়ে যায়— তাতে ওর সুবিধা হয় না। ও সেই জন্যে কাছারিতে গিয়ে খেয়ে আসে। কালিগ্রামে

গেলে ইলিয মাছ পাবে না বটে কিন্তু ওর খাবার দুঃখ সেখানে ঘুচে যাবে।

লাবণ্যর কি রকম চল্‌চে? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ২৫শে আযাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
[অগস্ট ১৯১০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠি দুখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি।

আমরা এখন ঠিক শিলাইদহে নেই। নানা কাজের হাঙ্গামায় বোটে করে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি। সমস্ত দিন প্রজা ও আমলাদের দরবারে কিছু মাত্র সময় পাই নি। এইমাত্র স্নান করে এসে তোমাকে তাড়াতাড়ি দু লাইন লেখ্‌বার জন্যে বসে গেছি। আবার আমাদের খাওয়া হয়ে গেলেই লোকজন আস্‌তে আরম্ভ করবে— তার পরে রাত্রি পর্য্যন্ত আর সময় পাওয়া যাবে না।

এখানকার কাজ শেষ করে তার পরে কালিগ্রাম যেতে হবে— তার পরে বোলপুরে ফেরবার ছুটি পাব। ফিরে গিয়ে দেখব বৌমা ইংরিজিতে খুব পণ্ডিত হয়ে উঠেছে— কিন্তু আর যাই হোক্ ঠাকুরপোর কাছে বিশেষ্য বিশেষণ নিশ্চয়ই তেমন এগচ্চে না।

কলকাতা থেকে সন্তোষের চিঠি পেয়েছি সে সেখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছে। এতদিনে সম্ভবতঃ সুস্থ হয়ে আবার বোলপুরে ফিরেছে।

এবার কলকাতায় গিয়ে সন্তোষের মার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল— তিনি মনে বড়ই আঘাত পেয়েছেন। ভোলার মৃত্যুতে ত পেয়েইছেন— তার উপর সন্তোষ-হিরণের খবর পেয়ে তাঁর পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর দ্বারা যে বিচ্ছেদ ঘটে সে একরকম সহ্য হয় কিন্তু বেঁচে থেকেও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হলে মার পক্ষে তা সহ্য করা বড় কঠিন। বিশেষতঃ ছেলেদের মধ্যে এখন সন্তোষ ছাড়া ওঁর আর ত কেউ আশ্রয় নেই— হঠাৎ কোথা থেকে দুদিনের জন্যে হিরণের মত এক মেয়ে এসে মায়ের সেই চিরকালের দাবী একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলে এর মত নিদারুণ আর কি হতে পারে। তাঁর অবস্থা দেখে আমি বড় বেদনাবোধ করেছি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
২৩ অগস্ট ১৯১০

ওঁ

পতিসর
আত্রাই।

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা কাল রাত্রে পতিসর পৌঁচেছি। এখানে এসেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

আমি যে ঠিক কাজের তাগিদে এসেছি সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

লোকজনের মধ্যে যখন জড়িয়ে থাকি তখন ছোট বড় নানা বন্ধন চারদিকে ফাঁস লাগায়— নানা আবর্জ্জনা জমে ওঠে— দৃষ্টি আবৃত এবং বোধশক্তি অসাড় হয়ে পড়ে— তখন কোথাও পালিয়ে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যিনি অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, যিনি চির জীবনের প্রিয়তম, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে সমর্পণ করে দেবার জন্যে মনের মধ্যে এমন কান্না ওঠে যে ইচ্ছা করে বহু দূরে বহু দীর্ঘকালের জন্যে কোথাও চলে যাই। যতই নানাদিকে নানা কথায় নানা কাজে মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই গভীর বেদনার সঙ্গে সুস্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি তিনি ছাড়া আর কিছুতেই আমার স্থিতি নেই তৃপ্তি নেই— তাঁকে ছাড়া আমার একেবারেই চল্‌বে না। কবে তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করবেন জানি নে— কিন্তু জোড় হাত করে কোনো প্রশান্ত পবিত্র নির্জ্জন স্থানে তাঁর দিকে তাকিয়ে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে— কেবল বলি— মা মা হিংসীঃ— আমাকে আর আঘাত কোরো না— আর মেরো না, আর মেরো না— ভাল মন্দর দ্বন্দ্বের মাঝখানে রেখে আমাকে কেবলি চারদিক থেকে এমন ধাক্কা খেতে দিয়ো না। জীবন যখন দ্বিধাবর্জ্জিত বাসনা-মুক্ত পবিত্র হয়ে উঠ্‌বে— তখন লোকালয়েই থাকি আর নির্জ্জনেই থাকি সর্ব্বত্রই সেই পবিত্রতার সাগরের মধ্যে সেই প্রেমের অতলস্পর্শ সমুদ্রের মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাক্‌তে পারব। দুঃস্বপ্ন-জালজড়িত এই অন্ধকার রাত্রির অবসানে সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতের জন্যে মন অহরহ অপেক্ষা করচে— সকল সুখদুঃখ, সকল গোলমাল, সকল আত্মবিস্মৃতির মধ্যেও তার সেই একটিমাত্র সত্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চিরদিনই জীবনকে এত মায়ায় এত মিথ্যায় জড়াতে দিয়েছি যে, তার জাল কাটাতে আজ প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে। তা হোক্‌, তবু কাটাতেই হবে— সংসারের, বিষয়ের, বাসনার সমস্ত গ্রন্থি একটি একটি করে খুলে তবে যেন আমার এই জীবনের ব্রত সাঙ্গ হয়— স্নান করে ধৌত হয়ে নির্ম্মল বসন পরে শুচি ও সুন্দর হয়ে যেন এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর

কাছে যেতে পারি— ঈশ্বর সেই দয়া করুন— আর সমস্ত চাওয়া যেন একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও আমার সংসারের মধ্যেও সেই পবিত্র পরম পুরুষের আবির্ভাব বাধামুক্ত হয়ে প্রকাশ পাক্ এই আমার অন্তরের একান্ত কামনা। তোমার মনের মধ্যে সেই অমল সৌন্দর্য্যটি আছে— যখন তাঁর জ্যোতি সেখানে জ্বলে উঠ্‌বে— তখন তোমার প্রকৃতির স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে থেকে সেই আলো খুব উজ্জ্বল ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবে আমার তাতে সন্দেহ নেই— তুমিই আমার ঘরে তোমার নির্ম্মল হস্তে পুণ্যপ্রদীপটি জ্বালাবার জন্যে এসেছ— আমার সংসারকে তুমি তোমার পবিত্র জীবনের দ্বারা দেবমন্দির করে তুল্‌বে এই আশা প্রতিদিনই আমার মনে প্রবল হয়ে উঠ্‌চে। ঈশ্বর তোমার ঘরকে তাঁরই ঘর করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫
[অক্টোবর ১৯১০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম।

আমাদের অভিনয়ের দিন কাছে আস্‌চে অথচ আজ পর্য্যন্ত আমার ভাল মুখস্থ হয় নি বলে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। মুখস্থ হবে কি করে? দিন রাত নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করতে করতেই দিন কেটে যায়। কলকাতা থেকে লোক এখান পর্য্যন্ত এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌চে।

তোমার ইংরিজি বই নিয়ে অভিধান দেখে বাংলা করবার চেষ্টা করতে থেকো— যেখানে বুঝতে বিশেষ বাধবে তোমার বাবার কাছে বুঝিয়ে নিয়ো।

রথীর চিঠি পেয়েছি। সে বেশ মজা করে ষ্টীমলাঞ্চে চড়ে চলে গেল— আমার ভারি লোভ হচ্চে। যদি এই অভিনয়ের উৎপাত না থাক্‌তো তাহলে দিব্যি মনের আনন্দে চলে যেতুম। দেখি, শিলাইদহে গিয়ে তার পরে ষ্টীমারে করে যদি কোথাও বেরিয়ে পড়ার সুবিধা হয়।

এখানে খুব ঘনঘটা করে এসেছে। এক একবার এলোমেলো বাতাস দিচ্চে— বৃষ্টি হচ্চে— থেকে থেকে ভীষণ রবে বজ্রধ্বনিও শোনা যাচ্চে। ভাবছিলুম নদীতে যদি রথী এই দুর্য্যোগ পেয়ে থাকে তাহলে মুষ্কিলে পড়বে— কিন্তু তা হয় নি— সে ত লিখ্‌চে বৃষ্টি পথে পায় নি।

প্রভাতের মার শরীর বড়ই খারাপ। তিনি শান্তিনিকেতনেই আছেন। তাঁকে নিয়ে দু তিন রাত জাগ্‌তে হয়েছে।

মেয়েদের অভিনয়ের উৎসাহ খুব বেড়ে গেছে। তারা 'সতী' অভিনয় করবে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে তাদের দেখিয়ে দেওয়া ঘটে উঠ্‌চেনা।

তোমাদের বাড়ির নম্বরটা দিলে না কেন? আমার ত মনে নেই।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি রবিবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

[ডিসেম্বর ১৯১০]

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। মিস্ বুর্ডেট্‌কে ত শুধু ভাল লাগ্‌লে হবে না, তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি যদি শেলাই জানেন হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শেলাই শিখে নিয়ো— কেবল সৌখীন শেলাই নয়— জামা কাপড় প্রভৃতি কাট্‌তে শেখা চাই। সেলাই শেখা উপলক্ষ্যে খানিকটা ইংরাজি কথা কওয়ার অভ্যাস সুরু হবে। তুমি যতটুকু পার ওঁর সঙ্গে কইতে বল্‌তে চেষ্টা কোরো, লজ্জা কোরো না। ওঁর খাওয়া দাওয়ার কি রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছ? দুপুর বেলায় কি খেতে দাও? দেখো ঠিক সময়মত খাওয়ার যেন ব্যাঘাত না হয়— ওরা সকল কাজেই সময় রক্ষা করে চলে আর আমরা ঠিক তার উল্টো। রথীকে বোলো ওঁকে অল্প অল্প করে বাংলা শেখানো যেন ধরিয়ে দেয়— আপাতত বাংলা অক্ষর ও তার উচ্চারণ শিখ্‌তে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মীরা ওঁকে বাংলা শেখাবার ভার নিতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের কি রকম কাটে? ওঁর সঙ্গে তোমাদের খেলা চলে কি? আমি যখন যাব তখন দেখব তোমাদের খুব ইংরিজি কথা হুহুঃ শব্দে চলচে। Christmas এর দিনে আগে থাকতে মনে করে ওঁর জন্যে কিছু card আনিয়ে দিয়ো এবং সেদিন একটু বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ কোরো— বোটে করে নদীর চরে গিয়ে যা হয় একটা কিছু হুটোপাটি কোরো— রথীকে বোলো থ্যাকারদের ওখান থেকে দুই একটা Christmas নম্বর ছবির কাগজটাগজ আনিয়ে দিতে এবং কলকাতা থেকে একটা সময়মত ক্রিষ্টমাস্ কেক্ আনাতে। উনি ভাল বাজাতে পারেন এবং বাজাতে ভাল বাসেন— রথীর

কর্ত্তব্য হবে একটা পিয়ানো আনিয়ে নিতে— এই সময়টায় কলকাতায় Season। সুতরাং সুবিধা দামে পিয়ানো এখন পাওয়া শক্ত— আর তিন-চার মাস পরে তবে দাম কমে যাবে। যা হোক্ উনি যখন ওখানে অমন এক্‌লা পড়েছেন তখন ওঁর চিত্তবিনোদনের একটা বিশেষ উপায় করে না দিলে কষ্ট দেওয়া হবে।

দ্বিপুকে পাটালি পাঠাতে রথীকে বলেছিলুম কই এ পর্য্যন্ত তার ত কোনো লক্ষণ দেখ্‌চিনে— দ্বিপু ঐ পাটালির পথ চেয়ে আছে।

রথীর বাগান চাষবাস কি রকম চলচে? মীরার মামাশ্বশুরের বাগানের কি খবর? সেখান থেকে শালগম গাজরের আমদানি হচ্চে বোধ হয়।

নগেনের আসবার কোনো খবর পেয়েছ কি?

রথীকে বোলো পিসিমাকে আমি অন্যত্র যেতে চিঠি লিখে দিয়েছি কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। তোমাদের শরীর ত ভাল আছে?

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

[২১ মার্চ ১৯১১]

ওঁ

বৌমা

এ কয়দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে ছিলুম। রাজা অভিনয়ের আয়োজন করতে কিছুদিন থেকে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তার পরে অভিনয় দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে অনেক অতিথি এখানে

এসেছিলেন— তাঁদের আতিথ্য নিয়েও আমার আর কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না। মেয়ে আটজন ও পুরুষ নয় দশ জন এসেছিলেন। মেয়েরা হেমলতা বৌমার বাড়িতে ছিলেন, পুরুষেরা শান্তিনিকেতনের দোতলায়। উমাচরণ নেই— ঘুরনকে দিয়ে এ সব কাজ ভাল চলেনা। যা হোক্ একরকম করে হয়ে গেল। পর্শু অভিনয় হতে রাত দুপুর হয়েছিল— তার পরে কাল রাত্রে মেয়েরা অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা ব্যাপার নিয়ে আমাদের জাগিয়ে রেখেছিল। আজ ভোর রাত্রে তাঁরা সব চলে গেলেন। আমাদের অভিনয়ে সুধীরঞ্জন সেজেছিল রাণী— বেশ ভাল করে তাকে সাজানো গিয়েছিল— অন্তত তার চেহারাটা সকলের ভাল লেগেছিল— তার অভিনয়ও মন্দ হয় নি। মোটের উপর লোকদের ভালই লেগেছে। কিন্তু আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। তোমরা সব তোমাদের ঠাকুরঝি ঠাকুরজামাইদের নিয়ে বেশ আনন্দে আছ। আমি দেখ্‌ছি আমি চলে এসেছি তবু তোমার মামাশ্বশুরের নিষ্কৃতি নেই। ঐ বাঙালটিকে দেখ্‌লেই লোকের ঠাট্টা করবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। বেয়ান যে রকম আবীরটা খেলেছেন, আমি থাক্‌লে বড় সহজে ছাড়া পেতুম না দেখচি— কালী মাখাবার লোক তাঁর আরো একটি বাড়ত।

এখানে জ্ঞান বেশ ভালই আছে। বোধ হচ্চে তার ভাল লেগে গেছে— সে এখন ছেলেদের মধ্যেই তার আড্ডা করে নিয়েছে।

তুমি Arabian Nights পড়চ— বেশ ভাল। ওটা পড়তে তোমার ভাল লাগ্‌বে— এই রকম পড়তে পড়তেই তোমার ইংরেজি শেখা হয়ে যাবে। মেমের জঞ্জাল ঘুচে গিয়ে বোধহয় আরাম পেয়েছ।

আমি সম্ভবত আস্‌চে রবি কিম্বা সোমবারে দু চার দিনের জন্যে কলকাতায় যাব একটু কাজ আছে। তোমাদের আলু এবং টোমাটো আমাকে মিথ্যা পাঠিয়ে দেবে— যখন ছুটির সময় তোমাদের কাছে যাব তখন খাওয়া যাবে।

শান্তির পড়াশুনা নিয়মমত চল্‌চে ত? তার শরীর ওখানে কেমন আছে? শান্তিকে বাড়িতে রেখে না পড়িয়ে এবার ছুটির পরে তাকে এখানেই পড়তে পাঠান উচিত হবে।

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানিয়ো।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

১৪ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তুমি আমার নববর্ষের অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। যিনি সকলের বড় তাঁকে তুমি সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাও এই আমার একান্ত মনের কামনা। মানব জীবনকে খুব মহৎ করে জান— নিজের সুখ স্বার্থ সাধন কখনই তার লক্ষ্য নয় এ কথা সমস্ত ভোগসুখের মধ্যে মনে রেখো— সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে জেনো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদেও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখ— প্রতিদিনের সুখ দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো— প্রত্যহই যদি তাঁর কাছে যাবার পথ সহজ করে না রাখ তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেখানে যেতে পারবেনা। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই যেন তোমার মনে পড়ে যে তিনিই আছেন তোমার চিরজীবনের সহায় সুহৃদ্‌ পিতামাতা— তাঁরি কর্ম্ম বলে সংসারের কর্ম্ম করবে— এবং এ জীবনে যাদের সঙ্গে তোমার স্নেহ প্রেমের

সম্বন্ধ হয়েছে তাদের সেই সম্বন্ধ তাঁরই প্রেম উৎসের সুধারসে মধুর ও সুন্দর হয়ে রয়েছে এই কথাটি খুব গভীর করে মনের মধ্যে স্মরণ করবে। তাঁর নাম স্মরণের মধ্যে তোমার মন প্রতিদিন স্নান করুক— সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের চিন্তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যে মনকে ডুবিয়ে প্রতিদিনের সমস্ত ধূলা ও দাহ থেকে আপনাকে নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ করে তোলো। তিনি তোমার মনে আছেন, বাইরে আছেন, দিনরাত্রি তিনি তোমাকে স্পর্শ করে আছেন— তিনি যেমন নিবিড়ভাবে অহরহ তোমার কাছে আছেন এমন আর কেউ না— খুব করে সেই কথাটি মনে জেনে তাঁকে প্রণাম করে সকলের এবং নিজের মঙ্গল তাঁর কাছে প্রার্থনা কোরো।

আমাদের এখানে কাল পূর্ণিমা রাত্রে মাঠের মধ্যে বর্ষশেষের এবং আজ খুব ভোর রাত্রে মন্দিরে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল— সকলেই আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি।

তোমরা আবার শিলাইদহে কবে ফিরে যাবে? বড়দাদাকে নিয়ে হেমলতা বৌমা বোধহয় পর্শু কলকাতা হয়ে পুরীতে চলে যাবেন। ইতি
১লা বৈশাখ ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯
৭ সেপ্টেম্বর ১৯১১

ওঁ

বৌমা, আজ মেজবোঠানকে লিখে দেব পঞ্চামৃত প্রভৃতি উৎপাত করবার কোনো দরকার নেই। মিছামিছি ওঁকে এত খরচ করিয়ে কি হবে।

রথীকে কাল লিখেছি যে যদি জাহাজেই চড়তে হয় তাহলে ২২ দিনের জন্যে সমুদ্রের ধাক্কা খেয়ে এসে লাভ কি। একেবারে জাপানে গিয়ে কিছু দেখেশুনে এলে তবু কষ্ট ও খরচপত্র সার্থক হয়। কি বল বৌমা! যে দেশে মানুষ নেই কেবল আনারস আছে সে দেশে গিয়ে কি হবে? রথীকে বোলো কলম্বো দিয়ে একটা জাপানী ষ্টীমার জাপানে যায় তাতে গেলে বেশ আরামে যাওয়া যাবে— হয় ত সস্তাও হতে পারে। Family Party যদি একসঙ্গে যায় তাহলে অনেকটা concession পাওয়া যেতে পারে। সেটার খোঁজ নিতে পারে। তাহলে তোমার অনেক দেশ দেখা হবে— আর আমারও তিনমাস লম্বা ছুটিতে অনেকটা বিশ্রাম হতে পারবে। আর যদি তুমি ভাল মনে কর তাহলে Italian Steamerএ করে ইটালীর কোনো একটা মনোহর জায়গায় মাস দেড়েক বেশ নিভৃতে কাটিয়ে আসা অসম্ভব নয়। সেখানকার জলবায়ু খুব বেশি ঠাণ্ডা নয়— মানুষের নাক খাঁদা ও চোখ বাঁকা নয়, ভাল আঙুর ও সুখাদ্য ফল বিস্তর পাওয়া যায়। জাপানে রথীর কৃষিবিদ্যা আলোচনার সুবিধা আছে বলে জাপানের কথাই আমার মনে হয়েছিল। যা হোক্ তুমি তোমার ঠাকুর-জামাইকে তোমার দলে টেনে নিয়ে হিসাবপত্র কষে যেটা ভাল মনে কর সেইটে ঠিক করে আমাকে লিখো। সিঙ্গাপুরে যেতে হলে ডাঙ্গার সম্পর্ক অত্যন্তই অল্প হয়— কেবলি সমুদ্র— সবসুদ্ধ পাঁচ ছয় দিনের বেশি ডাঙ্গা পাওয়া যাবেনা— তাতে নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগ্‌বে। তীর থেকে সমুদ্র যতটা ভাল লাগে সমুদ্রের ভিতরে ততটা নয়— আমরা ত তিমি মৎস্য কিম্বা জলহস্তী নই সেইজন্যে ডাঙ্গার জন্যে নাড়িতে সর্ব্বদাই টান পড়ে।

রথীকে বোলো Encyclopaediaর যে বইখানা ওখানে গেছে সেটা কলকাতায় আসবার সময় হাতে করে নিয়ে এলেই হবে। তোমাদের ওখানে পোঁতবার জন্যে অনেক বিলাতী নিমের চারা তুলিয়েছি কিন্তু

কলকাতায় পাঠাবার লোক আজও পেলুমনা। ওদিকে বর্ষা গেলে বোধ হয় কোনো কাজে লাগ্‌বেনা।

ক দিন অর্শ বেড়ে আমাকে কিছু দুর্বল করেছে— ছুটির সময় এ সব ক্ষতির শোধ নেওয়া যাবে। ইতি ২১শে ভাদ্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[সেপ্টেম্বর ১৯১১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমরা ভয় করচ আমার বুঝি ভ্রমণে যাওয়ার মত উল্টে গেছে— একেবারেই না— ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বার আবেগ আমার আরো বেড়ে যাচ্চে— আমি দুই এক মাসের জন্যে কোথাও খুচ্‌রো রকমের বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করি নে— পৃথিবীর কাছে বেশ ভাল রকমে বিদায় নেবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। কলকাতায় গিয়ে দেখব যদি বাধা কাটাতে পারি তাহলে আমি দূরেই বেরিয়ে পড়ব।

এখানে শারদোৎসব অভিনয়ের আয়োজন চলচে। আমাকে সবাই মিলে সন্যাসী [সন্ন্যাসী] সাজাচ্চে। কলকাতা থেকে এবারেও মেয়ের দল সব আস্‌চেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

[সেপ্টেম্বর ১৯১১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আচ্ছা বেশ— তোমরাও যদি ছুটিতে সিঙ্গাপুরে যাও তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে ঘুরে আস্‌ব। দিনুও যাবার জন্যে ক্ষেপেছে— তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। সাবধানে রাখা যাবে— কোনো উৎপাত করতে দেওয়া হবে না। আজকাল সে অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।

এখন cycloneএর সময় কি নয়? যদি সমুদ্রের মাঝখানে ঝড়ের দর্শন পাওয়া যায় তাহলে সমুদ্রটাকে খুব মনোরম বলে মনে হবে না।

যদি East Coast Railway দিয়ে কলম্বো যাতায়াত করতে ইচ্ছা কর সে একটা মন্দ trip হয় না। পূজোর সময় concession পাওয়া যায়। সেখানে Candy শুনেছি চমৎকার জায়গা।

যাই হোক্ সিঙাপুরই যদি তোমাদের পছন্দ হয় আমার তাতে আপত্তি নেই। পাছে জলপথে সেই একই রাস্তা দিয়ে ফেরবার সময় তোমাদের বিরক্ত ধরে এই একটা আশঙ্কা আছে।

যেখানেই যাও রথীকে বোলো Cookদের সঙ্গে সমস্ত হোটেল খরচপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যেন পরামর্শ করে রাখে।

মীরা ভাল আছে তাই আর কলকাতায় গেলুম না। যেতে হলে আমার কষ্ট হত। শরীর ত তেমন ভাল নেই— এখানকার রেলে যাত্রার সময়টাও বড় বিশ্রী।

বড়দিদি বেশ ভাল লাগ্‌চে শুনে খুসি হলুম। তোমার পড়াশুনো এখন কি রকম চলচে? নগেন অনেকদিন অনুপস্থিত বলে বোধ হয় তোমার ক্লাস বন্ধ। সেই Astronomyর বই কি এখন রথী তোমাকে

পড়ে শোনায়? জাহাজে যাবার সময় তোমাকে অনেক বই পড়ে শোনানো যাবে। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

[১৯১১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা— তোমরা ত বেশ নদীতে বেড়িয়ে এলে— আমরা এখানে মাঠের মধ্যে স্থির হয়ে বসে আছি। আগে যখন কুঠি বাড়ি তৈরি হয় নি তখন আমি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বোটে কাটিয়ে দিতুম ভারি ভাল লাগ্‌ত। এখনো এক একবার সেই রকম করে নদীর চরে দিন কাটাতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে আর হয়ে উঠ্‌বে না।

আজকাল খুব করে Science পড়চ বুঝি। Story of the Heavens বইখানা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন মুগ্ধ হয়েছিলুম— ওটা খুব চমৎকার। এবার যখন তোমরা কোনো সময়ে বোলপুরে আস্‌বে তখন এখানকার বড় দুরবীন দিয়ে তোমাদের চন্দ্র ও গ্রহদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে। রথীকে বলে এই রকম একটা দূরবীন কিনিয়ে নেও না কেন? আমাদের এখানে যেটা আছে তার দাম ২৫০ টাকা— কিন্তু পঞ্চাশ ষাট টাকায় ওদের ওখানেই ছোট সাইজের দূরবীন পাওয়া যায় তাতেও বেশ কাজ চলে।

সন্তোষ আজকাল একলা। ওর মা এবং স্ত্রী কেউ এখানে নেই। ও গোরু মহিষ নিয়ে দিনযাপন করচে।

আমি নগেন্দ্র শ্যালকের দেশ থেকে একজন নাপিত চাকর আনিয়ে তাকে তৈরি করে নিচ্চি। তার বুদ্ধি বেশ আছে— হাতের কাজও বোধ হয় ভাল পারে, কামাতে জানে, শুনেছি ঘড়ি মেরামৎ করতে পারে। তোমাদের চাকরের অভাব আছে বলেই আমি একে আনিয়েছি। আমি যখন তোমাদের কাছে যাব একে নিয়ে গিয়ে রেখে আস্‌ব।

নগেনের সেই প্রিয়পাত্র পাড়ার ছেলেরা এক একদিন সন্ধ্যাবেলা এসে কি গান শুনিয়ে যায়? আমার এখানেও সে রকম গাইয়ে খুঁজ্‌লে পাওয়া যায়— তারা গলা ছেড়ে গান গাইতেও ছাড়ে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩
[অক্টোবর ১৯১৪]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি তোমাদের সকলকে অনেক দুঃখ দিয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। আমার মনের মধ্যে কোথা থেকে একটা ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা থাক্‌বে না। তোমরা যখন ফিরে আস্‌বে তখন দেখ্‌তে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি। আমার সেই স্থানটি হচ্চে বিশ্বের বাতায়নে, সংসারের গুহার মধ্যে নয়। তোমাদের সংসারকে

তোমরা নিজের জীবন দিয়ে এবং পূজা দিয়ে গড়ে তুল্‌বে— আমি সন্ধ্যার আলোকে নিজের নির্জ্জন বাতায়নে বসে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব।

আমাকে তোমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকবে না— ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। সংসার যাত্রার যা কিছু উপকরণ সে আমি সমস্ত তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার সঙ্গে তোমাদের বিনা প্রয়োজনের সম্বন্ধ— সেই সম্বন্ধের টানে তোমরা আমার কাছে যখন আসবে তখন হয় ত আমি তোমাদের কাজে লাগ্‌ব।

তোমাদের পরস্পরের জীবন যাতে সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ চেষ্টা রেখো। মানুষের হৃদয়ের যথার্থ পবিত্র মিলন, সে কোনোদিন শেষ হয় না— প্রতিদিন তার নিত্য নূতন সাধনা। ঈশ্বর তোমাদের চিত্তে সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে জাগ্রত করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি।

তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার গৃহস্থধর্ম্মের অমৃতরস পান করে যাই এই আমার মনের লোভ এক একবার মনকে চেপে ধরে। কিন্তু লোভকে যেমন করে হোক্ ত্যাগ করতেই হবে। এখন আর ফল আকাঙ্ক্ষা করবার দিন নেই— সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে তোমাদের কল্যাণ কামনা করব— সেই কল্যাণে আমার কোনো অংশ থাকবে একথা মনেও করতে নেই; এবং আমার রাস্তা দিয়ে যে তোমাদের জীবনের পথে তোমরা চলবে এ কথা মনে করা অন্যায় এবং এ সম্বন্ধে জোর করা দৌরাত্ম্য। তোমাদের সমস্যা তোমাদের, তোমাদের প্রকৃতি তোমাদের, তোমাদের পথ তোমাদের— তোমাদের সম্বন্ধে আমার স্নেহ এবং আমার শুভ আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছু আমার নয়। সেই স্নেহকেও নির্লিপ্ত হতে হবে— সে যাতে তোমাদের প্রতি লেশমাত্র ভারস্বরূপ না হয় আমাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে— তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের আপনার জীবনের আলোকে তোমাদের আপনাদের সুখদুঃখ ও ভালমন্দের

সংঘাতের ভিতর দিয়ে একদিন পাবে আমাকে সে জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না— সে জন্যে আমি তাকিয়ে থাকবনা। তোমাদের কল্যাণ হোক।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাকে বেলার খবর দিতে বলেছিলুম। কিন্তু দরকার নেই। আমি দুর্ব্বলভাবে এ রকম করে চারদিকে আশ্রয় হাৎড়ে বেড়াব না— বেলা নিশ্চয় ভালই আছে ভালই থাকবে— আমার উদ্বেগের উপর তার ভালমন্দ কিছুই নির্ভর করচে না।

১৪
[অক্টোবর ১৯১৪]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রথীকে এই চিঠি দিয়ো। কিছু দিন থেকে মনে মনে ভাবছিলুম বুধগয়ায় যাব এমন সময় হঠাৎ দেখি নগেন মীরারাও সেখান যাবার আয়োজন করচে তাই এক সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করেছি। ও হয় ত দুচার দিনেই ফিরে আসবে। আমি কত দিন কোথায় থাকব এখনো ঠিক করি নি। হয় ত বা হরিদ্বারেও যেতে পারি। আপাতত ভগবান বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করতে চলেছি।

ও জায়গাটি তোমাদের ভাল লেগেছে এবং তোমরা সকলে মিলে আনন্দে আছ এই শুনে আমি খুব খুসি হলুম। নগেন বলছিল তোমরা দুই

চার দিনের মধ্যেই পুরীতে যাবে। যতদিন তোমরা যেখানে থাক্‌তে ইচ্ছা কর বেশ ভাল করে দেখে শুনে বেড়িয়ে চেড়িয়ে আনন্দ করে শরীর মনকে প্রফুল্ল করে তবে ফিরে এসো— কোনো কারণেই তাড়াতাড়ি কোরো না— ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে গেলেও ভাবনা নেই। চাই কি তোমরা East Coast Railway দিয়ে দক্ষিণে যতদূর পর্য্যন্ত যেতে ইচ্ছা কর যেতে পার। শুনেছি ত্রাবাঙ্কুর ভারতবর্ষের মধ্যে খুব একটি রমণীয় জায়গা। তোমরা সেই পর্য্যন্তই যাও না। সেতুবন্ধ পার হয়ে লঙ্কাতেও যেতে পার।

চিরশুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
[৯ মে ১৯১৬]

ওঁ

বৌমা

আজ রেঙ্গুন থেকে যেতে হবে। এখানে দুটো দিন বেশ কাট্‌ল। এখন মনে হচ্চে যদি অন্য কোথাও না ঘুরে এখানে কোনো গ্রামের বৌদ্ধমঠে ৩।৪ মাস কাটাতে পারতুম অনেক বেশি ভালো লাগত। ঘুরে বেড়ানো স্বপ্ন দেখার মত— তাতে কিছুই দেখা হয় না।

কাল এখানে আমার অভ্যর্থনা হয়ে গেল। খুব ভিড় হয়েছিল। বক্তৃতা গান প্রভৃতি হয়ে গেল। রুপোর cusket গুলো তোমাদের পাঠাতে বলেছি— বেশ সুন্দর কাজ— বর্ম্মার লোকেরা হাতির দাঁত কাঠ আর রুপায় খুব ভাল খোদাই করতে পারে। এখানকার লোকদের আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে।

আমার কেমন মনে হচ্চে জাপানের লোকদের আমার তেমন ভাল লাগ্‌বেনা— তাদের মন বোঝা শক্ত হবে। আর কোথাও না যাই ত জাপান থেকে চীনে যাব।

তোমরা কে কেমন থাক মাঝে মাঝে খবর দিয়ো। মীরার জন্যে আমার মন একটু উদ্বিগ্ন রইল। আশা করি তুমি এতদিনে সেরে উঠেচ। মুকুল খুব মনের আনন্দে আছে।

আমাদের ঝড়ের বর্ণনা খবরের কাগজের cutting থেকে দেখ্‌তে পাবে। এমন ঝড় সচরাচর হয় না।

ঈশ্বর অন্তরে বাহিরে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাদের কল্যাণের দিকে নিয়ে যান এই আমি নিয়ত প্রার্থনা করি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬
৪ জুন ১৯১৬

ওঁ

বৌমা খবর সমস্তই নানা লোকের নানা চিঠি থেকে পাবে। বিষম গোলমালের মধ্যে আমি কিছুই সময় পাইনে। কম টানাটানি চল্‌চে না। আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

বাবামশায়

১৭
[জুলাই ১৯১৬]

ওঁ

য়োকোহামা
C/o. T. Hara Esq.
Yokohama
[১৯১৬]

কল্যাণীয়াসু

অনেকদিন পরে তোমাদের চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। এখানে যতই দেখচি ততই ভাল লাগ্‌চে। য়ুরোপ আমার এতভাল লাগেনি— এত আন্তরিক আদর যত্নও কোনোদিন কোথাও পাই নি— এমন সুন্দর দেশও কোথাও দেখা যায় না। এখান থেকে এত শেখবার ও নেবার আছে সে বলা যায় না। যে সব ছবি দেখেচি এরকম কোথাও নেই। অবনগগনের খুব উচিত ছিল এখানে আসা। আমার সঙ্গে এলে অনেক জিনিস দেখতে পেত। এখানে আসবার পূর্ব্বে এখানকার ভিতরকার পরিচয় আমি কল্পনা করতে পারি নি, গগনরাও পারেন নি। অন্তত নন্দলালের এখানে আসা নিতান্ত আবশ্যক। এদের বড় জিনিস কেবলমাত্র ভাল করে দেখে গেলেই নিজের ভিতরকার শক্তি উদঘাটিত হয়। বাঁদরটার যদি কিছু হয় দেখা যাক্‌। তোমরা আমার সঙ্গে এলে কত দেখ্‌তে পেতে সেই কথা মনে করে আমার বড় দুঃখ বোধ হয়। যদি সুবিধা পাও তাহলে এখনো আস্‌তে পার কেন না আমি ১৫ই সেপ্টেম্বরে এখান থেকে ছাড়ব। ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন এই আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
৮ অগস্ট ১৯১৬

ওঁ

[1916]

বৌমা,

আমেরিকায় পাড়ি দেবার মুখে সমস্ত চিঠির পালা সেরে নিচ্চি— সেখান থেকে দীর্ঘকাল লেখা সম্ভব হবে না। তোমাদের কাছ থেকেও অনেকদিন চিঠি পাই নি এবং পাবও না। সেইজন্যে আমার দেশটা আমার কাছে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এসেচে— এখানে যে দেশে এবং যাদের মধ্যে আছি তারাই যেন বড় হয়ে উঠেচে— তেমনি এখান থেকে আশ্চর্য্য তাদের যত্ন পেয়েচি। প্রত্যেক ষ্টেশনে লোক জমে যায় কেবল কৌতূহল নয়— আন্তরিক ভক্তি। আমাকে জানে না সমস্ত জাপানে এমন বোধ হয় একজনও নেই। এমনি করে এই বাইরের সংসারটার জন্যেই ঈশ্বর আমাকে অন্তরে বাহিরে নানারকম করে তৈরি করে নিচ্চেন। বিদায় হবার আগে এই বড় জগৎটাকেই সম্পূর্ণ আত্মীয় বলে আমাকে বরণ করে নিতে হবে।

মুকুলকে এইখানেই রেখে গেলুম। সবাই আশা দিচ্চে ও একজন বড় আর্টিষ্ট হতে পারবে। মিছিমিছি আমার সঙ্গে ওকে আমেরিকার সহরে সহরে ঘুরিয়ে বেড়ালে ওর অনিষ্ট হবে। ওর বদলে আমার একজন জাপানী চেলা জুটে গেচে। এই ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লাগে। ইংরেজি অতি অল্পই জানে কিন্তু ক্রমে শিখে নিতে পারবে। সকল রকমে আমার সেবা করতে এর কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। হয় ত বা এ আমার একজন অনুচর হয়ে উঠ্‌তেও পারে। একদিন যখন এ কোনো জাপানী মেয়েকে বিয়ে করবে তখন সে আমার আরো সুবিধে হবে।

উমাচরণ কেমন আছে আমার জানতে ইচ্ছে করে। তার ব্যামো কি একেবারেই সেরে গেছে? কিন্তু দেশে গিয়ে তাকে যদি আবার ম্যালেরিয়ায়

ধরে তাহলে সে আর বাঁচবেনা। রথীকে বোলো তাকে যেন ভালরকম সাহায্য করে তার যেন খাওয়া পরা ও চিকিৎসার অযত্ন না হয়। অনেকদিন সে আমার সেবা করেচে। ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন এই আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯
২ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬

ওঁ

বৌমা

তোমার চিঠিতে মীরার খুকী হওয়ার খবর পেয়ে খুব খুসি হলুম। খুকীর ছবিও বেশ লাগ্‌ল। ওর জন্যে এখান থেকে কাপড় পাঠাচ্চি— আশা করি তার গায়ে হবে। খোকার জন্যেও একটা জাপানী কাপড় পাঠালুম। আজ বিকেলে আমাদের জাহাজ ছাড়বে তাই সকাল থেকে গোছাবার হাঙ্গাম পড়ে গেচে। মুকুলটা কোনোমতেই আমার সঙ্গ ছাড়লনা। সেও চলেচে। এখান থেকে যে কতকগুলো কাপড় চোপড় এবং জিনিষপত্র পাঠাচ্চি সে হয়ত বা এই চিঠির আগেই পৌঁছবে। রথীকে বোলো আমার জাপানী কিমোনোগুলো দেশে ফিরে গিয়ে পরতে চাই— ও গুলো ভারতবর্ষের পক্ষে খুব আরামের হবে। টুকিটাকি অনেক রকম জিনিষ জমেছিল সমস্তই রওনা করে দিলুম— তোমাদের কাজে লাগবে। এণ্ড্রুজের হাতে তোমার জন্যে একটা জাপানী তুলির বাক্স পাঠিয়েছি— গগন

অবনের জন্যেও পাঠালুম। আমি যে সব জিনিযপত্র পাঠিয়েচি তার মধ্যে থেকে বেছে সমরকে একটা কিছু দিয়ে দিয়ো।

বিচিত্রার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে শুনে দুঃখিত হলুম। এ সমস্ত কাজ ত কেবল সখের কাজ নয়; দেশের কাজ— সমস্ত প্রাণমন দিয়ে না করলে কোনোমতেই হবার নয়। এ সব দেশে এ রকম ধরণের কত কাজই হচ্চে কিন্তু সে ত দিব্যি আরাম করে হচ্চে না। কত লোকের সত্যিকার শক্তি এবং প্রেম এদের দেশকে উপরে তুলে রেখেচে। আমাদের শক্তিহীন ভক্তিহীন দুর্ব্বল সৌখীনতার কথা স্মরণ করলে কোনো আশা থাকে না।

এণ্ড্রুজের কাছে খবর পেয়েছ ডিসেম্বর মাসে এখানকার একজন আর্টিষ্ট তোমাদের ওখানে যাবে— তাকে বিচিত্রার একটি ঘরে বেশ যত্ন করে রেখো। তার কাছ থেকে তোমরা অনেক শিখ্‌তে পারবে। আমার সব চেয়ে ইচ্ছা করে এখান থেকে তোমাদের জন্যে একজন দাসী পাঠাই— কি সুন্দর করে এরা কাজ করতে জানে! তোমরা সকলে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ১৭ই ভাদ্র ১৩২৩

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

[এপ্রিল ১৯১৭?]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু[১]

মা, তোমার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। ঈশ্বর তোমার শরীর মনের শান্তিবিধান করুন।

১লা বৈশাখের উপলক্ষ্যে কাল পর্য্যন্ত অতিথিদের নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। তাতে ক্লান্ত করেচে। ছুটি হয়ে গেলে কোথাও যাবার জন্যে মনটা উৎসুক আছে। দার্জ্জিলিঙে যাবার ইচ্ছা নেই— সেখানে বিশ্রাম পাবনা। দেখি, কোথায় যাওয়া ঘটে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

১৮ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, ঈশ্বর তোমার শোককে সফল করুন— মৃত্যুর বাণী তোমার জীবনের মধ্যে সুগভীর শান্তি ও কল্যাণ বহন করে আনুক এই আমি

১ এই চিঠিটি এবং পরবর্তী দুটি চিঠি যে প্রতিমাদেবীর কাছে লিখিত, এমন না হওয়াই সম্ভব। তবু এখানে সংকলিত হল কেন, সে-বিষয়ে গ্রন্থ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।
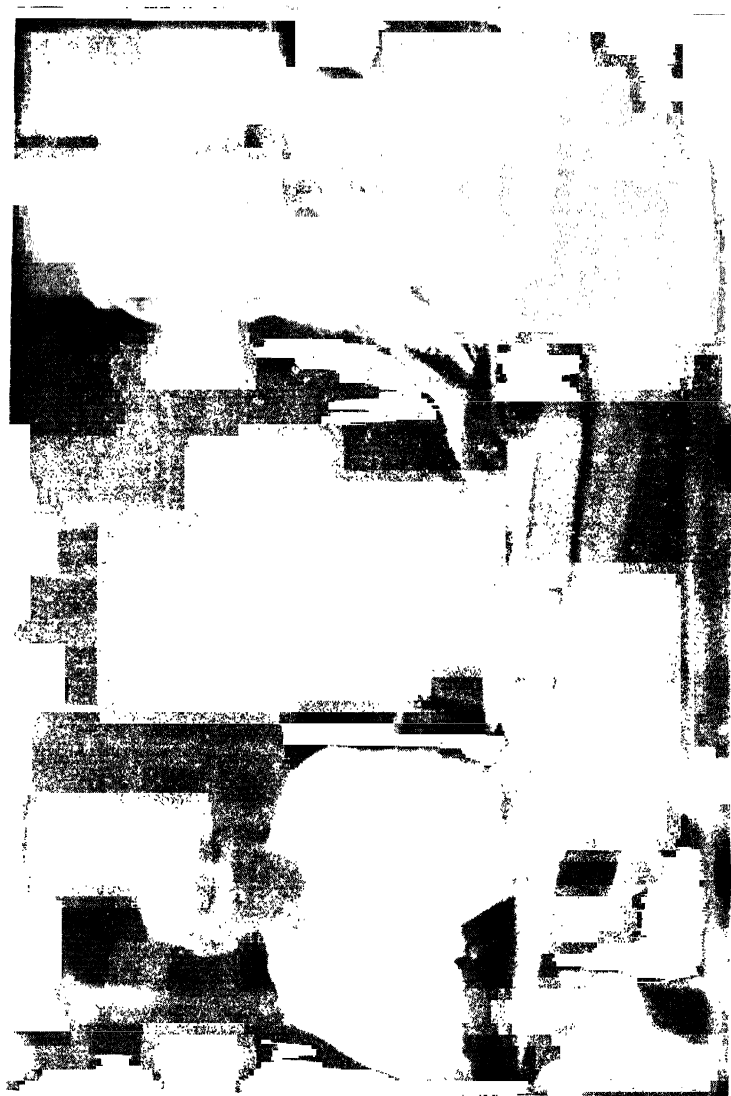
অন্তরের সহিত কামনা করি। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২
[১৯১৭]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

মা, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখ্‌লে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করি নে বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁক্‌ড়ে থাকি। আমাদের বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে তবেই সংসারের ভার হাল্কা হয়ে যায়। আবার আমরা মৃত্যুকে যখন দেখি তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনে বলেই শোকের জ্বালা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহেই এগিয়ে চল্‌চে এই কথাটিকে ভাল করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে জান্‌লেই আমাদের মোহ জন্মায়। সেই মোহ আমাদের বাঁধে, সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। যত পাপ যত ভয় যত শোক ঐখানেই।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩
৪ নভেম্বর ১৯১৭

ও

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে লিখেছিলে তোমরা কলকাতায় আসচ কিন্তু পর্শু পর্য্যন্ত খবর পেয়েচি তোমাদের কলকাতায় ফেরবার কোনো সংবাদ নেই।

আমি বহুকাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এখানকার নির্ম্মল শরতের আলোকে যেন স্নান করে বেঁচেচি। আমার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত এইই ভাল এখানকার খোলা মাঠ এবং গভীর শান্তি। কাজকর্ম্ম করবার দিন আমার ফুরিয়েচে। ভিড়ের মধ্যে আমার আর চল্‌বে না। এখানকার সংসারইত চিরদিনের নয়— এবার তার ধূলোমাটি ধুয়ে ফেলে বড় জীবনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চাই।

রথীর শরীর কেমন আছে আমাকে লিখো। উপ্‌রি-উপরি যখন জ্বর এল তখন সম্ভবত ম্যালেরিয়া। ওটাকে সম্পূর্ণ না ঝেড়ে ফেল্‌লে বারবার কষ্ট দেবে। ওখান থেকে ফিরে এসে বরঞ্চ কোথাও সমুদ্রের ধারে গেলে ভাল হয়। বেলার শরীরও, বোধ হয় কয়দিনের বাদলায়, খারাপ হয়ে উঠেছিল। তার জন্যে মন উদ্বিগ্ন আছে।

কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখে দিলুম— না থাক শিলাইদহে পাঠিয়ে দেবে। ইতি ১৮ কার্ত্তিক ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪
১৬ এপ্রিল ১৯১৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শিলং জায়গাটা তোমাদের ভাল লেগেচে শুনে খুসি হলুম। ওখানে থেকে তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠুক এই আমি কামনা করি। কিন্তু আমার এখন কোথাও যাবার জো নেই— শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় নড়া চড়া করতেও ইচ্ছা হয় না। এখানেও যতটা গরম পড়বার কথা তা পড়ে নি— মাঝে মাঝে একটু বেশি ঠাণ্ডা হঠাৎ দেখা দেয়। আমাদের এখানে বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভের উৎসব হয়ে গেল। এবারে কলকাতা থেকে বেশি কেউ আসে নি— কেবল প্রশান্ত আর কালীদাস এসেছিল— তারা আমার উপরের ঘরেই ছিল। মেয়েরা কেউ আসে নি, এলে একটু মুস্কিল হত। সুরমার বিয়ে উপলক্ষ্যে হেমলতা, কমলা আর সংজ্ঞারা সবাই বোধ হয় শীঘ্রই চলে যাবেন। সুরমার বিয়ের সময় তোমাদেরও কলকাতায় ফিরতে হবে না কি? এই গোলের মধ্যে আমার কিন্তু কিছুতেই যেতে ইচ্ছা করচেনা। আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ তোমরা নিয়ো— সংসারের ঊর্দ্ধে ঈশ্বর তোমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করুন— এবং কল্যাণ কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করবার জন্যে তিনি তোমাদের শক্তি প্রীতি ও মহত্ত্বদান করুন। ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩২৬

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫
[৭ এপ্রিল ১৯২৪]

[হংকং, ৭ এপ্রিল]

বৌমা, আজ হংকং পৌঁছবার কাছাকাছি। কিন্তু বড় দুর্য্যোগ। পথে একরকম মন্দ কাটে নি। সমুদ্র মোটের উপর শান্ত ছিল। পর্শু থেকে একটু নাড়া দিচ্চে— তাতে ক্ষিতিবাবু নন্দলাল প্রভৃতিকে কাবু করেচে। তাঁরা আজ ব্যাকুল নয়নে ডাঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি ডেকের এক কোণে বসে কেবল লেকচার লিখে চলেচি— ঢেঁকির স্বর্গেও বিশ্রাম নেই।

২৬
[৩০ মার্চ ১৯২৪]

ওঁ

P. K. NAMBYAR.
ADVOCATE & SOLICITOR

S.S. AND F.M.S.

—

TEL ADDRESS :
"NAMBYAR. PENANG"

3. UNION STREET

PENANG————192

বৌমা

ভেসে ভেসে চলেচি। জলে ঢেউ নেই, জাহাজে যাত্রী কম, গরম যথেষ্ট আছে। আজ পেনাঙে পৌঁচেছি। একজন মাদ্রাজীর বাড়িতে আতিথ্য

নিয়েচি। আমার দলের লোকেরা সবাই সহর দেখতে গেছে— আমি একলা, শরীর ক্লান্ত, আর তন্দ্রার আবেশে ভারাক্রান্ত। এক জানলা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্চে— আর এক জানলা দিয়ে আম নারকেল তেঁতুল বটের সবুজ সঙ্ঘ দেখ্‌তে পাচ্চি। অনেকদিন শুধু কেবল জলের নীল আর আকাশের নীলের মাঝখান দিয়ে আমার সময়স্রোত ভেসে গেচে। আজ এখানে পৃথিবীর নানা রঙের মেলার মধ্যে এসে আরাম পাচ্চি। কিন্তু ডাঙার এক মহা বিপদ অভ্যর্থনা। সে যে কি ব্যাপার না দেখ্‌লে বুঝতে পারবে না। আমার আবার এত বেশি অভ্যর্থনা সহ্য হয় না। ভেবেছিলুম পিনাঙ ছোট সহর, এখানে বেশি কিছু হাঙ্গাম হবে না— ঘাটে নেবেই ত চক্ষুস্থির। সমস্ত সহরের লোক বোধ হয় ভেঙে পড়েছিল— বাজনদারের দল ঢাক ঢোল সানাইয়ের ধূম লাগিয়ে দিল— মালার স্তূপ আমার গলা ছাড়িয়ে মুখের অর্দ্ধেক ঢেকে দিলে; কোনো মতে নাকটা জেগে ছিল,— চষমাটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল। যা হোক, এ সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত বোধ করি, কালিদাসের চিঠি থেকে অনেকটা জান্‌তে পারবে। চিঠি লিখ্‌তে আমার কুঁড়েমি ধরে। তাই বলে মনে কোরো না, আমি পেট ভরে কুঁড়েমি করতে পাই। চীনের জন্যে ছটা লেকচার লিখ্‌তে হবে— তার মধ্যে দুটো লিখে ফেলেচি। জাহাজের ক্যাবিনের কোণে বিছানার উপর বসে লেখা কি কম কথা! বিশেষত অপরাহ্ণের রৌদ্রে যখন ক্যাবিনের কাঠের দেয়াল তেতে উঠে দেহটাকে পাঁউরুটি সেঁকা করে তুল্‌তে চায়। যাই হোক চীনে যাবার পূর্ব্বে আশা করি লেকচারগুলো চুকিয়ে দিতে পারব। না যদি পারি ত মুখে বলে কোনোমতে গোঁজা মিলন দিয়ে কাজ সারতে পারব। বড্ড ঘুম পাচ্চে। গরমে দু রাত্রি ভাল ঘুমতে পারি নি। আজ সকালে জাহাজ এসেচে, আজ সন্ধ্যা আটটার সময় ছাড়ব। আবার পর্শুদিন আর একটা বন্দরে থামবে, তারপর সিঙ্গাপুরে।— পুপের কথা মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু সে যে আমার বিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েচে এমন মনে

হয় না। তাকে 'মানে না মানা' গান শোনাবার অনেক লোক জুটবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মীরার জন্যে মাসিক টাকার ব্যবস্থা করে দিয়ো, আর পতিসর ব্যাঙ্কে তার যে টাকা জমা আছে সে টাকার সুদ কি রকমভাবে খাটচে, কি হচ্চে সেটা যেন পরিস্কার করে জানতে পারি এবং মীরাও জানতে পারে। ওর কাছে পাস্ বই না থাকার অর্থ কি তা ত বুঝতে পারিনে।

২৭

২০ মে ১৯২৪

ওঁ

PEKING

বৌমা

তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনে আঘাত পেয়েচি। সেদিন তোমার মা যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন তাঁর মধ্যে এমন একটি গভীরতা দেখেছিলুম, সাধনার এমন একটি সহজ সুন্দর রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল যে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর এই যে ভাবটি দেখতে পেয়েছিলুম এই কথাটি মনে করে আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে। এইবার এই দিক থেকে বিনয়িনী আমার হৃদয়ের খুব কাছে এসেছিলেন। এক একদিন আমার কাছে এসে তিনি যখন তাঁর প্রাণের গভীর কথাগুলি বল্‌তেন আমার ভারি তৃপ্তি হত। অন্তরে তিনি এমন একটি মুক্তি পেয়েছিলেন যে, মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই নয়। ভিতরে ভিতরে তিনি সংসার পার হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি বলছিলেন,

এবার শান্তিনিকেতনে আসবার সময় রেলগাড়িতে ভেদিয়ার কাছে যখন মাঠের উপর অপরাহ্ণের সূর্য্যালোক দেখলেন তখন তিনি এক মুহূর্ত্তে তাঁর ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পেলেন। বল্লেন, এর আগে একদিনের জন্যেও পূজানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হলে তিনি দুঃখ পেতেন, কিন্তু এবার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর কাছে বাহ্য অনুষ্ঠান সব মিথ্যে হয়ে গেছে— আর দরকার নেই। তিনি যে একান্ত উপলব্ধির মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন হয়েছিলেন তাই দেখে আমার নিজের মনের মধ্যে ভারি শান্তি বোধ হত। আমার কেমন মনে হয়, যে, জীবন বন্ধনের শেষ সূত্রগুলি ছিন্ন করবার জন্যেই এবার তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন— সংসারের দায়িত্ব থেকে নিজেকে কিছুকালের জন্যেও বিচ্ছিন্ন করে যেন তিনি শেষ বিচ্ছেদের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করে তবে তিনি যে সুখ দুঃখের পারে চলে গেলেন এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

পূপের কথা লিখে আমাকে লোভ দেখাও কেন বৌমা? তুমি মনে মনে জান ঐ কন্যাটি আমাকে মোহপাশে বেঁধেচে। ঐ মায়াবিনী মরীচিকার মত আমাকে ভোলায় কিন্তু আমাকে ধরা দেয় না। এম্‌নি করে' ফাঁকি দিয়ে ও আমার কাছ থেকে কেবল গান আদায় করে। এত অল্প বয়সে ওর এমন সর্ব্বনেশে বুদ্ধি হ'ল কি করে'? ও কেমন করে জান্‌লে কবির কাছ থেকে গান আদায় করবার এই একমাত্র উপায়— দুঃখ না দিলে ফাঁকি না দিলে বাঁশি ডাক দিতে চায় না। তুমি লিখেচ, দাদার গান ছাড়া আর কারো গান ওর পছন্দ হয় না, ও আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করিনে। ও যদি স্বয়ম্বরা হয়, ওর দাদার গলায় মালা দেবে না সে আমি নিশ্চয় জানি। তা হোক্ না, মনে কোরো না তাই নিয়ে আমি হৃদয় বিদীর্ণ করব। আমার জন্যে মালা গাঁথাকে ভাগ্য মনে করে দেশে বিদেশে এমন সুন্দরী ঢের আছে।

আজ রাত্রে পিকিন ছেড়ে আর এক জায়গায় যাচ্চি। ৩১শে মে তারিখে সাঙ্ঘাই থেকে জাপানে যাত্রা করব। সেখানে ৪ঠা তারিখে পৌঁছব। জাপানে খুব আগ্রহ করে আমাকে ডাক্‌চে। হয় ত জুনের শেষের দিকে সেখান থেকে ছুটি পাব। তার পরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেই শান্তিনিকেতনের মাঠের ধারে গিয়ে সেই বারান্দায় আরাম কেদারায় গিয়ে বস্‌ব। কিন্তু আমার বাসাটি তৈরি শেষ হয়েচে ত? এবার গিয়ে যেন আমার ঘরের মধ্যে গুছিয়ে বসতে পারি। আর বোলো ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি যেন তৈরি হয়। আর উত্তর দিকে জিনিযপত্র রাখবার যে ঘরটা তৈরি হয়েচে সেটাতে এমন করে জানলা দরজা বসাতে বোলো যাতে আমার চীন দেশী চাকর সে ঘরে বাস করতে গিয়ে হাঁপিয়ে মারা না যায়। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮
[নভেম্বর ১৯২৪]

ওঁ

বৌমা,

তোমরা ত আমাকে আটলান্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে লণ্ডনে চলে গেলে। আমি এবার খুব ভুগেচি। সমুদ্র আশ্চর্য শান্ত ছিল। কিন্তু এখানে পৌঁছবার দিন সাতেক আগে বোধহয় আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছিল। বুকে এমন ব্যথা আর দুর্ব্বলতায় চেপে ধরেছিল যে, প্রায় মনে হত যে, এ যাত্রায়

আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। এখানে পৌঁছলে পর এরা আমাকে খুব যত্ন করেচে। এখানকার খুব নামজাদা ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেচেন। বুকের দুর্ব্বলতার জন্যে আমাকে ডিজিটালিন্ খেতে হয়েছিল। পেরু যাওয়া ত বন্ধ হবার জো হয়েছিল। কিন্তু পেরুর লোকেরা ছাড়তে চাচ্চে না, তাই রেলপথ বাদ দিয়ে সমুদ্রপথে যাওয়া ঠিক করেচি। এখানকার একজন মহিলা আমাকে ঘরের লোকের মত যত্ন করচেন— তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েচেন। তিনি তাঁর একটা বাগানবাড়ি আমাদের ছেড়ে দিয়েচেন। তিনি এখানকার খুব একজন বিখ্যাত লেখিকা— অনেকদিন থেকে আমার লেখা পড়ে আমাকে বিশেষ ভক্তি করেন। মোটের উপর এখানকার সবাই আমার ভক্ত। এরা যে আমাকে কতখানি জানে আর কত চায় তা আগে কল্পনা করতেও পারতুম না। আমাদের সেই নাটকের দল এখানে আন্‌লে খুবই আদর পেত। তাদের আনবার প্রস্তাব যখন তুলেছিলুম এরা লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিল। ছবির একজিবিশনের জন্যে এরা খুবই উৎসুক। বেশ দেখতে পাচ্চি দক্ষিণ আমেরিকায় আমাদের মস্ত একটা জায়গা আছে। যাতাযাতের পথ যদি দূর না হত তাহলে ভারি সুবিধা হত। তুমি ওখানে Pottery শিখচ শুনে খুব খুসি হলুম! রোটেন্‌স্টাইনের ইস্কুলে Wood Engraving শিখ্‌তে পার। কিন্তু পুপেকে নাচ শেখাবার বন্দোবস্ত কোরো। ওকে ভুলে যাবার জন্যে খুবই চেষ্টা করচি— আশা করি আরো মাস দুয়েক যদি উঠে পড়ে লাগি তাহলে কিছু পরিমাণে কৃতকার্য্য হতে পারব। ওর মায়াজাল ছিন্ন করতে সাধনার জোর চাই, আর সময়ও লাগ্‌বে। ভয় হয় যখন দেখা হবে আবার পাছে মোহপাশে পড়ি— আমার মন যে বড় দুর্ব্বল।

নীতুকে আনিয়ে নিয়ে দেখ্‌তে ভুলো না— যদি নিতান্ত সে ছুটি না পায়, তোমরা গিয়ে দেখে এসো, আর ওকে যা হয় কিছু দিয়ো। নগেন ওর খরচের জন্যে আমার কাছে হাজার টাকা চেয়েছিল, দিইনি বলে ভারি

রেগে গিয়েছে বোধ হয়। হয়ত নীতুকে তোমাদের কাছে আসতে দিতে চাইবেনা। ডিসেম্বর ২৯শে তারিখে পেরুতে রওনা হব। পেরু রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের কেয়ারে আমাকে চিঠি দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

[ডিসেম্বর ১৯২৪]

ওঁ

বৌমা,

পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থটা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থটা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক্। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাফা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর একটু ব্যাখ্যা করাও দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখ্লুম, পুপেঁ, পুপু, পুপসি, মাডাম পাভ্লোভা দি সেকেণ্ড, রূপসী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ইত্যাদি, তার পরে যেমন করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকা জোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েচি।

এর মর্ম্ম হচ্চে এই, ঐ আদরের নামগুলো সমস্তই ভুল, আমার মন থেকে এর সমস্তই আমি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় আছি। ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি আলোচনা করেচি, সেটা কবিতায়-- সেটাও তোমাদের কপি করে পাঠাব।

দ্বিতীয় বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেচি এমন সময় কাল ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্র পথে, না শৈল পথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে— আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল। জানুয়ারির ৩রা তারিখে। ইটালিয়ান জাহাজ, নাম Giulio Cesare। জেনোয়া বন্দরে পৌঁছব, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে।

ডাক্তার বল্‌চে আমার দেহযন্ত্র কোনোটা বিকল হয় নি, কিন্তু ফতুর হয়ে গেছে। আর বেশি খরচ সইবেনা। চুপচাপ করে থাক্‌লে, পুঁজি যা আছে তা নিয়ে আরো কিছুকাল চলে যাবে। ডাক্তার বলে, আমার মুষ্কিল এই যে বাইরে থেকে আমাকে দেখলে বোঝা যায় না, আমার এমন দেউলে অবস্থা। আমি নিজে অনেকদিন থেকে এটা বুঝতে পারছিলুম কিন্তু বোঝাতে পারছিলুম না। যা হোক এবার দেশে ফিরে গিয়ে অকাজের সাধনায় উঠে পড়ে লাগতে হবে। সে সব কথা মোকাবিলায় আলোচনা করা যাবে।

এতদিন পরে ডিসেম্বরের পয়লা থেকে এখানে গরম পড়েচে। আজ মেঘ করে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্চে— আবার হয় ত কিছুদিন ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের ওখানে ঠাণ্ডার অভাব কিছুই নেই। লণ্ডনের নবেম্বর যে কি পদার্থ তা আমি খুব জানি। ডিসেম্বরে ক্রিস্টমাসের কাছাকাছি বরফ পড়া সুরু হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রেগে গিয়েছে বোধ হয়। হয়ত নীতুকে তোমাদের কাছে আসতে দিতে চাইবেনা। ডিসেম্বর ২৯শে তারিখে পেরুতে রওনা হব। পেরু রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের কেয়ারে আমাকে চিঠি দিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯

[ডিসেম্বর ১৯২৪]

ওঁ

বৌমা,

পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থটা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থটা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক্। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাফা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর একটু ব্যাখ্যা করাও দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখ্‌লুম, পুপে, পুপু, পুপসি, মাডাম পাভ্‌লোভা দি সেকেণ্ড, রূপসী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ইত্যাদি, তার পরে যেমন করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকা জোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েচি।

এর মর্ম্ম হচ্চে এই, ঐ আদরের নামগুলো সমস্তই ভুল, আমার মন থেকে এর সমস্তই আমি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় আছি। ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি আলোচনা করেচি, সেটা কবিতায়-- সেটাও তোমাদের কপি করে পাঠাব।

দ্বিতীয় বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেচি এমন সময় কাল ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্র পথে, না শৈল পথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে— আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল। জানুয়ারির ৩রা তারিখে। ইটালিয়ান জাহাজ, নাম Giulio Cesare। জেনোয়া বন্দরে পৌঁছব, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে।

ডাক্তার বল্‌চে আমার দেহযন্ত্র কোনোটা বিকল হয় নি, কিন্তু ফতুর হয়ে গেছে। আর বেশি খরচ সইবেনা। চুপচাপ করে থাক্‌লে, পুঁজি যা আছে তা নিয়ে আরো কিছুকাল চলে যাবে। ডাক্তার বলে, আমার মুস্কিল এই যে বাইরে থেকে আমাকে দেখলে বোঝা যায় না, আমার এমন দেউলে অবস্থা। আমি নিজে অনেকদিন থেকে এটা বুঝতে পারছিলুম কিন্তু বোঝাতে পারছিলুম না। যা হোক এবার দেশে ফিরে গিয়ে অকাজের সাধনায় উঠে পড়ে লাগতে হবে। সে সব কথা মোকাবিলায় আলোচনা করা যাবে।

এতদিন পরে ডিসেম্বরের পয়লা থেকে এখানে গরম পড়েচে। আজ মেঘ করে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্চে— আবার হয় ত কিছুদিন ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের ওখানে ঠাণ্ডার অভাব কিছুই নেই। লণ্ডনের নবেম্বর যে কি পদার্থ তা আমি খুব জানি। ডিসেম্বরে ক্রিস্টমাসের কাছাকাছি বরফ পড়া সুরু হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০

১২ অক্টোবর [১৯২৬]

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, প্রাগে এসে বক্তৃতাগুলো চুকিয়ে দিয়েছি। আজ চেক্‌দের থিয়েটারে পোষ্ট অফিস অভিনয় হবে, সেখানে গোটাকয়েক বাঙলা কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করেছে। বুধবারে জর্ম্মান থিয়েটারে ঐ নাটকটাই অভিনয় করবে, সেখানে চুপ করে বসে শোনা ছাড়া আমার আর কোনো কর্ত্তব্য নেই। এখানে তেমন শীত পড়ে নি; বেশ রোদ্দুরও ছিল, আজ সকাল থেকে মেঘ মেঘ করচে। কবে কোথায় যাব আমি তার কোনো খবর রাখিনে। যেদিন যেখানে যেতে বলে ভালোমানুষের মত সেইখানেই চলে যাই। ব্যাপারটা এতই জটিল যে ভেবে উঠতে পারি নে— হঠাৎ উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণ তার পরে আবার ফিরে এসে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম লম্বা পাড়ি— কখনো রাত্তিরে কখনো দিনে, কখনো ভোর বেলায়, কখনো ভর্ সন্ধ্যায়। অবশেষে পঞ্চম অঙ্কের শেষ অংশে অপেক্ষা করে আছে আমার সেই লীলমণি আর সেই লম্বা কেদারা। এখানে কার্ল্‌স্‌বাডের সহরবাসীরা আমাকে নেমন্তন্ন করেছে— তিন চারদিন সেখানে বিশ্রাম করবার জন্যে অনুরোধ। সেই অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে হয় ত বুডাপেস্ট বাদ দেওয়া দরকার হবে— যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে রেলপথে বিষম ঘোরাঘুরি করতে হবে, বিশ্রামের মজুরী পোষাবে কি না সন্দেহ। তোমরা সেই কাইজারহোফে বেশ জমিয়ে বসে আছ, নড়বার সময় মনে কষ্ট পাবে। আমি নড়া দাঁতের মত দিনরাতই নড় নড় করচি সুতরাং সম্পূর্ণ উৎপাটিত হতে পারলেই তবে নিষ্কৃতি। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

১৫ অক্টোবর [১৯২৬]

ওঁ

PRAGUE

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানকার পালা শেষ হল। আজ যাব ভিয়েনায় কাল হবে বক্তৃতা— তার পরে যাব বুডাপেষ্টে, সেখানে হবে বক্তৃতা। তার পরে যাব এখানকার প্রেসিডেন্ট ম্যাসেরিকের বাড়িতে— না গেলে সবাই দুঃখিত হবে। আমার দুঃখ কেউ বোঝে না। পোলাণ্ডের বোঝা খসে গেছে— রাশিয়াটা গেলে বাঁচা যায়। একটুও ভাল লাগচে না— কোনো একটা সময় যখন কিছুই করতে হবে না মনে করলে শরীর মন পুলকিত হয়ে ওঠে। রথীর শরীরের উপর দিয়ে যে রকম আঘাত গেল তাতে আমার মনে হচ্চে রাশিয়ার মত জায়গায় লম্বা লম্বা পাল্লায় ঘোরাঘুরি করা তার পক্ষে কোনোমতেই সঙ্গত হবেনা। তোমরা যদি না যেতে পার তাহলে রাশিয়ায় যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। এর চেয়ে তোমাদের নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে কিম্বা দক্ষিণ ফ্রান্সে কিছুদিন বিশ্রাম করে দেশে পালানোই আমার পক্ষে শ্রেয় হবে— সেটা রথীর পক্ষেও ভালো হতে পারবে। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২
১৯ অক্টোবর [১৯২৬]

ওঁ

HOTEL IMPERIAL
WIEN

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম কিন্তু কর্ম্মবন্ধন থেকে কিছুতেই ভদ্রভাবে নিষ্কৃতি পাবার উপায় দেখছিলুম না। এমন সময় ভাগ্যের দয়ায় অল্প একটু জ্বর এল, শয্যা আশ্রয় করতে হল, ডাক্তার বল্‌লে, আর না, বাস্— তবে থাম্‌তে পারলুম। এখন যাক্ পোলাণ্ড, যাক্ রাশিয়া, যাক্ বক্তৃতা। ডাক্তার বল্‌চেন, ভারতবর্ষে যাত্রার আগে অন্তত তিন সপ্তাহ দক্ষিণ সুইজারলাণ্ড বা ফ্রান্সে খুব পেট ভরে বিশ্রাম করে নিতে। শুনে কান জুড়ালো। ভাবছি প্রথমে Villeneuveএ গিয়ে দুচার দিন থেকে অন্য কোনো সূর্য্যালোকের দেশে গিয়ে আড্ডা করব। কিন্তু রথী কি আসবেনা? তার পক্ষেও ত এই রকম জায়গায় চুপচাপ থাকা ত ভালো। বর্লিনের মত জায়গায় এখন ত আবহাওয়া ভালো হবার কথা নয়। কান্‌কে একটা চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করলে হয় না যে তার Mentone-এর বাড়ি পাওয়া যাবে কি না। তাহলে সেখানে সকলে মিলে কিছুদিন বিশ্রাম ভোগ করে নেওয়া যায়। তোমরা কি মনে কর শীঘ্র লিখো। ডাক্তার এ সপ্তাহ এখানে আমাকে তাঁর চিকিৎসাধীন রাখবেন। হয় ত আসচে হপ্তায় ছুটি পাব।

Miss Pott এসেচে— তাকে তো ভালোই লাগ্‌চে। শুনে হয় তো ঈষৎ হাস্য করতেও পারো— কিন্তু আমার চেয়েও মানবচরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তাঁরাও বোধ হচ্চে যেন সন্তোষ অনুভব করচেন। কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি হয় ত বল্‌বেন, এখনো বলা যায় না— আরো দীর্ঘকাল দেখলে তবে নির্ভরযোগ্য স্ট্যাটিস্টিক্স্ সংগ্রহ হতে পারে। কিন্তু

আমি বৈজ্ঞানিক নই তাই মনে করচি ঠিক এমন মানুষ এত সহজে এত অল্পে পাওয়া যাবে না— অতএব আপাতত দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এঁকে কাজে লাগানো যাক্— তার পরে যখন পরিতাপের কারণ ও সময় উপস্থিত হবে তখন— তখন তোমরা যা বল্‌বে তাই শুনব।

বাড়ির চিঠিপত্র কি কিছু আসেনি। মীবার জন্যে মনটা খারাপ আছে। যদি আগেই জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে শীঘ্রই চলে যেতে ইচ্ছে করচে। এবারকার মত যুরোপের পালা সাঙ্গ হল। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিমাদি, কাল একটুও জ্বর ছিলনা। Wenkebach এসে সন্ধ্যেবেলা প্রায় ১॥৹ ঘণ্টা ছিলেন— খুব যত্ন করে দেখ্‌ছেন। Heartএ একটুও গোলমাল নেই, nerve এর উপর একটু strain হয়েছিল; কাল থেকে একেবারে normal অবস্থা হয়েছে। সব ভালো রাণী।

৩৩
[২০ জুলাই ১৯২৭]

ওঁ

GOVERNMENT HOUSE
SINGAPORE

বৌমা

সুরেন তোমাদের সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লেখে— সুতরাং আমার ছুটি। সে রকম চিঠি লিখ্‌তেও পারি নে— খবর মনেও থাকে না, কোথায় কি হচ্চে চেয়েও দেখি নে। চিঠির নাম দিয়ে যা বিচিত্রাকে লিখ্‌তে হচ্চে তা একেবারেই ফাঁকি, চিঠি হিসাবে সম্পূর্ণ অপাঠ্য। কিন্তু নিমক খেয়েছি,

আরো খাবার প্রত্যাশা আছে তাই লিখ্‌তে হচ্চে। অথচ সময় বেশি নেই— কোথাও স্থির হয়ে বসা অসম্ভব— যা তা লেখবার শক্তিও এখন কমে গেছে। অতএব সুরেনকে আমার শত ধন্যবাদ। মাদ্রাজে যখন পৌঁছলুম তখন আধমরা। সমস্ত রাত্রি ও পরদিনের অনেকটা অংশ নিয়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে ভয় হোলো ফিরতে হয় বা। আমার একমাত্র সহায় বায়োকেমিক। সমস্ত রাত দুঃখে কাটিয়ে ভোরের দিকে সে কথা মনে পড়ল। বাক্স তোরঙ্গ ঘেঁটে ঘুঁটে খুঁজে বের করা গেল। মধ্যাহ্নে বোঝা গেল যে জাহাজে চড়া চল্‌বে। গুঁড়ো খেতে খেতে জাহাজে চড়লুম— এতটা সারল যে অভ্যর্থনার ধাক্কাও সইতে পেরেচি সে বড়ো কম ধাক্কা নয়। সমুদ্রে মনসুজের বিভীষিকা একটুও ছিলনা। সমস্ত রাস্তায় একটা ভদ্ররকমের দোলাও পাওয়া যায় নি। জাহাজওয়ালারা তাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যাবিন ও বসবার ঘরে আমাকে স্থান দিয়েচে। তাই একটু লিখ্‌তে পেরেছিলুম কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়। সেই আমার তেতলার ঘরেই কুমুদিনীর সঙ্গে আমার কলমের শেষ পরিচয়— সে একটা সঙ্কটের জায়গায় এতদিন চুপ করে বসে আছে— আবার কবে আমার কলমের ধাক্কায় তার ভাগ্যচক্র ঘুরতে আরম্ভ করবে তা বল্‌তে পারিনে,— হয়ত ভরতবর্ষে ফেরা পর্য্যন্ত এইরকম অচল অবস্থাতেই কাট্‌বে।

একটা খবর দিতে ভুলেচি কিন্তু সে খবর আমার চিঠির কাগজের প্রথম পাতার উপরের কোণেই আছে। নিমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমটা আমার মন কিছু উদ্বিগ্ন হয়েছিল— ভেবেছিলুম আরাম ও অবকাশ পাবনা। এখন দেখচি ভালোই হয়েচে। এখানে এত দল ও তাদের পরস্পরের মধ্যে এতই ঠোকাঠুকি যে তাদের সমস্ত অভিঘাত আমার উপরেই এসে পড়ত। এখানে একের আশ্রয়ে অনেকের ঝুটোপুটি থেকে বেঁচে গেছি। যতদূর বুঝতে পারচি, ঝুলির অনেকখানি ফাঁক রেখে এখান থেকে ফিরতে হবেনা। বিশ্বভারতীর মরাগাঙে বোধ হচ্চে যেন জোয়ারের পালা দেখা দিয়েচে।

আরিয়াম্ এখানে আগে এসে অনেকটা কাজ করেচে। তাকে শেষপর্য্যন্ত সঙ্গে রাখব স্থির করেচি। তোমাদের অসুস্থই দেখে এসেচি— সে জন্যে মন কিছু উদ্বিগ্ন আছে। কিন্তু মাঝখানে একখানা সমুদ্র রেখে উদ্বিগ্ন হবার কোনো মানে নেই। আশা করা যাক তোমরা সকলে ভালোই আছো। মীরুকে আমার খবর দিয়ো— তার খবরও মাঝে মাঝে পাঠাতে ভুলো না। এখানে গরমের ধাক্কাটা কেটে গেছে, বৃষ্টিবাদলাও বিশেষ নেই। ঠিক সময়েই এসেচি। আর কিছু দিন আগে এলে ঘেমে বারো আনা গলে যেতুম। অম্বালাদের আমার অভিবাদন জানিয়ো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪
৬ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ

কোয়ালা লাম্পুর

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, গোলেমালে দিন কাট্‌চে— মনে হচ্চে যেন বছর পাঁচেক ধরে এই কাণ্ডটা চল্‌চে। এতদিন জয়রথ হাঁকিয়ে চলেছিলুম বক্তৃতার ঘোড়া ছুটিয়ে— সহর থেকে সহরে চলেছিল টপাটপ্ শব্দে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে উঠ্‌ছিল চটাপট হাততালি। সম্প্রতি রথের চাকাটা হঠাৎ একটু বেধে গিয়েচে,— আমার শনিগ্রহ জেগে উঠেচে। ভারতবর্ষের কাগজে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো নিয়ে কড়া মন্তব্য লিখেছিলুম— সেই লেখাটা আমেরিকা ও চীন ঘুরে হঠাৎ এখানকার হাওয়ায় এসে পৌঁচেছে— একজন ফিরিঙ্গি এডিটর এই নিয়ে মাতামাতি বাধিয়ে দিয়েছে— আসর বেশ

সরগরম— আমরাও কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লেগে গেছি— মনে হচ্চে বেশি ক্ষতি হবেনা।

আজ চলেচি ইপো বলে এক জায়গায়। তার পরে পিনাঙে গিয়ে এখানকার লীলা শেষ। এখানকার বর্ণনা করে তোমাদের খুসি করব এমন কোনো আসবাব দেখিনে। এদেশে প্রাচীনকাল কোনো দিন আসে নি— তার ইতিহাসের ছেঁড়া ঝুলি ফেলে যায় নি। কলা লক্ষ্মীর নির্ম্মাল্য অনেক খুঁজেছি, পাওয়া যাচ্চে না। এখানে বর্ত্তমান শতাব্দী হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে বন কেটে রবার গাছ পুঁৎতে লেগেছে। দেশটা ঘন সবুজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই— সর্ব্বত্র ছায়ায় আলোয় যুগল মিলন— রাস্তা দিয়ে মোটর রথে যখন চলা যায় তখন দুই চোখের অঞ্জলি ভরে সবুজ অমৃত পান করা যায়। দেশটা নারকেল গাছের বাহু তুলে কবিকে অভ্যর্থনা করেছে— এখন যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষিণা দিয়ে যদি বিদায় করে তাহলে আমিও ভরা হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করব। যাই হোক্ না, শূন্য হাতে ফিরব বলে বোধ হচ্চে না। ইতিমধ্যে আমার দলবলের বেশ পেট ভরে আহার চল্‌চে— এ সম্বন্ধে সুনীতি সর্ব্বোচ্চ উপাধি পাবার যোগ্য, সুরেন সর্ব্বাধম।

সুবিখ্যাত ডুরিয়ান ফল খেয়েছি, খুব বেশি লোভনীয়ও নয় খুব হেয়ও যে তাও বলা যায় না। এখানকার পালা শেষ হবে পনেরই তারিখে, তার পরে জাভা— সেখানে আমার কোন্ গ্রহগুলি অপেক্ষা করচেন দেখা যাবে। তোমাদের কারো কোনো খবর পাই নি, কেবল দুই শিশি ওযুধ পেয়েছি। এখানে চিঠি পাওয়া সম্বন্ধে সময়ের নিয়ম আমাদের দেশে বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার নিয়মের মতো— মধ্যাহ্নভোজন বেলা একটাতেও হতে পারে, কিম্বা সন্ধ্যা পাঁচটায় কিম্বা রাত্তির দুপুরে। এই কারণে তোমাদের চিঠির আশা ত্যাগ করেই চিঠি লিখ্‌চি। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

১৭ অগস্ট ১৯২৭

ওঁ

মেডান

সুমাত্রা

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এ আর একটা দ্বীপ— সুমাত্রা। জায়গাটি সুন্দর, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। বেশ ঠাণ্ডা। এখানে এসে তোমরা যদি ফলের শস্যের বাগান করে গোরুবাছুর নিয়ে একটা আড্ডা করতে পার ত মন্দ হয় না। কিন্তু যাই বলো যে দেশ যত সুন্দরই হোক শান্তিনিকেতনের কাছে কিছুই লাগে না। তোমাদের কারো চিঠি পাই নি কিন্তু মেসোপটেমিয়ার একখানা চিঠিতে হঠাৎ শান্তিনিকেতনের হাওয়া এসে মনটাকে একটু উতলা করে দিলে। দেরি আছে ফিরতে। আজ বিকেলে চলেচি জাভার মুখে। বাকে এখানে এসেচে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। সকালে রাস্তায় রাস্তায় মাদ্রাজি সানাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিলে। সম্প্রতি মাদ্রাজি অপথ্য যতরকম আছে তাই দিয়ে আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা হোলো। আমার দলবল খুব খুসি হয়ে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে। আমার শক্তিতে কুলোয় না, দুই চক্ষে অশ্রু ঝরতে থাকে, হৃদয়দাহ উপস্থিত হয়। তাই আমি কেবল খাবার ভঙ্গী করেছি আসল কর্ত্তব্যটা আমার সঙ্গীদের উপরেই বরাত দিয়েছি। মনে সঙ্কল্প আছে বিকেলে যখন চা খাব রুটিমাখন কেকের প্রতিই বিশেষভাবে মনোযোগ করব। যাঁরা আহার করলেন তাঁরা মোটরগাড়ি করে সহর প্রদক্ষিণ করতে বেরলেন। এর থেকে বুঝতে পারবে আমাদের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ হয়েচে। আমি বক্তৃতা দিই, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করি, মাদ্রাজি শানাইয়ের আওয়াজে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকি, হয়রান হয়ে কোনো নতুন হোটেলে এসে যখন কেদারায় হেলান দিয়ে বসি প্রস্তাব আসে বাইরে রোদ্দুরে বসে ফোটোগ্রাফ নিতে

হবে— আর বাকি সকলে ভালো ভালো রল্‌স্‌ রয়েস্‌ মোটর গাড়ি চড়ে ভালো ভালো জায়গা দেখ্‌তে বেরোন, মালয় নাচ দেখে রাত্তির দেড়টার পর বাড়ি ফেরেন, যখন ইচ্ছে ঘুমোন্‌ দিনেই হোক্‌ রাত্তিরেই হোক্‌, যেখানে ইচ্ছে খান্‌ ঘরেই হোক বাইরেই হোক। আজ এখনি একদল ফোটোগ্রাফ-ওয়ালা আস্‌চে আমার ফোটোগ্রাফ তুল্‌বে বলে। এসে অবধি রোজ একটা দুটো ফোটোগ্রাফ তোলা চল্‌চেই। জাভাতে যে রকম আয়োজনের কথা শুনচি তাতে বোধ হচ্চে সেখানে জম্‌বে ভালো। তোমরা সঙ্গে থাক্‌লে খুসি হতুম। আমি তো ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে পাই নে— তোমরা দেখতে পেলে আমার এই ঘোরাঘুরির কষ্ট অনেকটা দূর হোত। লসিতার চিঠি থেকে বুঝতে পারচি যে তোমরা কলকাতায়, পুপে নন্দিনীকে নিয়ে কলকাতায়। কিন্তু এতদিনে নিশ্চয় শান্তিনিকেতনে এসেচ। এখন সেখানে ভরপূর বর্ষা। এদিকে বৃষ্টি বহুদিন একেবারেই হয় নি— কাল থেকে মেঘ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে ঘুম পাচ্চে এইখানে চিঠি বন্ধ করি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬
৩০ অগস্ট ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু,—

বৌমা, মালয় উপদ্বীপের বিবরণ আমাদের দলের লোকের চিঠিপত্র থেকে নিশ্চয় পেয়েছ। ভালো ক'রে দেখবার মতো ভাববার মতো লেখবার মতো সময় পাইনি। কেবল ঘুরেচি আর বকেচি। পিনাঙ থেকে জাহাজে

চ'ড়ে প্রথমে জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এসে পৌঁছন গেল। আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বড় সহর মাত্রই দেশের সহর নয়, কালের সহর। সবাই আধুনিক। সবাই মুখের চেহারায় একই, কেবল বেশভূষায় কিছু তফাৎ। অর্থাৎ কারো বা পাগড়িটা ঝক্‌ঝকে কিন্তু জামায় বোতাম নেই, ধুতিখানা হাঁটু পর্য্যন্ত, ছেঁড়া চাদরখানায় ধোপ পড়ে না, যেমন কলকাতা;— কারো বা আগাগোড়াই ফিট্‌ফাট ধোওয়া-মাজা উজ্জ্বল বসনভূষণ, যেমন বাটাভিয়া। সহরগুলোর মুখের চেহারা একই বলেছি, কথাটা ঠিক নয়; মুখ দেখা যায় না, মুখোষ দেখি। সেই মুখোষগুলো এক কারখানায় একই ছাঁচে ঢালাই-করা। কেউ বা সেই মুখোষ পরিষ্কার পালিশ ক'রে রাখে, কারো বা হেলায় ফেলায় মলিন। কলকাতা আর বাটাভিয়া উভয়েই এক আধুনিক কালের কন্যা, কেবল জামাতারা স্বতন্ত্র, তাই আদরযত্নে অনেক তফাৎ। শ্রীমতী বাটাভিয়ার সীঁথি থেকে চরণ-চক্র পর্য্যন্ত গয়নার অভাব নেই। তার উপরে সাবান দিয়ে গা মাজা-ঘষা ও অঙ্গলেপ দিয়ে ঔজ্জ্বল্য সাধন চল্‌চেই। কলকাতার হাতে নোয়া আছে কিন্তু বাজুবন্দ দেখিনে। তার পরে যে-জলে তার স্নান সে জলও যেমন, আর যে-গামছায় গা মোছা, তারও সেই দশা। আমরা চিৎপুর বিভাগের পুরবাসী, বাটাভিয়ায় এসে মনে হয় কৃষ্ণপক্ষ থেকে শুক্লপক্ষে এলুম।

হোটেলের খাঁচায় ছিলেম দিন তিনেক; অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। সমস্ত বিবরণ বোধ হয় সুনীতি কোনো-এক সময়ে লিখ্‌বেন। কেননা সুনীতির যেমন দর্শনশক্তি তেমনি ধারণাশক্তি। যত বড়ো তাঁর আগ্রহ তত বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট যে হয় না সে দুদিক থেকেই, রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। বুঝ্‌তে পারচি তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজে ক'রে বালী দ্বীপের দিকে রওনা হলুম।

ঘণ্টা কয়েকের জন্যে সুরবায়া সহরে আমাদের নামিয়ে নিলে। এও একটা আধুনিক সহর; জাভার আঙ্গিক নয়, জাভার আনুষঙ্গিক। আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে সহরটাকে নিউজীলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেও খাপছাড়া হয় না।

পার হ'য়ে এলেম বালী দ্বীপে। দেখলেম ধরণীর চিরযৌবনা মূর্ত্তি। এখানে প্রাচীন শতাব্দী নবীন হয়ে আছে। এখানে মাটির উপর অন্নপূর্ণার পাদপীঠ শ্যামল আস্তরণে দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তীর্ণ; বনচ্ছায়ার অঙ্কলালিত লোকালয় গুলিতে সচ্ছল অবকাশ। সেই অবকাশ উৎসবে অনুষ্ঠানে নিত্যই পরিপূর্ণ।

এই দ্বীপটুকুতে রেলগাড়ি নেই। রেলগাড়ি আধুনিক কালের বাহন। আধুনিক কালটি অত্যন্ত কৃপণ কাল, কোনো দিকে একটুমাত্র বাহুল্যের বরাদ্দ রাখ্‌তে চায় না। এই কালের মানুষ বলে Time is money। তাই কালের বাজে খরচ বন্ধ করবার জন্যে রেলের এঞ্জিন হাঁফাতে হাঁফাতে, ধোঁয়া ওগ্‌রাতে ওগ্‌রাতে মেদিনী কম্পমান ক'রে দেশদেশান্তরে ছুটো-ছুটি ক'রে বেড়াচ্চে। কিন্তু এই বালী দ্বীপে বর্ত্তমান কাল শত শত অতীত শতাব্দী জুড়ে এক হ'য়ে আছে। এখানে কাল সংক্ষেপ করবার কোনো দরকার নেই। এখানে যা-কিছু আছে তা চিরদিনের; যেমন একালের তেমনি সেকালের। ঋতুগুলি যেমন চলেচে নানা রঙের ফুল ফোটাতে ফোটাতে, নানা রসের ফল ফলাতে ফলাতে, এখানকার মানুষ বংশ-পরম্পরায় তেমনি চলেচে নানা রূপে বর্ণে গীতে নৃত্যে অনুষ্ঠানের ধারা বহন ক'রে।

রেলগাড়ি এখানে নেই কিন্তু আধুনিক কালের ভবঘুরে যারা এখানে আসে তাদের জন্যে আছে মোটর গাড়ি। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের দেখাশুনো ভোগ করা শেষ করা চাই। তারা আঁটকালের মানুষ এসে পড়েচে অপর্য্যাপ্ত কালের দেশে। এখানকার অরণ্য পর্ব্বত লোকালয়ের মাঝখান

দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলেচি আর কেবলি মনে হচ্চে এখানে পায়ে হেঁটে চলা উচিত। যেখানে পথের দুইধারে ইমারত সেখানে মোটরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুকে দৌড় করালে খুব বেশি লোকসান হয় না; কিন্তু পথের দুধারে যেখানে রূপের মেলা সেখানকার নিমন্ত্রণ সারতে গেলে গরজের মোটরটাকে গারাজেই রেখে আস্তে হয়। মনে নেই কি, শিকার করতে দুয্যন্ত যখন রথ ছুটিয়েছিলেন তখন তার বেগ কত; এই হচ্চে যাকে বলে প্রোগ্রেস্, লক্ষ্যভেদ করবার জন্যে তাড়াহুড়ো। কিন্তু তপোবনের সাম্নে এসে তাঁকে রথ ফেলে নামতে হোলো, লক্ষ্যসাধনের লোভে নয়, তৃপ্তিসাধনের আশায়। সিদ্ধির পথে চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে চলা ধীরে। আধুনিক কালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড প্রবল, তাই আধুনিক কালের বাহনের বেগ কেবলি বেড়ে যাচ্চে। যা-কিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না ক'রে স্পর্শ ক'রেই চ'লে যায়। এখন হ্যামলেটের অভিনয় অসম্ভব হ'ল, হ্যামলেটের সিনেমার হ'ল জিৎ।

আমাদের মোটর যেখানে এসে থামল সেখানে এক বিপুল উৎসব। জায়গাটার নাম বাঙ্‌লি। কোনো-এক রাজবংশের কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এর মধ্যে শোকের চিহ্ন নেই। না থাকবারই কথা,— রাজার মৃত্যু হয়েচে অনেকদিন আগে, এতদিনে তাঁর আত্মা দেবসভায় উত্তীর্ণ, উৎসব তাই নিয়ে। বহুদূর থেকে গ্রামের পথে পথে মেয়ে পুরুষেরা ভারে ভারে বিচিত্র রকমের নৈবেদ্য নিয়ে আসচে;— যেন কোন্-পুরাণে বর্ণিত যুগ হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে বেঁচে উঠ্‌ল; যেন অজন্তার শিল্পকলা চিত্রলোক থেকে প্রাণলোকে সূর্য্যের আলো ভোগ করতে এসেচে। মেয়েদের বেশভূষা অজন্তার ছবিরই মতো। এখানে আবরণ-বিরলতার স্বাভাবিক আবরু সুন্দর হ'য়ে দেখা দিল, সেটা চারিদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত; এমন কি, যে-কয়েকজন আমেরিকান মিশনরি দর্শকরূপে এখানে এসেচে, আশা করি তারাও এই দৃশ্যের সুশোভন সুরুচি সহজ মনে অনুভব করতে পেরেচে।

যজ্ঞক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। এই উপলক্ষ্যে সেখানে অনেকগুলি বাঁশের উঁচু মাচা-বাঁধা ঘরে এখানকার ব্রাহ্মণেরা সুসজ্জিত হ'য়ে শিখা বেঁধে ভূরি ভূরি খাদ্যবস্ত্র ফলপুষ্পপত্রের নৈবেদ্যের মধ্যে নানা রকম মুদ্রা সহযোগে মন্ত্র পড়চে; তারা কেউ বা কত রকম অর্ঘ্য উপকরণ তৈরি করচে। কোথাও বা এখানকার বহুযন্ত্রমিলিত সঙ্গীত; এক জায়গায় তাঁবুর মধ্যে পৌরাণিক যাত্রার অভিনয়। উৎসবের এত অতি-বৃহৎ আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখিনি। অথচ কোথাও অসুন্দর বা বিশৃঙ্খল কিছু নেই,— বিপুল সমারোহের দৃশ্যরূপটি বস্তুরাশির অসংলগ্নতায় বা জনতার ঠেলাঠেলিতে খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে যায় নি। এতগুলি মানুষের সমাবেশ, অথচ গোলমাল বা নোংরামি বা অব্যবস্থা নেই। উৎসবের অন্তর্নিহিত সুন্দর ঐক্যবন্ধনেই সমস্ত ভিড়ের লোককে আপনিই সংযত ক'রে বেঁধেচে। সমস্ত ব্যাপারটি এত বৃহৎ এত বিচিত্র আর আমাদের পক্ষে এত অপূর্ব্ব যে এর বিস্তারিত বর্ণনা করা অসম্ভব। হিন্দু অনুষ্ঠানবিধির সঙ্গে এদেশের লোকের চিত্তবৃত্তির মিল হ'য়ে এই যে সৃষ্টি, এর রূপের প্রাচুর্য্যটিই বিশেষ ক'রে দেখবার ও ভাববার জিনিষ। অপরিমিত উপকরণের দ্বারা নিজেকে অশেষভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা, সেই প্রকাশ কেবলমাত্র বস্তুকে পুঞ্জিত ক'রে নয়, তাকে নানা নিপুণ রীতিতে সজ্জিত ক'রে।

জাপানের সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থার মিল আছে। জাপানের মতোই এখানে দ্বীপটি আয়তনে ছোটো, অথচ এখানে প্রকৃতির রূপটি বিচিত্র, এবং তার সৃষ্টিশক্তি প্রচুর ভাবে উর্ব্বরা। পদে পদেই পাহাড় ঝরণা নদী প্রান্তর অরণ্য অগ্নিগিরি সরোবর। অথচ দেশটি চলা ফেরার পক্ষে সুগম, নদী-পর্ব্বতের পরিমাণ ছোটো, প্রজাসংখ্যা বেশি, ভূমির পরিমাণ কম, এই জন্যে কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা চাযের যোগ্য সমস্ত জমি সম্পূর্ণরূপে এরা চ'ষে ফেলেচে, ক্ষেতে ক্ষেতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল সেঁচ দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা এদেশে দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। এখানে দারিদ্র্য নেই,

রোগ নেই, জলবায়ু সুখকর। দেবদেবীবহুল, কাহিনীবহুল, অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত,— সেই প্রকৃতি এখানকার শিল্পকলায়, সামাজিক অনষ্ঠানে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যের প্রবর্ত্তনা করেছে।

· জাপানের সঙ্গে এর মস্ত একটা তফাৎ। জাপান শীতের দেশ, জাভা বালী গরমের দেশ। জাপান অন্য শীতের দেশের লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে রক্ষা করতে পারলে, জাভা বালী তা পারে নি। আত্মরক্ষার জন্যে যে দৃঢ়নিষ্ঠ অধ্যবসায় দরকার এদের তা ছিল না। গরম হাওয়া প্রাণের প্রকাশকে যেমন তাড়াতাড়ি পরিণত করে, তেমনি তাড়াতাড়ি ক্ষয় করতে থাকে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শক্তিকে সে শিথিল করে, জীবনের অধ্যবসায়কে ক্লান্ত ক'রে দেয়। বাটাভিয়া সহরটি যে এমন নিখুঁৎ ভাবে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তার কারণ, শীতের দেশের মানুষ এর ভার নিয়েচে; তাদের শীতের দেশের দেহে শক্তি অনেককাল থেকে বংশানুক্রমে অস্থিতে মজ্জাতে পেশীতে স্নায়ুতে পুঞ্জীভূত, তাই তাদের অক্লান্ত মন সর্ব্বত্র ও প্রতিমুহূর্ত্তে আপনাকে প্রয়োগ করতে পারে। আমরা কেবলি বলি, যথেষ্ট হয়েচে, তুমিও যেমন, চ'লে যাবে। যত্ন জিনিষটা কেবল হৃদয়ের জিনিষ নয়, শক্তির জিনিষ। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে শক্তির প্রাচুর্য্য চাই। শক্তি-সঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। বৈরাগ্য নিজের উপর থেকে সমস্ত দাবী কমিয়ে দেয়। বাইরের অসুবিধা, অস্বাস্থ্য, অব্যবস্থা সমস্তই মেনে নেয়। নিজেকে ভোলাবার জন্যে বল্‌তে চেষ্টা করে যে, ও-গুলো সহ্য করার মধ্যে যেন মহত্ত্ব আছে। যার শক্তি অজস্র সে সমস্ত দাবী মেনে নিতে আনন্দ পায়, এই জন্যেই সে জোরের সঙ্গে বেঁচে থাকে, ধ্বংসের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না। য়ুরোপে গেলে সব চেয়ে আমার চোখে পড়ে মানুষের এই সদা-জাগ্রত যত্ন। যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়ান্স, তার প্রধান লক্ষণ হচ্চে জ্ঞানের জন্যে অপরাজিত

যত্ন। কোথাও আন্দাজ খাট্‌বে না, খেয়ালকে মান্‌বে না, বল্‌বে না ধ'রে নেওয়া যাক্, বল্‌বে না সর্ব্বজ্ঞ ঋষি এই কথা ব'লে গেছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়; সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন আগাছার জঙ্গলের মত জেগে ওঠে, নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ ক'রে ফেলে। বৈরাগ্যের অযত্নে দিনে দিনে চারদিকে যে প্রভূত আবর্জ্জনায় অবরোধ জ'মে ওঠে তাতেই মানুষের পরাভব ঘটায়। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণ পথে চলে, এগোয় না, কেবলি ঘোরে। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে, হাজার বছর আগে যে-মন্দির তৈরি হয়েছে ঠিক তারি নকল করবার জন্যে। তার বেশি তার সাহস নেই, ক্লান্ত মনের শক্তি নেই, পাখীর অসাড় ডানা খাঁচার বাইরে নিজেকে মেলে দিতে আনন্দ পায় না। খাঁচার কাছে হার মেনে যে-পাখী চিরকালের মত ধরা দিয়েচে সমস্ত বিশ্বের কাছে তাকে হার মান্‌তে হোলো।

এদেশে এসে প্রথমে আনন্দ হয় এখানকার সব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে। তারপরে ক্রমে মনে সন্দেহ হ'তে থাকে এ হয় ত খাঁচার সৌন্দর্য্য, নীড়ের সৌন্দর্য্য নয়,— এর মধ্যে হয় তো চিত্তের স্বাধীনতা নেই। অভ্যাসের যন্ত্রে নিখুঁৎ নকল শত শত বৎসর ধ'রে ধারাবাহিক ভাবে চলেচে। আমরা যারা এখানে বাহির থেকে এসেচি আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেচে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্ত্তমানভাবে দেখতে পাচ্চি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুর ভাবে আপন পরিচয় দিয়েচে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্ত্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন? বর্ত্তমান সেই অতীতের বাহন মাত্র হ'য়ে বল্‌চে,

আমি হার মান্‌লুম; সে দীনভাবে বল্‌চে এই অতীতকে প্রকাশ ক'রে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে। নিজের পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্চে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের পরে দাবী যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবী স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব বৈরাগ্য-মেবাভয়ং অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।

সেদিন বাঙ্‌লিতে আমরা যে অনুষ্ঠান দেখেচি সেটা প্রেতাত্মার স্বর্গারোহণ পর্ব্ব। মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্ব্বে; এতদিনে আত্মা দেব সভায় স্থান পেয়েছে ব'লে এই বিশেষ উৎসব। সুখবতী নামক জেলায় উবুদ্ নামক সহরে হবে দাহক্রিয়া, আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বরে। ব্যাপারটার মধ্যে আরো অনেক বেশি সমারোহ থাকবে— কিন্তু তবু সেই মাদ্রাজি চেটির ৩৫ লক্ষ টাকার মন্দির। এ বহু বহু শতাব্দীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই চলেছে, এর আর অন্ত নেই। এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে— যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্ম্মূল্য চালে। এখানে অতীত কালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেচে বহুকাল ধ'রে, বর্ত্তমানকালকে আপন সর্ব্বস্ব দিতে হ'চ্চে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েচে যে অতীতকাল যত বড কালই হোক্ নিজের সম্বন্ধে তার একটা স্পর্দ্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেচি, সেটা এইখানে তুলে দিয়ে এই দীর্ঘ পত্র শেষ করি।

নন্দ গোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বল্‌লে আমায় হেসে
"আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখ্‌খনো কি পারো?
বারে বারেই হারো।"

আমি বল্‌লেম, "তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক্ দেখি তো লড়াই!"
"আচ্ছা, তবে দেখাই তোমায়," এই ব'লে সে যেম্‌নি টান্‌লে হাত
দাদামশায় তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আন্‌লে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাৎ॥

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি কইলেম, "বল্‌তে হবে তা কি?
ধূলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি?
এই কথা কি জানো
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মানো
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধূলোয় যেদিন পড়ব, যেন এই জানি নিশ্চিত
তোমারি শেষ জিৎ॥"

ইতি

কারেম আসন। বালি

৩৭

১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

ওঁ

বৌমা

সেদিন বালিতে থাকতে থাকতে ভোর রাত্রে খুব স্পষ্ট একটা স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যেন জোড়াসাঁকোর বারান্দায় রথী গম্ভীরমুখে আমাকে এককোণে

ডেকে নিয়ে বল্‌লেন, ভাবনার বিশেষ কোনো কারণ নেই কিন্তু ডাক্তারের মতে তোমার অসুখটা আসলে Chronic influenza, শিলাইদহে তোমাকে নিয়ে আমি যদি বোটে কাটিয়ে আস্‌তে পারি তাহলে তোমার উপকার হবে। আমি বল্‌লুম, নিশ্চয় নিয়ে যাব। বলে ডাক্তারের সঙ্গে কর্ত্তব্য আলোচনা করতে লাগ্‌লুম — ডাক্তারটি বাঙালী কিন্তু তাকে চিনিনে, জেগে উঠে মনটা বড়ো উদ্বিগ্ন হল। হিসাব করে দেখলুম, এটা ভাদ্র মাস, এই সময়েই তোমার হাঁপানি বাড়বার কথা। মনে হল তোমার হয় তো হাঁপানি এবার বেশি প্রবল হয়েচে তাই এই রকম স্বপ্ন দেখ্‌লুম। যাই হোক্ এখন তো কিছু করবার নেই। ভাবচি ফিরে গিয়ে সত্যিই তোমাকে কিছুদিন পদ্মাচরের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসব— আমার বিশ্বাস তোমার তাতে উপকার হবে। এই সব নানা চিন্তায় মনটা দেশে ফিরতে চাচ্চে। ১ অক্টোবরে এখান থেকে জাহাজ ছাড়বে তার পরে শ্যাম বর্ম্মা হয়ে ফিরতে হয় ত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ হবে— অর্থাৎ এখনো এক মাসের উপর। ইতি

বাবামশায়

৩৮

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সুরকর্তা, জাভা

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বালি থেকে পার হয়ে জাভা দ্বীপে সুরবায়া শহরে এসে নামা গেল। এই জায়গাটা হচ্ছে বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখড়া। জাভার সব চেয়ে বড়ো উৎপন্ন জিনিস চিনি, এই ছোটো দ্বীপটি থেকে দেশবিদেশে চালান যাচ্ছে। এমন এক কাল ছিল, পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল

ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কী দান করেন আজকাল তারই উপরে ভরসা রাখতে গেলে ঠকতে হয়, মানুষ কী আদায় ক'রে নিতে পারে এইটেই হল আসল কথা। গোরু আপনা-আপনি যে-দুধটুকু দেয় তাতে যজ্ঞের আয়োজন চলে না, গৃহস্থের শিশুদের পেট ভরিয়ে বৌবাজারের দোকানে গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই কেঁড়ে শূন্য হয়ে যায়। যারা ওস্তাদ গোয়ালা তারা জানে কিরকম খোরাকি ও প্রজননবিধির দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তারা জানে, কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনোদিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভরে থাকে; সম্পূর্ণ দুইয়ে-নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত। আমাদের কর্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ি ভারতবর্ষে বসিয়েছেন, চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুলজার হল; কিন্তু, এদিকে আমাদের চাযের খেত নির্জীব হয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাযিদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েছে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেছে, তার রিপোর্টও বেরোবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে নড়ে উঠবে কিনা জানি নে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগবে মজুরি মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েছে; তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েছে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যাবসা চলছে ভালো। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্ছে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস ব্যবহার করব, এটা ভালো কথা; কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিস-উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে, এটা হল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার; সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান্ রক্ষা হবে।

সুরবায়াতে তিন দিন আমরা যাঁর বাড়িতে অতিথি ছিলেম তিনি সুরকর্তার রাজবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তিনি আপন অধিকার ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করে এই শহরে এসে বাণিজ্য করছেন। চিনি রপ্তানির কারবার; তাতে তাঁর প্রভূত মুনফা। চমৎকার মানুষটি, প্রাচীন অভিজাত-কুলযোগ্য মর্যাদা ও সৌজন্যের অবতার। তাঁর ছেলে আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; বিনীত, নম্র, প্রিয়দর্শন— তাঁরই উপরে আমাদের অতিথিপরিচর্যার ভার। বড়ো ভয় ছিল, পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম-অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেম। তাঁদের প্রাসাদের এক অংশ সম্পূর্ণ আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিরালায় ছিলেম, ত্রুটিবিহীন আতিথ্যের পনেরো-আনা অংশ ছিল নেপথ্যে। কেবল আহারের সময়েই আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ। মনে হত, আমিই গৃহকর্তা, তাঁরা উপলক্ষ মাত্র। সমাদরের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল স্বাধীনতা ও অবকাশ।

এখানে একটি কলাসভা আছে। সেটা মুখ্যত য়ুরোপীয়। এখানকার সওদাগরদের ক্লাবের মতো। কলকাতায় যেমন সংগীতসভা এও তেমনি। কলকাতার সভায় সংগীতের অধিকার যতখানি এখানে কলাবিদ্যার অধিকার তার চেয়ে বেশি নয়। এইখানে আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমার প্রতি অনুরোধ ছিল; যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলেছি। একদিন আমাদের গৃহকর্তার বাড়িতে অনেকগুলি এদেশীয় প্রধান ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার কাজ। সুনীতিও একদিন তাঁদের সভায় বক্তৃতা করে এসেছেন; সকলের ভালো লেগেছে।

এখানকার ভারতীয়েরাও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে এখানকার রাজপুরুষ ও অন্য অনেককে নিমন্ত্রণ ক'রে চা

খাইয়েছিলেন। সেদিন আমি কিছু দক্ষিণাও পেয়েছি। এইভাবে এখানে কেটে গেল, একেবারে এঁদের বাড়ির ভিতরেই। আঙিনায় অনেকগুলি গাছ ও লতাবিতান। আমগাছ, সপেটা, আতা। যে-জাতের আম তাকে এরা বলে মধু, এদের মতে বিশেষভাবে স্বাদু। এবার যথেষ্ট বৃষ্টি হয় নি বলে আমগুলো কাঁচা অবস্থাতেই ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। এখানে ভোজনকালে যে-আম খেতে পেয়েছি দেশে থাকলে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর বলে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয় নি।

এই আঙিনায় লতামণ্ডপের ছায়ায় আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রায়ই বেলা কাটান। চারদিকে শিশুরা গোলমাল করছে, খেলা করছে— সঙ্গে তাদের বুড়ী ধাত্রীরা। মেয়েরা যেখানে-সেখানে বসে কাপড়ের উপর এদেশে-প্রচলিত সুন্দর বাতির ছাপ-দেওয়া কাজে নিযুক্ত। গৃহকর্মের নানা প্রবাহ এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত প্রাঙ্গণের চার দিকে আবর্তিত।

পরশু সুরবায়া থেকে দীর্ঘ রেলপথ ও রৌদ্রতাপক্লিষ্ট অপরাহ্লের ছ'টি ঘণ্টা কাটিয়ে তিনটের সময় সুরকর্তায় পৌঁচেছি। জাভার সবচেয়ে বড়ো রাজপরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েছে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারে নি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়িতে আছি। তাঁদের উপাধি মঙ্কুনগরো; এঁদেরই এক শাখা সুরবায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

প্রাসাদের একটি নিভৃত অংশ আমরাই অধিকার করে আছি। এখানে স্থান প্রচুর, আরামের উপকরণ যথেষ্ট, আতিথ্যের উপদ্রব নেই। রাজবাড়ি বহুবিস্তীর্ণ, বহুবিভক্ত। আমরা যেখানে আছি তার প্রকাণ্ড একটি অলিন্দ, সাদা মার্বল পাথরে বাঁধানো, সারি সারি কাঠের থামের উপরে ঢালু কাঠের ছাদ। এই রাজপরিবারের বর্ণলাঞ্ছন হচ্ছে সবুজ ও হলদে, তাই এই অলিন্দের থাম ও ছাদ সবুজে সোনালিতে চিত্রিত। অলিন্দের এক ধারে গামেলান-

সংগীতের যন্ত্র সাজানো। বৈচিত্র্যেও কম নয়, সংখ্যাতেও অনেক। সাত সুরের ও পাঁচ সুরের ধাতুফলকের যন্ত্র অনেক রকমের, অনেক আয়তনের, হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। ঢোলের আকার ঠিক আমাদের দেশেরই মতো, বাজাবার বোল ও কায়দা অনেকটা সেই ধরনের। এ ছাড়া বাঁশি, আর ধনু দিয়ে বাজাবার তাঁতের যন্ত্র।

রাজা স্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একত্র আহারের সময় তাঁর সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল। অল্প বয়স, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী। ডাচ্ ভাষায় আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েছেন; ইংরেজি অল্প অল্প বলতে ও বুঝতে পারেন। খেতে বসবার আগে বারান্দার প্রান্তে বাজনা বেজে উঠল, সেই সঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেল। সে-গানে আমাদের মতো আস্থায়ী-অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধুয়ো বারবার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা কিছু তা যন্ত্র বাজনায়। পূর্বের চিঠিতেই বলেছি, এদের যন্ত্রবাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে-সপ্তকে গান ধরা হয় তারই সা সুরে বাঁধা; এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব সুরগুলিই আছে। মনে করো, "তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী" ভৈরবীর এই এক ছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর সুরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে তাহলে যেমন হয় এও সেইরকম। পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে, শুনতে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে সুরের নৃত্যে আসর খুব জমে ওঠে।

খেয়ে এসে আবার আমরা বারান্দায় বসলুম। নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে

একরকম সোনার বাজুবন্দ— তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায়-সবুজে-মেলানো আঁট কাঁচুলি; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারার বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বর্তিকশিল্পে বিচিত্র; দেখবামাত্রই মনে হয়, অজন্তার ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখি নি। আমাদের নর্তকী বাইজিদের আঁটপায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেছে। তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারি দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়, সাজানো একটা মস্ত বোঝা। তারপরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কারজনক বলে বোধ হয়— নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে। জাপানে ও জাভাতে যে-নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত। আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।

শুনেছি, অনেক য়ুরোপীয় দর্শক এই নাচের অতিমৃদুতা ও সৌকুমার্য ভালোই বাসে না। তারা উগ্র মাদকতায় অভ্যস্ত বলে এই নাচকে একেঘেয়ে মনে করে। আমি তো এ নাচে বৈচিত্র্যের একটু অভাব দেখলুম না; সেটা অতিপ্রকট নয় বলেই যদি চোখে না পড়ে তবে চোখেরই অভ্যাসদোষ। কেবলই আমার এই মনে হচ্ছিল যে, এ হচ্ছে কলাসৌন্দর্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, উপাদানরূপে মানুষটি তার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে। নাচ হয়ে গেলে এরা যখন বাজিয়েদের মধ্যে এসে বসল তখন তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তখন দেখতে পাওয়া যায়, তারা গায়ে রঙ করেছে, কপালে চিত্র করেছে, শরীরের অতিস্ফূর্তিকে নিরস্ত করে দিয়ে একটি নিবিড় সৌষ্ঠব

প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট করে কাপড় পরেছে— সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সমস্তই অসংগত, এতে চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু, সাধারণ মানুষের এই রূপান্তর নৃত্যকলায় অপরূপই হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে ও অন্তঃপুরে আহূত হয়েছিলেম। সেখানে স্তম্ভশ্রেণীবিধৃত অতি বৃহৎ একটি সভামণ্ডপ দেখা গেল; তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য দেখে ভারি আনন্দ পেলুম। এ-সমস্তর উপযুক্ত বিবরণ তোমরা নিশ্চয় সুরেন্দ্রের চিঠি ও চিত্র থেকে পাবে। অন্তঃপুরে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি মণ্ডপে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গৃহকর্তা ও গৃহস্বামিনী বসে আছেন। রানীকে ঠিক যেন একজন সুন্দরী বাঙালী মেয়ের মতো দেখতে; বড়ো বড়ো চোখ, স্নিগ্ধ হাসি, সংযত সৌযম্যের মর্যাদা ভারি তৃপ্তিকর। মণ্ডপের বাইরে গাছপালা আর নানারকম খাঁচায় নানা পাখি। মণ্ডপের ভিতরে গানবাজনার, ছায়াভিনয়ের, মুখোষের অভিনয়ের, পুতুলনাচের নানা সরঞ্জাম। একটা টেবিলে বার্তিক শিল্পের অনেকগুলি কাপড় সাজানো। তার মধ্যে থেকে আমাকে তিনটি কাপড় পছন্দ করে নিতে অনুরোধ করলেন। সেই সঙ্গে আমার দলের প্রত্যেককে একটি একটি করে এই মূল্যবান কাপড় দান করলেন। কাপড়ের উপর এইরকম শিল্প-কাজ করতে দু-তিন মাস করে লাগে। রাজবাড়ির পরিচারিকারাই এই কাজে সুনিপুণ।

এই রাজবংশীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিবারের যাঁরা, কাল রাত্রে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর ওখানে রাজকায়দার যতরকমের উপসর্গ। যেমন দুই সারস পাখি পরস্পরকে ঘিরে ঘিরে নানা গম্ভীর ভঙ্গীতে নাচে দেখেছি, এখানকার রেসিডেন্ট্ আর এই রাজা পরস্পরকে নিয়ে সেইরকম রাজকীয় চাল বিস্তার করতে লাগলেন। রাজা কিম্বা রাজপুরুষদের একটা পদোচিত মর্যাদা বাইরের দিক থেকে রক্ষা করে চলতে হয়, মানি; তাতে সেই-

সব মানুষের সামান্যতা কিছু ঢাকাও পড়ে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তাতে তাদের সাধারণতাকেই হাস্যকরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।

কাল রাত্রে যে-নাচ হল সে ন'জন মেয়েতে মিলে। তাতে যেমন নৈপুণ্য তেমনি সৌন্দর্য, কিন্তু দেখে মনে হল, কাল রাত্রের সেই নাচে স্বত-উচ্ছ্বসিত প্রাণের উৎসাহ ছিল না; যেন এরা ক্লান্ত, কেবল অভ্যাসের জোরে নেচে যাচ্ছে। কালকের নাচে গুণপনা যথেষ্ট ছিল কিন্তু তেমন ক'রে মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। রাজার একটি ছেলে পাশে বসে আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগল। অল্প বয়স, দুই বছর হল্যাণ্ডে শিক্ষা পেয়েছেন, ওলন্দাজ গবর্নমেণ্টের সৈনিকবিভাগে প্রধান পদে নিযুক্ত। তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে স্বাভাবিক আকর্ষণীশক্তি আছে।

কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হয়ে গেল। পূর্বরাত্রে যে-দুজন বালিকা নেচেছিল তাদের মধ্যে একজন আজ পুরুষ-সঙের মুখোষ পরে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য ব্যাপারটা হচ্ছে, এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা করেও ভাবেভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা করে গেল। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হল না। বেশভূষার সৌন্দর্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না করেও-যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন করে আনা যেতে পারে, এ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকল। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করতে চায়, সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখতে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকেও বিরূপ করতে পারে না; এদের রাক্ষসেরাও নাচে।

৩৯

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, শেষ চিঠিতে তোমাকে এখানকার নাচের কথা লিখেছিলুম, ভেবেছিলুম, নাচ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়ে গেল। এমন সময়ে সেই রাত্রে আর-এক নাচের বৈঠকে ডাক পড়ল। সেই অতিপ্রকাণ্ড মণ্ডপে আসর ; বহুবিস্তীর্ণ শ্বেত পাথরের ভিত্তিতলে বিদ্যুদ্দীপের আলো ঝল্‌মল্‌ করছে। আহারে বসবার আগে নাচের একটা পালা আরম্ভ হল— পুরুষের নাচ, বিষয়টা হচ্ছে, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের লড়াই। এখানকার রাজার ভাই ইন্দ্রজিত সেজেছেন ; ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় ইনি নাচ শিখতে আরম্ভ করেছেন। অল্প বয়সে সমস্ত শরীরটা যখন নম্র থাকে, হাড় যখন পাকে নি, সেই সময়ে এই নাচ শিক্ষা করা দরকার ; দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাতে অতি সহজে সরে, প্রত্যেক মাংসপেশিতে যাতে অনায়াসে জোর পৌঁছয়, এমন অভ্যাস করা চাই। কিন্তু, নাচ সম্বন্ধে রাজার ভাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকাতে তাঁকে বেশি চেষ্টা করতে হয় নি।

হনুমান বনের জন্তু, ইন্দ্রজিত সুশিক্ষিত রাক্ষস, দুই জনের নাচের ভঙ্গীতে সেই ভাবের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই, নইলে রসভঙ্গ হয়। প্রথমেই যেটা চোখ পড়ে সে হচ্ছে এদের সাজ। সাধারণত আমাদের যাত্রায় নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশি করে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক করবার চেষ্টা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তার মনুষ্যত্ব আরও বেশি উজ্জ্বল হয়েছে। হনুমানের নাচে লম্ফঝম্ফ দ্বারা তার বানরস্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হত না, আর সেই উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠত, কিন্তু কঠিন কাজ

হচ্ছে হনুমানকে মহত্ত্ব দেওয়া। বাংলাদেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখলে বোঝা যায় যে, হনুমানের বীরত্ব, তার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে— তার লেজের দৈর্ঘ্য, তার পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, তার বানরত্বই বাঙালির মনকে বেশি করে অধিকার করেছে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তার উলটো। এমন কি, হনুমানপ্রসাদ নাম রাখতে বাপমায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমানচন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা করতে পারি নে। এ দেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখলুম— পিঠ বেয়ে মাথা পর্যন্ত লেজ, কিন্তু এমন একটা শোভনভঙ্গী যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর-সমস্তই মানুষের মতো। মুকুট থেকে পা পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের সাজসজ্জা, একটি সুন্দর ছবি। তার পরে দুই জনে নাচতে নাচতে লড়াই; সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে-ঢোলে কাঁসরে-ঘণ্টায় নানাবিধ যন্ত্রে ও মাঝে মাঝে বহু মানুষের কণ্ঠের গর্জনে সংগীত খুব গম্ভীর প্রবল ও প্রমত্ত হয়ে উঠছে। অথচ, সে সংগীত শ্রুতিকটু একটুও নয়; বহুযন্ত্র-সম্মিলনের সুশ্রাব্য নৈপুণ্য তার উদ্দামতার সঙ্গে চমৎকার সম্মিলিত।

নাচ, সে বড়ো আশ্চর্য। তাতে যেমন পৌরুষ সৌন্দর্যও তেমনি। লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব-অভিনয়ে নাচের প্রকৃতি একটুমাত্র এলোমেলো হয়ে যায় নি। আমাদের দেশের স্টেজে রাজপুত বীরপুরুষের বীরত্ব যে-রকম নিতান্ত খেলো এ তা একেবারেই নয়। প্রত্যেক ভঙ্গীতে ভারি একটা মর্যাদা আছে। গদাযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, মুষলের আঘাত, সমস্তই ত্রুটিমাত্রবিহীন নাচে ফুটে উঠেছে। সমস্তর মধ্যে অপূর্ব একটি শ্রী অথচ দৃপ্ত পৌরুষের আলোড়ন। এর আগে এখানে মেয়েদের নাচ দেখেছি, দেখে মুগ্ধও হয়েছি, কিন্তু এই পুরুষের নাচের তুলনায় তাকে ক্ষীণ বোধ হল। এর স্বাদ তার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। যখন ধ্রুপদের নেশায় পেয়ে বসে তখন টপ্পার নিছক মিষ্টতা হালকা বোধ হয়, এও সেইরকম।

আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্তা আর-একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দুজনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জুন আর সুবলের যুদ্ধ। গল্পটা হয়তো মহাভারতে আছে কিন্তু আমার তো মনে পড়ল না। ব্যাপারটা হচ্ছে— কোন্‌-এক বাগানে অর্জুনের অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্র চুরি করেছে সুবল, সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অর্জুনকে মারবার জন্যে। অর্জুন ছিল বাগানের মালী-বেশে। খানিকটা কথাবার্তার পরে দুজনের লড়াই। সুবলের কাছে বলরামের লাঙল অস্ত্রটা ছিল। যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন সেটা কেড়ে নিয়ে তবে সুবলকে মারতে পারলে।

নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করে নি। তার কারণ, যারা নাচছে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কী সেইটেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে বলেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরও যেন তীব্র হয়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীররসের উচ্ছলতা। মনে করো না— বাঘ নয়, সিংহ নয়, জবাফুলে ধুতরাফুলে সাংঘাতিক হানাহানি, ডাঁটায় ডাঁটায় সংঘর্ষ, পাপড়িগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন; এদিকে বনসভা কাঁপিয়ে বৈশাখী ঝড়ের গামেলান বাজছে, গুরুগুরু মেঘের মৃদঙ্গ, গাছের ডালে ডালে ঠকাঠকি, আর সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের বাঁশি।

সব-শেষে এলেন রাজার ভাই। এবার তিনি একলা নাচলেন। তিনি ঘটোৎকচ। হাস্যরসিক বাঙালি হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি করে এসেছে। এখানকার লোকচিত্তে ঘটোৎকচের খুব আদর। সেইজন্যেই মহাভারতের গল্প এদের হাতে আরও অনেকখানি বেড়ে গেল। এরা ঘটোৎকচের সঙ্গে ভার্গিবা (ভার্গবী) বলে এক মেয়ের ঘটালে বিয়ে। সে-মেয়েটি আবার অর্জুনের কন্যা। বিবাহ সম্বন্ধে এদের প্রথা য়ুরোপের কাছাকাছি যায়। খুড়তুতো জাঠতোত ভাইবোনে বাধা নেই। ভার্গিবার গর্ভে

ঘটোৎকচের একটি ছেলেও আছে, তার নাম শশিকিরণ। যা হোক, আজকের নাচের বিষয়টা হচ্ছে, প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন কি, মাঝে মাঝে মূর্ছার ভাবে সে মাটিতে বসে পড়ছে, কল্পনায় আকাশে তার ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাকতে না পেরে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চলে গেল। এর মধ্যে একটি ভাববার জিনিস আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয় নি। চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ওড়ার ভাব দেখিয়েছে। এর থেকে মনে পড়ে গেল শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশবাক্য— রথবেগং নাটয়তি। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।

রামায়ণের মহাভারতের গল্প এ দেশের লোকের মনকে জীবনকে যে কিরকম গভীরভাবে অধিকার করেছে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে, বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতিকাল পরেই দেখতে দেখতে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে; এমন কি যেখান থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি করে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্বোধন কলারচনায় নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল বরোবুদরের মূর্তিকল্পনায়। আজ এখানকার মেয়েপুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিতকথাকে নৃত্যমূর্তিতে প্রকাশ করছে; ছন্দে ছন্দে এদের রক্তপ্রবাহে সেই-সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

এ ছাড়া কত রকম-বেরকমের অভিনয়, তার অধিকাংশই এই-সকল বিষয় নিয়ে। বাইরের দিকে ভারতবর্ষের থেকে এরা বহু শতাব্দী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তবু এতকাল এই রামায়ণ মহাভারত নিবিড়ভাবে ভারতবর্ষের

মধ্যেই এদের রক্ষা করে এসেছে। ওলন্দাজরা এই দ্বীপগুলিকে বলে 'ডাচ ইণ্ডীস', বস্তুত এদের বলা যেতে পারে 'ব্যাস ইণ্ডীস'।

পূর্বেই বলেছি, এরা ঘটোৎকচের ছেলের নাম রেখেছে শাশকিরণ। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম রচনা এদের আজও চলেছে। মাঝে মাঝে নামকরণ অদ্ভুতরকম হয়। এখানকার রাজবৈদ্যের উপাধি ক্রীড়নির্মল। আমরা যাকে নিরাময় বা নীরোগ বলে থাকি এরা নির্মল শব্দকে সেই অর্থ দিয়েছে। এদিকে ক্রীড় শব্দ আমাদের অভিধানে খেলা, কিন্তু ক্রীড় বলতে এখানে বোঝাচ্ছে উদ্যোগ। রোগ দূর করাতেই যার উদ্যোগ সেই হল ক্রীড়নির্মল। ফসলের খেতে যে সেঁচ দেওয়া হয় তাকে এরা বলে সিন্ধু-অমৃত। এখানে জল অর্থেই সিন্ধু-কথার ব্যবহার, ক্ষেত্রকে যে-জলসেঁচ মৃত্যু থেকে বাঁচায় সেই হল সিন্ধু-অমৃত। আমাদের গৃহস্বামীর একটি ছেলের নাম সরোষ, আর-একটির নাম সন্তোষ। বলা বাহুল্য, সরোষ বলতে এখানে রাগী মেজাজের লোক বোঝায় না, বুঝতে হবে সতেজ। রাজার মেয়েটির নাম কুসুমবর্ধিনী। অনন্তকুসুম, জাতিকুসুম, কুসুমায়ুধ, কুসুমব্রত, এমন সব নামও শোনা যায়। এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতরো আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেমন আত্মসুবিজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম, বীরপুস্তক, বীর্যসুশাস্ত্র, সহস্রপ্রবীর, বীর্যসুব্রত, পদ্মসুশাস্ত্র, কৃতাধিরাজ, সহস্রসুগন্ধ, পূর্ণপ্রণত, যশোবিদগ্ধ, চক্রাধিরাজ, মৃতসঞ্জয়, আর্যসুতীর্থ, কৃতস্মর, চক্রাধিব্রত, সূর্যপ্রণত, কৃতবিভব।

সেদিন যে-রাজার বাড়িতে গিয়েছিলেম তাঁর নাম সুসুহুনন পাকু-ভুবন। তাঁরই এক ছেলের বাড়িতে কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তাঁর নাম অভিমন্যু। এঁদের সকলেরই সৌজন্য স্বাভাবিক, নম্রতা সুন্দর। সেখানে মহাভারতের বিরাটপর্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এ দেশ ছাড়া আর কোথাও দেখি নি, অতএব বুঝিয়ে বলা দলকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে;

তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাতপাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক-একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর করে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসারে ছবিগুলিকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে গামেলান বাজে। এ যেন মহাভারত-শিক্ষার একটা ক্লাসে পাঠের সঙ্গে ছবির অভিনয়-যোগে বিষয়টা মনে মুদ্রিত করে দেওয়া। মনে করো, এমনি করে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়, মাস্টারমশায় গল্পটা বলে যান আর একজন পুতুল-খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপারগুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে, ইতিহাস শেখাবার এমন সুন্দর উপায় কি আর হতে পারে।

মানুষের জীবন বিপদসম্পদ-সুখদুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে ; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে ; তেমনি আর-সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবল মাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়। এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্বদাই দোলায়িত করে রেখেছে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরনাধারায় কেবলই এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ-মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান উপায়ে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। শিক্ষার বিষয়কে একান্ত

করে গ্রহণ ও ধারণ করবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কী তা যেন সমস্ত দেশের লোকে মিলে উদ্ভাবন করেছে; রামায়ণ-মহাভারতকে গভীর করে পাবার আগ্রহে ও আনন্দেই এই উদ্ভাবনা স্বাভাবিক হল।

কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প-বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সংগীতটাও সুরের নাচ। কখনও দ্রুত, কখনও বিলম্বিত, কখনও প্রবল, কখনও মৃদু, এই সংগীতটাও সংগীতের জন্যে নয়, কোনো একটা কাহিনীকে নৃত্যচ্ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।

দীপালোকিত সভায় এসে যখন প্রথম বসলুম তখন ব্যাপারখানা দেখে কিছুই বুঝতে পারা গেল না। বিরক্ত বোধ হতে লাগল। খানিক বাদে আমাকে পটের পশ্চাৎভাগে নিয়ে গেল। সেদিকে আলো নেই, সেই অন্ধকার ঘরে মেয়েরা বসে দেখছে। এদিকটাতে ছবিগুলি অদৃশ্য, ছবিগুলিকে যে-মানুষ নাচাচ্ছে তাকেও দেখা যায় না, কেবল আলোকিত পটের উপর অন্য পিঠের ছবির ছায়াগুলি নেচে বেড়াচ্ছে। যেন উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ। জ্যোতির্লোকে যে-সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি যখন নিজের সৃষ্টিপটের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন তখন আমরা সৃষ্টিকে দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিশ্রাম যোগ আছে বলে যে জানে সে-ই তাকে সত্য বলে জানে। সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই চঞ্চল ছায়াগুলোকে নিতান্তই মায়া বলে বোধ হয়। কোনো কোনো সাধক পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপারে গিয়ে দেখতে চায়, অর্থাৎ, সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে দেখবার চেষ্টা— কিন্তু তার মতো মায়া আর কিছুই হতে পারে না। ছায়ার খেলা দেখতে দেখতে এই কথাটাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল।

আমি যখন চলে আসছি আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। বললেন, এই রকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ পরতে পায় না। সুতরাং, এ জাতের কাপড় আমি কোথাও কিনতে পেতুম না।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হল। কাল যাব যোগ্যকর্তায়। সেখানকার রাজবাড়িতেও নাচগান প্রভৃতির রীতিপদ্ধতি বিশুদ্ধ প্রাচীন-কালের, অথচ এখানকার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যোগ্যকর্তা থেকে বোরোবুদর কাছেই; মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরও দিন পাঁচ-ছয় লাগবে এই সমস্ত দেখে শুনে নিতে, তার পরে ছুটি। ইতি

৪০
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

বাণ্ডুঙ। যবদ্বীপ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা একটি সুন্দর জায়গায় এসেছি। পাহাড়ের উপরে—শোনা গেল পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু, হিমালয়ের এতটা উঁচু কোনো পাহাড়ে যতটা শীত এখানে তার কাছ দিয়েও যায় না। আমরা আছি ডীমন্‌ট বলে এক ভদ্রলোকের আতিথ্যে। এঁর স্ত্রী অস্ট্রিয়, ভিয়েনার মেয়ে। বাগান দিয়ে বেষ্টিত সুন্দর বাড়িটি পাহাড়ের উপর। এখান থেকে ঠিক সামনেই দেখতে পাই নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাণ্ডুঙ শহর। পাহাড়ের যে-অঞ্জলির মধ্যে এই শহর, অনতিকাল আগে সেখানে সরোবর ছিল। কখন্ একসময় পাড়ি ধসে গিয়ে তার সমস্ত জল বেরিয়ে

চলে গেছে। এতদিন ঘোরাঘুরির পরে এই সুন্দর নির্জন জায়গায় নিভৃত বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হচ্ছে।

জাভাতে নামার পর থেকেই যিনি সমস্তক্ষণ অশ্রান্ত যত্নে আমাদের সাহচর্য করে আসছেন তাঁর নাম সামুয়েল কোপেরবর্‌গ্‌। নামের মূল অর্থ হচ্ছে তামার পাহাড়। সুনীতি সেই মানেটা নিয়ে তাঁর নামের সংস্কৃত অনুবাদ করে দিয়েছেন তাম্রচূড়। আমাদের মহলে তাঁর এই নামটিই চলে গিয়েছে, তিনি এতে আনন্দিত। লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বলতে ইচ্ছে করে। কিসে আমাদের লেশমাত্র আরাম সুবিধা বা দাবি পূর্ণ হতে পারে সেজন্যে তিনি অসাধারণ চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্য তাঁর। দৈহিক পরিমাণে মানুযটি সংকীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে খুব প্রশস্ত। এতকাল আমরা তাঁকে নানা সময়ে নানা উপলক্ষে দিনরাত ধ'রে দেখেছি— কখনও তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখি নি। সব সময়েই দেখেছি, নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেছেন। তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল, অথচ সেই রুগ্ন শরীরের জন্যে কোনোদিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করেন নি। সকলের সব হয়ে গিয়ে যেটুকু উদ্‌বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার। অনেকের কাছে তিনি তর্জন সহ্য করেছেন কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে নালিশ বা কারও নিন্দে শুনি নি। ইংরিজি ভালো বলতে পারেন না, বুঝতেও বাধে। কিন্তু, কথায় যা না কুলোয় কাজে তার চতুর্গুণ পুযিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটরগাড়িতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন, কিন্তু যেই দেখলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন, অমনি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান করে দিলেন। কিন্তু, এখন এমন হয়েছে, তিনি সঙ্গে না থাকলে কেবল যে অসুবিধা হয় তা নয়, আমার তো ভালোই লাগে না। আমাদের মানসম্মান-সুখ-স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় তিনি নিজেকে এমন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন যে, তিনি একটু সরে গেলেই

আমাদের বড়ো বেশি ফাঁক পড়ে। তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের একটি লক্ষণ দেখে আমার ভারি ভালো লাগে— সর্বত্রই দেখি, শিশুদের তিনি বন্ধু। তারা ওঁকে নিজেদের সমবয়সী বলেই জানে। তাঁর হৃদয়ের আর-একটি প্রমাণ, জাভার লোকদের তিনি সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছেন। জাভানিদের নাচ গান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর একান্ত যত্ন। এই সমস্ত আলোচনার জন্যে 'জাভা সোসাইটি' বলে একটি সভা স্থাপিত হয়েছে, তারই পরিচালনার জন্যে এঁর সমস্ত সময় ও চেষ্টা নিযুক্ত। আমার বর্ণনা থেকে বুঝবে, এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেছি।

বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে-কবিতা লিখেছি সেটি অন্য পাতায় তোমাদের জন্যে কপি করে পাঠানো গেল। ইতি

৪১

১ অক্টোবর ১৯২৭

কল্যাণীয়াসু, বৌমা, দেশের দিকে যেই তাক করেছি এমন সময় ধাঁ করে লক্ষ্য গেল বেঁকে। আরিয়ামের তার এল, শ্যামের রাজা আমাকে অভ্যর্থনা করতে ইচ্ছুক। রাজদ্বারে যাব কিন্তু মন প্রসন্ন নেই। প্রত্যেক দিন এ বোঝা হয়ে উঠেছে। এখন মাঝখানে দুটো ঘাট রইল, ব্যাঙকক্ আর রেঙ্গুন। অর্থাৎ অক্টোবরের শেষ দিকে পৌঁছব। জাভা বালির খবর যা কিছু ছিল সে সমস্তই নিঃশেষ করে দিয়েচি এখন, যাত্রাপথে কাল যে কবিতা লিখেচি সে অত্রসহ তোমাকে পাঠিয়ে দিই। ইতি

বাবামশায়

দখিন বায়ু বহিতেছিল না বিকেলের বনে
সেদিন শুভখনে।
সাগর জলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে বিজন উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
বক্ষ ছাড়ি লুটাতেছিল তোমার চারিপাশ।
মকর-চূড় মুকুটখানি ছিল আমার সাথে,
সোনার বাহুবন্ধ ছিল হাতে।
দাঁড়ানু রাজবেশী,
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী।"
চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি তৃণ আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতি, তুলিনু চাঁপাফুল।
দুজনে মিলি সাজানু ডালা, বসিনু একাসনে,
দুজনে মিলি নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি জাল বাতাসে গেল ভাসি,
আকাশ ছেয়ে উঠিল ফুটে পার্ব্বতীর হাসি॥

বোরোবুদুর কবিতার ইংরিজিটা রামানন্দ বাবুকে পাঠিয়ে দিয়ো।

৪২

৬ অক্টোবর ১৯২৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ধীরেন এখান থেকে দেশে ফিরচে। এই সঙ্গে আমাদেরও ফেরবার কথা ছিল কিন্তু কপাল খারাপ। একেবারে ঘাটে এসে আবার চললুম অন্য মুখে। ভ্রমণের শেষ দিকটার ভার বড়ো বেশি, সেইজন্যেই দুঃখ বোধ হচ্চে।

কাল সকালে পিনাঙ থেকে রেলপথে রওনা হব। সেদিন সমস্ত দিন, সমস্ত রাত, তার পর দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্ককে পৌঁছব। সেখানে আবার নতুন পর্ব্ব। অভ্যর্থনা, মাল্যগ্রহণ, স্তব শোনা, তার জবাব দেওয়া, বক্তৃতা করা, নিমন্ত্রণ খাওয়া, রাজদর্শন, স্কুল পরিদর্শন, ছাত্রদের হিতোপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানকার পালা শেষ হলে আবার এই সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম করে এই পিনাঙ ঘাটে এসে এখান থেকে পাড়ি দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু তখনো নিষ্কৃতি নেই। পথে আছে রেঙ্গুন, সেখানে সকলে মালা গাঁথচে, সভা সাজাচ্চে, ডিনার চা প্রভৃতির জন্যে হাট করতে বেরিয়েচে। অন্তত তিন দিন চলবে আমাকে দলন মলন। তার পরে আমার যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে সেইটুকু একদা এসে উত্তীর্ণ হবে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মনে হচ্চে এক যুগ এখনো বাকি— যদি বলি তিন হপ্তা, তাহলে যেন কম করে বলা হয়, বলতে ইচ্ছে করে প্রায় বিশ লক্ষ সেকেণ্ড। এখান থেকে কোন্ জাহাজে ফেরা সম্ভবপর হবে সেই নিয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি চল্‌চে। যদি জাপানী জাহাজ পাওয়া যায় তাহলে আরাম পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ জাহাজে আমার মতো ব্রিটিশ সাব্‌জেক্টের কোনো সুবিধা হবেনা। একটা কথা বলে রাখি, ধীরেনের মুখে সব গল্প

শুনে পুরোনো করে ফেলো না। দেশে ফেরবার কল্পনার সঙ্গে গল্প করবার কল্পনা একান্ত জড়িত সে কথা মনে রেখো। ইতি

বাবামশায়

৪৩
১৭ এপ্রিল ১৯২৮

ওঁ

বৌমা, তোমার ১০ই এপ্রিলের চিঠি এখানে ১৬ এপ্রিলে পেলুম। ওখানে থেকে চিঠি আসতে কম তো দেরী হয় না। আমার এ চিঠি তোমাদের [কাছে] পৌঁছবে কিনা কে জানে, অর্থাৎ তার আগেই তোমরা কলম্বোয় হয় তো রওনা হতে পারো। ১লা বৈশাখের টানে এখানে এসেছিলুম আজ ফিরব কলকাতায়। প্রশান্ত অপূর্ব্ব প্রভৃতিরা এসে খুব কষে কমিটি প্রভৃতি ক'রে এখানকার হাওয়া খুব আলোড়িত করে দিয়েচে। প্রথমটা সবাই রুখে দাঁড়িয়েছিল, শেষটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে।

বীরলার টাকা পেয়েছি। তাতে য়ুরোপের খরচ চালাতে হলে সাবধানে ব্যয় করতে হবে। জাপানী জাহাজে আর ওরিয়েন্ট লাইনের জাহাজে দামের তফাৎ অনেকটা বিশেষত জাপানী জাহাজে আমাকে যে সুবিধে দেবে তার পূরো মূল্য নেবেনা। এণ্ড্রুজ আমার সঙ্গে যাবেনা, তার যাবার বিশেষ ইচ্ছা নেই— সে এখানে অনেকগুলি কাজে জড়িত— তার উপর বোলপুরের দুর্ভিক্ষ ও এখানকার কর্ত্তৃত্ব নিয়ে সে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে পারবে। আমি য়ুরোপের কোথাও গিয়ে চুপটি করে থাকতে চাই— এখানকার হাজার রকম খুচরো উৎপাত থেকে একদমে ছুটে পালাতে

মনটা ব্যাকুল। রথীকে জাপানী জাহাজের কথা তার করে দিয়েচে— কি পরামর্শ দেয় তার অপেক্ষায় আছি। এখানে এখনো বৃষ্টি নামে নি— ইঁদারাগুলির অবস্থা বাছুরহীন গোরুর বাঁটের মতো, গাছপালা শুকিয়ে গেল।

Ultra violet rays কিছুদিন নিয়ে ভালো বোধ করেছিলুম— কলকাতায় গিয়ে আবার নেব। তোমার জ্বর ছেড়েচে মনটা নিশ্চিন্ত হয়েচে। এক একবার মনে হচ্চে য়ুরোপে না গিয়ে তোমরা দীর্ঘকাল ঐ পাহাড়ে থাকলে হয় তো তোমার পক্ষে ভালোই হত। ইতি

বাবামশায়

৪৪
১৬ মে ১৯২৮

ওঁ

মাদ্রাজ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখনো তোমরা মধ্যধরণী সাগরের নীল জলে ভাসচ। আর হপ্তাখানেকের মধ্যে ডাঙায় নামবে। কথা ছিল ১৭ই তারিখে অর্থাৎ আগামী কাল আমিও জাপানী জাহাজে চড়ে কলম্বো থেকে ভেসে পড়ব। বাধা ঘটল। কলকাতা থেকে যে জাহাজে কলম্বোয় যাবার কথা তার ব্যবস্থা দেখে সেটাতে চড়তে সাহস হোলো না। এণ্ড্রুজ সেই জাহাজে উঠেছিল— আধমরা হয়ে মাদ্রাজেই তাকে নেবে পড়তে হল। ওর শরীর বেশ একটু খারাপ। রেলে করে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত আমার ক্লান্ত দেহটাকে টেনে এনে আপাতত আডিয়ারে আশ্রয় নিয়েছি। এখান থেকে কলম্বো পর্য্যন্ত যে

গাড়ি যায় সেটাতে চড়তে বন্ধুরা পরামর্শ দিচ্চে না। বিশেষত এই সময়টা অসহ্য গরম। জুনের শেষ সপ্তাহের পূর্ব্বে কোনো জাহাজেই স্থান পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইতিমধ্যে নীলগিরিতে পীঠাপুরমের রাজার আতিথ্যে কুনুর নামক পাহাড়ে কাটাবার কথা আছে। রাজার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। প্রশান্ত রাণী আমাকে সঙ্গে করে এনেছে— কুনুর পাহাড়েও তাদের যাবার ইচ্ছে আছে। কোডিতে যেতে পারতুম কিন্তু তার চেয়ে কুনুর হয়তো ভালো লাগ্‌বে। এর পরে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলে কলম্বো যাবার রাস্তাটা অসহ্য হবে না।

জন্মদিন খুব ঘটা করেই হয়েছিল— বিশ্বভারতী সম্মিলনী ছিল নিমন্ত্রণ কর্ত্তা। ভিড় হয়েছিল কম নয়। দিনুরা আছে কালিম্‌পং। শুনচি সঙ্গী অভাবে তারা উভয়েই পীড়িত। মীরাকে বলেছিলুম কলম্বো পর্য্যন্ত আস্‌তে কিন্তু সে তার গাছপালা ছেড়ে আসতে রাজি হোলো না— সে আছে শান্তিনিকেতনে।

য়ুরোপে তোমরা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে জানিনে। আমারই বা গতি কোথায় হবে ঠিক ভেবে পাচ্চিনে। সুইজারল্যাণ্ডে এক কোণে লুকিয়ে লিখতে বসাই ভালো হবে। এণ্ড্রুজ আরিয়াম দুজনেই আমার সঙ্গে যাবে। য়ুরোপে গিয়ে পৌঁছবার আগে তোমাদের ঠিক খবর পাওয়া যাবে না। সেখানে কোথাও গিয়ে তোমরা ভালো আছ খবর পেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। কি রকম আমরা অনিশ্চিত ভাবে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছি ভালো লাগ্‌চে না। কবে যে আবার সমস্ত বেশ গুছিয়ে উঠ্‌বে তাই ভাবি। পুপু নিশ্চয় ভালোই আছে— এবার হয় তো তার শরীর মন দুইই দ্রুত বেড়ে উঠ্‌বে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

বাবামশায়

৪৫

৩০ মে ১৯২৮

ওঁ

MESSAGERIES
MARITIMES

বৌমা, এবার য়ুরোপ যাওয়া মঞ্জুর হোলো না বলেই বোধ হচ্চে। ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাক্‌ব। কারো সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না, কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া চিঠি পড়ব না। গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখ্‌ব— যদি য়ুরোপকে কিছু বলবার থাকে তো যথা সময়ে বলব— তাড়াহুড়ো করে যা তা লিখে আপনাকে ও অন্যকে ঠকাব না।

তোমাদের জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন থাকে। কিন্তু তোমরা দুজনেই এবার ভালো রকম চিকিৎসা না করে যেন ফিরে এসো না।

পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করে আমার মনে এল আমারো কিছুদিন এই রকম তপস্যার খুবই দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমে ক্রমে কমে আস্‌বে। প্রতিদিন যা তা কাজ করে যা তা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় চাপা পড়ে যায় নিজেকে যেন দেখতেই পাইনে। কিছুকাল থেকে প্রতি রাত্রে একবার করে মনটা ভারি ছট্‌ফটিয়ে ওঠে— কে যেন কষে ঠেলা মারতে থাকে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসো। তার থেকেই ভাবছিলুম হয় তো তার মানে য়ুরোপে পালানো। এখন বুঝতে পারচি হাজার লক্ষ তুচ্ছতার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা।

পুপুমণি নিশ্চয় ভালই আছে। তোমরা ভালো আছ শুন্‌লে নিশ্চিন্ত হব। ইতি

বাবামশায়

৪৬
৫ জুন ১৯২৮

ওঁ

SRAVASTI
COLOMBO

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এবারে আর যাওয়া ঘটে উঠ্‌লনা। আগেকার মতো নড়ে চড়ে বেড়ানোর সামর্থ্য নেই। ঠিক করেচি শান্তিনিকেতনে অরবিন্দর মতো একেবারে সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাস গ্রহণ করব— কেবল বুধবারে দর্শন দেব— বাজে চিঠিপত্র লেখা এবং খবরের [কাগজ] পড়া একেবারে বন্ধ। একমাত্র যার মুখ দেখে দিন কাটবে সে হচ্চে বনমালী। সুধীকেও বাদ দেওয়া চল্‌বে না— কারণ বনমালী দর্শন দেয় সুধীই কাজ করে।

আজ পাঁচই, আগামী এগারই এক ফরাসী জাহাজ ছাড়বে মাদ্রাজ অভিমুখে। সেই জাহাজে মাদ্রাজে গিয়ে কলকাতায় রওনা হব— যদি দরকার বোধ করি পথের মধ্যে ওয়াল্‌টেয়রে দুচার দিন থেকে যাব।

তোমরা বৌমা, ভালো করে চিকিৎসা না করিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো না যেন। বারে বারে তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সে ভালো লাগেনা। কোথায় তোমরা আছো কেমন আছো সে সব বিস্তারিত খবর পেতে আরো আরো অনেকদিন লাগবে।

এখানে এসে পুপুমণির ফুল পেলুম— ভারি মিষ্টি লাগল। সে মিষ্টি ঐ ছোট্ট মেয়েটির হৃদয়ের মধ্যে নেই, সে মিষ্টি আমারি আপন মনে। তাকে বোলো দাদামশায় তার জন্যে পথ চেয়ে রইল। ফিরে এসে যেন বাংলা ভাষায় কথা কইতে না ভোলে।

বাবামশায়

৪৭
২৬ জুলাই ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা এখানকার আর পাঁচ জনের কাছ থেকেই এখানকার সব খবর নিশ্চয়ই পাও তাই পুরোনো খবরগুলো দিতে ইচ্ছে করেনা। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এখানে ও শ্রীনিকেতনে যে দুটো উৎসব হয়ে গেছে তার সমস্ত বিবরণ তোমরা পেয়েচ। এখানে হোলো বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হোলো হলচালন। বৃক্ষরোপণের ইতিহাসটা তোমাকে লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি— কিন্তু আমার বিশ্বাস মীরা সব কথা ফাঁস করে দিয়েচে। মীরা কাজটাকে অন্যায় বলেই আমাকে ভর্ৎসনা করেচে কিন্তু আমি ঠিক তার উল্‌টোই মনে করি। তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হোলো। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারো না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হোলো। এখন সে বেশ আছে, তোমার টব থেকে তাকে ধরায় অবতীর্ণ করানো হল বলে তার খেদের লক্ষণ দেখা যাচ্চে না। তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হোলো— আমি এই উপলক্ষ্যে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুসি হতে। একটা কালো রেশমের ধূতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরি দেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর। শ্রীনিকেতনের অনুষ্ঠানটাও সকলের খুব ভালো লেগেচে।

হাঙ্গেরি থেকে তোমাদের তারের খবর পেয়ে বুঝলুম আনন্দে আছ। আমার কপালে ফস্‌কে গেল। আমিও নানা জায়গায় ঘুরে এসেচি. তার মধ্যে কুনুরটা লেগেছিল ভালো। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫

বাবামশায়

৪৮
১ অগস্ট ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

শান্তিনিকেতনে ছিলেম আনন্দে— কখনো বা ঘন ঘোর মেঘ আর বর্ষণ, কখনো বা বৃষ্টিধোওয়া আকাশে রোদ্দুর ঝলমল করে। উপরের ঘরে সাসি নেই বলে আমি বসবার আর লেখবার ঘর করেছিলুম নীচে তোমাদের বড়ো ঘরে, আর শুতুম তোমাদের শোবার ঘরে। চমৎকার লাগত মেঘ বৃষ্টি রোদ্দুরের লীলা দেখতে। এবার একটা আস্ত গল্প লিখে ফেলেচি, সে কথা বোধ হয় আগের চিঠিতে লিখেচি। সবাই বলচে আমার সব গল্পের সেরা হয়েছে। সেইটেই মাজাঘষা করচি। কিন্তু ইতিমধ্যে ডাক্তারের উপদ্রবে আমাকে টেনে আনলে কলকাতায়— দু দিন অন্তর তার বাড়িতে গিয়ে Diathermic উত্তাপ লাগাচ্চি। বলচে দেড় মাস ধরে এই দুঃখ পেতে হবে। প্রথমে উঠেছিলেম আমার তেতালার ঘরে। কিন্তু সেবকদের সংসর্গ থেকে দূরে পড়াতে সামান্য প্রয়োজনের নীচে নাবতে হোতো। সেইজন্যে বিচিত্রার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। তোমার boudoir এ আমার লেখবার ঘর। কল্পনা করে দেখ যেখানে বসে তুমি ছবি আঁকতে

সেই ঘরে বসে আমি লিখচি। তোমার টুকিটাকি অসংখ্য জিনিষের মধ্যে একটা কিছু যদি হারায় আমাকে যেন দোষ দিয়ো না। আমি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিইনে, নিজের কাজেই ব্যস্ত। মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব আসে প্রশান্ত আসে, বকাবকি করে। রাণী ২১০ নম্বরেই পড়ে থাকে, তাকে আবার নিরেনব্বইয়ে ধরেচে। নানাবিধ ইন্‌জেকশন ও চিকিৎসাপত্র চল্‌চে। এ রকম ক্ষুদে ব্যামো শিগ্‌গির সারতে চায় না।

কলকাতায় খুব বৃষ্টি চল্‌চে। কাল থেকে বৃষ্টি নেমে আমাদের গলিটা দ্বিতীয় ভেনিস্ হয়ে উঠেচে— ওদিকে গলির একটা কোণের বাড়ি বৃষ্টিতে পড়ে গেছে, তারি রাবিশে কিছুকাল এ গলি দুর্গম ছিল।

আর যাই বলো, তোমার ঘরে মশা আছে, এমন কি, দিনের বেলাতেও— তাই নিয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়— এইমাত্র fly-tox ছিটিয়ে গেল— তাতে মশারা মিনিট দশেকের জন্যে কিছু দুঃখিত থাকে, তার পরে সামলিয়ে নেয়। খবরের কাগজে পড়েছি, হাঙ্গেরিতে উত্তাপের মাত্রা কয়েকদিনের জন্যে ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়টাই তোমরা ওখানে ছিলে— ফলাফলটা কী হল পরে খবর পাওয়া যাবে।

পুপুমণিকে তার বিরহী দাদামশায়ের কথাটা একটু স্মরণ করিয়ে দিয়ো। ইতি

বাবামশায়

৪৯
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা এখনো তোমাদের চিঠিপত্র আসচে সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করে যে সময়টা ছিল মুকুলের আমলের। তার আশ্রয়টা বেশ আরামের ছিল। চারদিকে বাগান, মস্ত একটা পুকুর, ঘরগুলো খুব উঁচু এবং তার জানলার সঙ্গে আকাশের কোনো ব্যবধান ছিল না। কেবল একদিকে বারান্দা ছিল বলে অন্যদিকে আকাশের সঙ্গে পূরো মোকাবিলা চল্‌ত— আমার সেইটে খুব ভালো লাগে। বলা বাহুল্য এখন এসেছি শান্তিনিকেতনে— মোটের উপরে এখানে শরীরটা আগের চেয়ে ভালো আছে। তার কারণ, আবার আমি এখানকার বিদ্যালয় বিভাগের কাজটা নিজের হাতে নিয়েচি। তাতে করে মনটা থাকে ভালো। শরীর মন দুইয়ে মিলে যখন ক্লান্তির ডুয়েট চালাতে থাকে তখনি মুস্কিল।

প্রথমে খুব বৃষ্টি হয়ে এখানে বিস্তর ধান হয়েছিল। তারপরে কিছুদিন বন্ধ হয়ে ধানগুলো মারা যাবার জো হল, আবার হঠাৎ দিন দুই তিন বেশ বৃষ্টি হওয়াতে ফসলের আশা হচ্চে। মোটের উপরে বাংলা দেশে এবার ফসলের অবস্থা ভালোই।

ভেবেছিলুম ছুটির সময় বোটে বেড়াতে যাব— বোট মেরামতও হচ্চে। এমন সময় খবর পেলুম আমার সেই চাইনিজ বন্ধু স্যু— যার নামে চাচক্র খোলা হয়েচে— পাঁচই সেপ্টেম্বরে বোম্বাই আসবেন। তাহলে ঠিক ছুটির মুখেই তিনি এখানে উপস্থিত হবেন। তাহলে তাঁকে নিয়ে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কলকাতায় কাটাতে হবে। স্যু আসচেন বলে

আমি ভারি খুসি হয়েছি— তাঁকে আমি খুব ভালোবাসি। তোমরা থাকলে বেশ হোত— ভারি ভালো লোক।

১৬ ডিসেম্বর এখানে ভাইস্‌রয় আসবেন সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও বোন। এখানে ডিনার খাবেন। তার পূর্ব্বেই তোমরা আসচ বলে আমি নিশ্চিন্ত আছি। ওঁদের একটা কিছু অভিনয় দেখাতে হবে। মনে করচি 'বসন্ত'টা তৈরি করে তোলা যাবে। সঙ্গে একটু নাচ থাক্‌লে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হবে। পুপুমণিকে আমার ভালোবাসা দিয়ো। বোলো তার জন্যে আমি অনেক ছবি এঁকে রেখেচি। ইতি

বাবামশায়

আন্দ্রেকে আমার ভালোবাসা দিয়ো— বোলো তারা এলে ভারি খুসি হব।

৫০

২ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

P. & O. S. N. CO.
S.S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, গোপাল নীলমণির যোগে মোটামুটি আমার সমস্ত খবর এতদিনে পেয়ে থাকবে। চিঠিতে খবর দেওয়া ছাড়া আমি সব কথাই লিখি বলে আমার দুর্নাম আছে। আমার মনটা যেন বড়ো বড়ো ফাঁকওয়ালা জাল— তার ভিতর দিয়ে বাইরের দৈনিক খবরগুলো ধরাই পড়ে না,

ভিতরকার চিন্তার কথা হয় তো আটকা পড়ে কিন্তু সেগুলো আজ লিখলেও যা কাল লিখ্‌লেও তা। তবু একবার ভেবে দেখি উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেচে কি না।

গাড়িতে চড়ে প্রথমেই অবাক্ হয়ে ভাবলুম, বি এন্ আরের "কূপে" হঠাৎ আমার খাতিরে এত বড়ো হল কী করে— এ যেন হঠাৎ পুপে পঁচিশ বছরের মেয়ে হয়েচে। তার পরে ভাবলুম হয় তো "কুপে" দুর্লভ হওয়াতে বড়ো গাড়ি আমার জন্যে রিজার্ভ করা হয়েচে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এমন ঠেসাঠেসি ভিড় যে কাউকে প্রশ্ন করবার সময় পেলুম না। অবশেষে একে একে সবাই নেবে গেল, কেবল টাকার নাম্‌লে না। গাড়ি ছেড়ে দিলে। এ রকম দ্বন্দ্ব সমাস আমার একটুও ভালো লাগলো না। বম্বাই পর্য্যন্ত এই যুগল মিলনের কথা চিন্তা করে আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। হাতে একখানা বই ছিল তাও পড়তে ভালো লাগ্‌ল না। গাড়ি এসে দাঁড়ালো খড়্গাপুরে— আমার অভিভাবক অপূর্ব্ব দেখা দিতেই তার কাছে আমার নালিশ জানালুম। সে বল্‌লে, যথারীতি "কুপে" ভাড়া করা হয়েছে, কিন্তু একটা জনরব উঠেছিল কুপে আমার পক্ষে দুঃসহ সেইজন্যে আরোহীদলকে জুড়ি জুড়ি ভাগ করে সমস্যা সমাধান করা হয়েচে। আমার কোন্‌টা ভালো লাগে কোন্‌টা লাগে না সেটা আমার নিজের জানা নেই বলে লোকের অন্ধ বিশ্বাস— সেই জন্যে অন্য লোকের মতানুসারে ভালো লাগাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়ি। আমি আর বিলম্ব না করে সহকারী অভিভাবক নীলমণির কাছে আপিল জানাতেই সে আমার জিনিযপত্রগুলো কুপেতে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লে— আমিও বাক্স তোরঙ্গের অনুসরণ করলুম। তারপর থেকে শেষপর্য্যন্ত সেই খণ্ড-গাড়ির অখণ্ড আধিপত্য বোম্বাই স্টেশন পর্য্যন্ত একটানা ভোগ করে এসেচি। স্নান শয়ন ধ্যান ধারণা কোনো কিছুর অসুবিধা হয় নি। সে রাত্রে রেল-পাচকের অন্ন স্পর্শ করি নি। মোবারক রুটি-কুক্কুটের সংযোগে পাঁচ খণ্ড স্যাণ্ডুয়িচ প্রস্তুত

করে দিয়েছিল— তাই আমরা তিন সহযাত্রী ভাগাভাগি করে খেয়েচি। আমার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত হয়েছিল। যুবক দুজন আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে স্মিতমুখে বল্‌লেন, তাঁদের সামান্য ক্ষুধার পক্ষে আয়োজন যথেষ্ট। আমি বিস্মিত হলুম কিন্তু এ নিয়ে আমি অনাবশ্যক পরিতাপ করি নি— কারণ সুধীন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে যথাস্থান থেকে গাড়িতে প্রচুর মিষ্টান্নের আমদানি হয়েছিল। তখন দেখলুম, ক্ষুধা তাঁদের কম ছিল তা নয়। এলুমিনিয়ম ভাণ্ডে অনেকগুলি রসনিমজ্জিত গোলাকার ও চপেটাকার পিষ্টক ছিল সেগুলি উপাদেয়। তা ছাড়া জোড়াসাঁকো ও কর্ণওয়ালীস্ স্ট্রীট থেকে একত্রীকৃত যে সন্দেশ-সম্মেলন ঘটেছিল আমাদের অন্তর্জ্জঠরে তাদের মিলন সমাপ্ত হল। আহারাবসানে শ্রীযুক্ত নীলমণি জলভাণ্ডটাকে তার কাষ্ঠবেষ্টনী থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে তৃষিতকে জল বিতরণের অনেক চেষ্টা করলে— কিন্তু উভয়ে তারা সুনিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে গেছে— দুটির মধ্যে একটি প্রলয় সাধন ছাড়া অন্যটির মুক্তির সাধনের উপায় ছিল না। ভাণ্ডটিকে ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা দেবার পক্ষে ব্যবস্থাটি আশ্চর্য্য নিপুণ ছিল কিন্তু তাকে স্বকার্য্যে উদ্যত করার পক্ষে অসহযোগিতার প্রয়োজন সঙ্গত ছিল। অবশেষে হতাশ্বাস নীলমণি দুটিকে একসঙ্গে নত করে কাজ চালিয়ে দিলে।

গাড়িতে আমার দুটি কাজ ছিল। একটি বাইরের একটি ভিতরের। সুরেনের মহাভারতখানা নিয়ে তার খাঁটি গল্পাংশটুকু চিহ্নিত করছিলুম। আমার পেন্সিলের দাগের মধ্যে বি এন আর এবং জি আই পি আর রেল-বাহিনীর হৃৎস্পন্দন দুই দীর্ঘ দিন ধরে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই কাজটা খুব ভালো লাগ্‌ছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস মহাভারতের অতিবিপুলতা থেকে আমি তার যে সারভাগ উদ্ধার করেছি সেটা অতি উত্তম হয়েচে। আশা করি ওটা ছাপানো হবে। বাকি সময়টা আমার দীর্ঘকালসঞ্চিত রুদ্ধচিন্তা নির্জ্জন অবকাশের উপর দিয়ে উদ্বেল হয়ে চলেচে। আজ পঁচিশ বছর থেকে যে কাজ বহু দুঃখে বহন করে এসেছি তারি পরিশিষ্টভাগের অনেক

গভীর বেদনা সূর্য্যাস্তকালের প্রলয়চ্ছটার মতো অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠ্‌ছিল। লোকব্যবহারে তোমরা আমাকে অনেকে নির্ব্বোধ বলেই জানো— আমার সেই নির্ব্বুদ্ধি বেঁকেচুরে নানা আকারে জেগে ওঠে, যেহেতু আমি সাহস করে কাজ করি। কর্ম্মে যদি প্রবৃত্ত না হতুম তাহলে ভাবের জগতে আমার বুদ্ধিভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেত না। কিন্তু তবুও ব্যাবহারিক অবিবেচনা সত্ত্বে কেবলমাত্র ভাবের জোরে নানাবিধ ভাঙাচোরা ভুল ত্রুটির উপর দিয়েও কিছু সৃষ্টি করতে পেরেচি। কেবলমাত্র কর্ম্মকুশল বুদ্ধি দিয়ে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির বাইরেকার যে ব্যবস্থা তার খুব বেশি দাম নয়, বড়ো দুঃখের মধ্যে দিয়েও এ গর্ব্ব আমি করতে পারি। একটা ধারা রয়েচে, সে ধারা দুর্গম নির্জ্জন উপরের শিখর থেকেই অবতীর্ণ— সেই ধারাকে স্রোতোহীন বালুকাস্তূপে আবদ্ধ করতেও পারে— সেই বালিকে জম্‌তে দেখেচি— কিন্তু তবু অব্যক্ত যদি কোনো এক সময়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে সেও কম কথা নয়।

প্রথম দিনের ভোজ থেকে কল্পনা কোরো না দ্বিতীয় দিনে আমাদের সাহায্যে কিছু কৃপণতা ঘটেছিল। যাকে ইংরেজি ভাষায় বলে, লাঞ্চ বলে ডিনার, বলে টি, তারি রেলগাড়ীয় বিগ্রহ যথাসময়ে ক্ষণে ক্ষণে আমার কামরায় আবির্ভূত হয়েচে। তাতে গ্রহণের চেয়ে বর্জ্জনই বেশি ঘটল। আগমনীর চেয়ে বিসর্জ্জন সে জন্যে দুঃখ কোরো না— সমস্তই যদি অঙ্গীকার করতুম তাহলেই অনেক বেশি অনুশোচনার কারণ ঘটত।

এবারে একটা সুখের বিষয় ছিল, পথে পথে সম্মান বর্ষণ হয় নি— কৌতূহলী দুই একজন ব্যক্তি আমাদের রিজার্ভকরা গাড়ির বিজ্ঞপ্তিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেখে গেছে এবং আর দুই একজনকে ডেকে এনে কানাকানি করেচে এই পর্য্যন্ত। না ছিল মাল্যদান, না ছিল জয়ধ্বনি।

অবশেষে বম্বাই স্টেশনে প্রাতঃকালে গাড়ি এসে থামল। ইতিমধ্যে আমার অভিভাবক আমাকে সুসজ্জিত করবার অভিপ্রায়ে সন্ধান করতে

গিয়ে আবিষ্কার করলে চাবি নেই। তবু রথীদাদার সতর্কতার পরে তার বিশ্বাস কিছুতেই টল্‌তে চায় না। অবশেষে সন্দেহ রইল না যে চাবি নেই। আমার প্রসাধনের পেটিকায় সৌভাগ্যক্রমে একটা সাধুবেশ ছিল। সেইটে পরে নিলুম।

স্টেশনে চারিদিকে দৃক্‌পাত করে দেখা গেল মরিস্ উপস্থিত। অম্বালালের সেই সকালেই আমেদাবাদ থেকে আসবার কথা। তাঁর অনুচরবর্গ আমাদের ভারগ্রহণ করলে। বাইরে মোটরযানে ওঠবার মুহূর্ত্তেই অম্বালাল এসে আমাকে অধিকার করে তাজমহল হোটেলে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়েই চাবি তৈরির ব্যবস্থা করা গেল। ইতিমধ্যে রুটিটোস্‌ট্ ও কফি খেয়ে জানলার কাছে একটি আরাম কেদারায় নিবিষ্ট হয়ে বস্‌লুম। অদূরে ক্ষীণকুহেলিকার আভাসে অনতিস্পষ্ট আকাশের নীচে নীল সমুদ্র দেখা যাচ্চে— সূর্য্যদেব তখনো ওঠেন নি।— আমাদের এই যাত্রার এক অংশের সংবাদ তখন কলকাতার দিকে। আমরা তার প্রতীক্ষায় আছি। অনুমান করলেন অম্বালালের আপিসে কিম্বা আমেরিকান এক্‌স্প্রেসের জিম্মায় সংবাদ জমা হয়ে আছে।

আমাদের তরফ থেকে আমরা নাগপুরে পাঁচ সাতটা টেলিগ্রাম কলকাতায় পাঠিয়েছি। সেখানে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পাবার প্রত্যাশা ছিল পাওয়া গেল না। কলকাতা ছাড়ার দুদিন পরেও কোনো সংবাদ না পেয়ে মনে মনে যতই নানা প্রকার বিচার করছিলুম ততই অপূর্ব্ব আমাকে বারবার সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌ছিল, আপনি "ব্বরি" করবেন না। আমার মনে পড়ল একদা পদ্মায় ঘোরতর ঝড়ের দিনে আমাদের মাঝি মাদারি নিকারী বারবার হেঁকে বল্‌ছিল, ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, আল্লার নাম করো। আমার বিশ্বাস তাতে শ্রোতাদের ভয় শান্ত হয় নি। যাই হোক্ ক্রমে ক্রমে জানা গেল। সুধাকান্তর যাত্রায় বিঘ্ন ঘটেচে। বিঘ্নের কারণ সম্বন্ধে আমাদের নানা লোকের বুদ্ধিতে নানা রকম বিচার চল্‌তে লাগল। তারি মাঝে মাঝে

অপূর্ব্বর অভয় বাণী ধ্বনিত হতে থাক্‌ল আপনি কিছুই ভাববেন না।

স্টেশনেই ক্ষিতীশ সেনের সঙ্গে দেখা। তাঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে বম্বাই প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটাবার প্রস্তাব করলেন। অপূর্ব্ব যথারীতি বল্‌লে দেখুন ডাক্তার বিশেষ করে বলেচে ইত্যাদি। আমিও ভালো ছেলের মতো তার প্রতিধ্বনি করলুম। দিনের প্রহরে প্রহরে দর্শনপ্রার্থীর আনাগোনা চল্‌তে থাকল। এদিকে প্রকাশ পেলে যে অম্বালাল সায়াহ্নে ডিনারে লোক ডেকেছেন। হবি ত হ বিকালে আর একবার ক্ষিতীশ সেন উপস্থিত। অম্বালাল তাঁকে মুখে মুখে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। তখন ক্ষিতীশ সেনের মনে পড়ে গেল সকালে তাঁর দুই কানে দুই বিশ্বাসযোগ্য লোক এক সঙ্গেই বলেছিল যে "ডাক্তার বলেচেন ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য অম্বালাল ডাক্তারের উপদেশের পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করেচেন এবং অম্বালালকে উপস্থিত ক্ষেত্রে পুনশ্চ ডাক্তারের পরামর্শ স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের দ্বারা ঘটেনি।

ক্ষিতীশ সেন গম্ভীর ভাবে বললেন কাজ আছে তিনি আস্‌তে পারবেন না। ইতিপূর্ব্বেই কথা দিয়েছিলেন পরদিন সকাল বেলায় তিনি আসবেন। বলা বাহুল্য সকালে তিনি আসেন নি। অপূর্ব্ব তাঁর চিঠি পড়ে বারবার বল্‌চে, ক্ষিতীশ সেনের এত বদল হল কি করে? ও যেন কেমন হাকিমি ভাষায় লিখেচে। অপূর্ব্বর বিশ্বাস পাকা হল কিছুকাল হাকিমী করলেই নেহাৎ ভদ্রলোকের ভাষাতেও হাকিমীর ছাপ পড়ে। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বললুম না, কেবল মনে মনে অপূর্ব্বর মানব-চরিত্রজ্ঞানের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তা করলুম!

পরদিন প্রাতে চাবি ও পত্র হাতে গোপাল ঝোড়োকাকের বেশে এসে উপস্থিত। তখন খবরগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ল— অল্প একটু একটু কুয়াযা রয়ে গেল। যাক্।

ক্লান্ত সমুদ্রের সাত বাঁও জলে তখন ডুবে আছি। আগের রাত্রে কয়েকটি

অত্যন্ত নিষ্প্রভ লোকের সঙ্গে ডিনার খেয়ে দেহমনপ্রাণ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। শুতে যাবার সময় চৌকি থেকে বিছানায় যেতে মনে হচ্ছিল যেন পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে যাচ্চি। একে একে সকলেই শুতে গেল— আমিও বহুকষ্টে শয্যা আশ্রয় করে রাত্রিযাপন করলুম। সকালে সহযাত্রীরা বাজার করতে বেরলেন। ফিরে এসে অপূর্ব্ব গর্ব্বোৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে জানালেন যে তিনি আমার জন্যে আশ্চর্য্য সস্তা দামে একটি কুশন্ কিনেচেন। একাত্তর টাকা তার মূল দাম— নিতান্তই কেবল নিজের বুদ্ধি কৌশলে সেটাকে নামিয়ে সাঁইত্রিশ করেচেন। আমি শান্তি রক্ষার অভিপ্রায়ে তাঁর বুদ্ধি কৌশলের সম্বন্ধে কোনো মত প্রকাশ করলেম না।

এমন সময়ে দুজন মূর্ত্তিমান এমেরিকান এক্স্প্রেস্ এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে, ব্যাড্ নিয়ুস্।— ভাবলুম সুধাকান্তর গ্রহ এবার সেখান থেকে ছুটি পেয়ে আমার সঙ্গে লেগেচে। এবার কলকাতায় ফেরবার "কুপে" সন্ধান করতে হবে। প্রকাশ পেলে, যে, আমার ক্যাবিন ডে লুক্স্ পরহস্তগত। কিন্তু আমাদের দূত যথাসাধ্য চেষ্টায় দুখানা ক্যাবিনে নানাবিধ রূপান্তর ঘটিয়ে আমার বাসযোগ্য একটা ব্যবস্থা ঘটিয়েচে। এ সম্বন্ধে অধিকার হাহুতাশ করা বৃথা জেনে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে রইলুম— বল্লুম সকলি অদৃষ্টের লীলা।

আমার সহকারী অভিভাবক ইতিমধ্যে একটি কাণ্ড করে বসেছিলেন। তাঁর অভিভাবকত্ব মর্য্যাদার গৌরবে ভর দিয়ে তিনি আমার মত না নিয়ে তাঁর মনের মত একখানা কাপড় বের করে রেখে সমস্ত বাক্স প্রভৃতি জাহাজে চালান করে দিলেন। যখন অনুভব করলেন সেই কাপড়খানা আমাদের অনুমোদিত নয়— তখন পুনরায় তাঁর বন্ধু মরিসকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে না জানিয়ে নানা দুঃসাধ্য চেষ্টায় যথোচিত বেশ উদ্ধার করে নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। বিস্মিত হলেম।

ক্রমে সময় আসন্ন হল। আমার ক্লান্তি দূর করবার অভিপ্রায়ে অম্বালাল

সোটার্ন শ্যাম্পেন প্রভৃতির আয়োজন করেছিলেন, এই চিকিৎসা প্রণালীতে অপূর্ব্বর খুব উৎসাহ ছিল। সেই জন্য আয়োজন ব্যর্থ হয় নি।

ক্লান্তিভার ও দেহভার একসঙ্গে বহন করে শুভ পয়লা মার্চ্চ তারিখে শুক্রবাসরে অপরাহ্ণ চারটের সময় জাহাজে ওঠা গেল। দেখা গেল আমার ক্যাবিন ভালোই— বোধ হয় পূর্ব্ববন্দোবস্তর চেয়ে ভালো। যখন স্টুয়ার্ড দেখা দিলে তখন প্রকাশ পেলে এ আমার পূর্ব্ববন্ধু। 'মোরিয়া' জাহাজে এ দুই যাত্রায় আমার সেবা করেছিল। নীলমণির বদলে শ্বেতমণিকে পেলুম।

তার পরে দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী। অকস্মাৎ অপূর্ব্ব চমকে উঠে খবর পেলে ডিনারের সময় সমাগত। দুইবন্ধু তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে প্রবেশ করলে। ডিনারের সময় অতিবাহিত হতে চলল। মনে পড়ল অভিমন্যুর কথা। এরা ক্যাবিনে প্রবেশ করবার বিদ্যে শিখেচে বেরোবার বিদ্যে শেখেনি। তখন টাকারকে নিয়ে আমি নিঃসহায় ভাবেই ভোজনশালায় গেলুম। তখন অর্দ্ধেক ডিনার শেষ হয়ে গেছে। এরা দুজনে যখন এল তখন ডিনার চন্দ্রমার পূর্ণগ্রাসের কেবল এক কলা বাকি। তারপরে ট্র্যাজেডি কি রকম জমল বলবার সময় নেই। আজ সকালে জাহাজের প্রকাশ্য স্থানে নোটিস প্রচার করা হয়েছে, আরোহীগণ দয়া করে ডিনার টেবিলে আধ ঘণ্টার বেশি যেন দেরি না করেন। পিয়ানো কম্পানির জাহাজের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

বৌমা আমার এত বড়ো চিঠি পড়ে আশ্চর্য্য হবে। এটা লিখ্‌লুম কেবলমাত্র প্রতিকূল জনশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রমাণ করবার জন্যে যে আমি চিঠি লিখ্‌তে পারি এবং সে চিঠিতে যাথাতথ্যের স্খলন না হতেও পারে। পুপুমণি [কে] আমার এক জাহাজভরা ভালবাসা জানিয়ো। মীরা প্রভৃতি সকলকেই। এ চিঠি পড়তে দিয়ো এবং এই ওজনের চিঠি আর প্রত্যাশা কোরো না।

বাবামশায়

৫১
৭ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

P. & O. S. N. Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রথী শান্তিনিকেতনের যে ভার নিয়েচে তার এক অংশ তোমারো নেওয়া উচিত। অর্থাৎ ওখানকার ছাত্রীদের পরে দৃষ্টি রাখা তোমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ হওয়া কর্ত্তব্য। এ অধিকার তোমার স্বাভাবিক অধিকার। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে কেউ না কেউ কর্ত্রী আছেন কিন্তু লেডি বোসের হাতে তার সত্যকার অধ্যক্ষতার ভার। তিনিই সমস্ত জিনিষটাকে চালনা করেন। তোমাকেও তাই করতে হবে। কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে গ্রন্থি ঢের বাধে, অপ্রিয়তারও সৃষ্টি হয়— কিন্তু তাই বলে একটুও সঙ্কোচ করা উচিত হয় না। ওদের নানা অভাব, নানা দুঃখ আছে সে কোনো জায়গায় পৌঁছয় না বলেই অনেক বিকৃতি ঘট্‌তে থাকে। তা ছাড়া ওদের জীবনযাত্রার উপর তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি পড়ে না বলেই ঢিলে ঢালা ব্যবহারে ওরা লজ্জা পায় না। অনেকগুলি খুব ছোট ছোট মেয়ে এসেচে— সকল দিক থেকেই তাদের মানুষ করবার ভার আমাদের উপর। আমরা একটা যন্ত্রের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে উদাসীন থাকি এ কিন্তু আর চল্‌বে না। যখনি এ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ ঘটে তখনি আমরা মনে মনে স্থির করি বিদেশ থেকে কাউকে আনাতে হবে। তার মধ্যে খুব একটা লজ্জার কারণ আছে। এ কথা মানতেই হবে, লেডি বোস্ যদিও বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত নন, কিন্তু আসল দায়িত্ব তাঁরই হাতে।

এতদিনে ওদের নাচ শিক্ষার পালা বোধ হয় আবার আরম্ভ হয়েচে। যদি নটীর পূজা ওদের দিয়ে করাতে পারো তো খুব ভালো হয়। রাজা

ও রাণী আমি তো ছেঁটে ছুঁটে মেজে ঘষে ঠিক করে দিয়ে এলুম, কি রকম অভিনয় হবে জানি নে। কিন্তু আমি যদি এটাকে তৈরি করবার ব্যাপারে হাত দিতে পারতুম তাহলে এটা খুব ভালো হত। ফিরে গিয়ে যদি সুযোগ হয় দেখা যাবে।

আমার তিন সহচরে মিলে খুব আসর জমিয়েচে। টাকাবকে নিয়ে ওদের খুব রঙ্গ চলে। সে ভালো মানুষের একশেষ মৃদুমন্দ হাসে এবং মাঝে মাঝে মজার উত্তর দেয়। এইদলের ভিতরে সুধাকান্ত কিছুতেই খাপ খেত না— হয়ত মাঝে মাঝে খোঁচাখুঁচি হতে পারত— এদের সঙ্গে ওর সুর মিলত না।

জাহাজ খুব শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেচে— একটুও দোলা নেই। এ কয়দিন গরম ছিল না— আজ থেকে গরম দেখা দিয়েচে— সিঙ্গাপুরে আরো গরম হবে। হংকঙে পৌঁছবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত এইরকমই চল্‌বে। কিন্তু যাত্রার শেষভাগে উত্তর মেরুর হিম নিঃশ্বাস বইতে থাকবে— সে একটু বেশি ঠাণ্ডা। বাইরে বেরোনো চল্‌বেনা। তার পরে ভ্যাঙ্কুভরে শীত কমে যাবে। দুই একজন বড় দরের আমেরিকানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চল্‌চে— কাজ এগোচ্চে। পূপের খবর কি? সহচরী কেউ জুটেচে? ইতি

বাবামশায়

৫২

১৭ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

P & O. S. N. Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে জলপাত্রের নমুনা আঁকছিলুম। আগে যেটা এঁকেছিলুম সেটা পাঠাই। কিন্তু দেখলুম সেটা গড়িয়ে পড়বে। তাই এই কাগজে অন্য রকম করে আঁকলুম। কোনটা তোমার পছন্দ? যদি এই নমুনায় তৈরি করাতে হয় তাহলে রূপোর গায়ে কালো মিনের দাগ লাগানো দরকার হবে। আমাকে হংকঙের ভারতীয়েরা একটা রূপোর বাক্সে ৮০০ টাকা উপহার দিয়েছে, সেটা বাক্সটা একদা তোমার ঘরেই পৌঁছবে। যদিও টাকাটা বিশ্বভারতীর। সেই বাক্স পান সুপারি প্রভৃতি দেবার পক্ষে বেশ।

আজ সাংহাই পৌঁছব। খুব শীত। ভেবে দেখ আজ ৩রা চৈত্র, তোমাদের ওখানে নিশ্চয় গরমে জগৎ হাঁপিয়ে উঠচে। পুপের ভালো লাগচেনা। তাকে যদি নিয়ে আসতে তার গাল লাল হয়ে উঠত। সমুদ্রও বরাবর খুব শান্ত ছিল, তোমাদের কোনো কষ্ট হত না। পাঁজিতে দেখলুম ১১ই চৈত্রে দোলপূর্ণিমা। আর তো দেরি নেই— এবারে তোমাদের উৎসব থেকে বঞ্চিত হলুম। তোমরা কি কিছু অভিনয়ের চেষ্টা করচ? নতুন মেয়েদের নিয়ে নটীর পূজা যদি করতে পার ত বেশ ভালো হয়। রাজা ও রাণী অভিনয় কি তোমরা দেখেচ? আমার আপশোষ হচ্চে ওটা আমরা ত করতে পারলুম না। সংশোধিত বই এক কপি যদি পাই তাহলে তর্জ্জমা করে দিই, নিশ্চয় কাজে লাগ্‌বে।

শান্তিনিকেতনের মেয়েদের দেখবার কর্ত্তৃত্ব তোমরা যদি নিতে পার তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই। খুবই দরকার আছে। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

৫৩
২৩ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

P & O. S. N. Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, মোজি হচ্ছে জাপানের প্রথম বন্দর। কাল এসেছি। আজ দশটার সময় জাহাজ ছাড়বে— পর্শু পৌঁছবে কোবে। কাল সুধীন্দ্র আর অপূর্ব্ব রেলপথে চলে গেছে। য়োকোহামায় ক্যানাডীয় জাহাজে গিয়ে উঠ্‌বে। আমার সঙ্গে আছে টাকার। এদের তিনজনের মধ্যে সুধীন্দ্রই সব চেয়ে কর্ম্মিষ্ঠ। গুছিয়ে গাছিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে— অথচ এই ওর প্রথম সমুদ্রযাত্রা— খুব হিসাবী হুসিয়ার মানুষ— ওর ব্যবহারও খুব চমৎকার। টাকার, অপূর্ব্ব দুজনেই এলোমেলো, অপটু— প্যাক করার হাত একেবারেই নেই। টাকার বলছিল সুধাকান্ত এসব বিষয়ে তারে [।] বাড়া— ভাগ্যিস সে আসে নি— তার বোঝা বইতেই প্রাণ বেরিয়ে যেত। আমার এ যাত্রা জাপানে নামা হল না— জাহাজে আছি কোনো উৎপাত নেই— এবারে ডাঙায় ঘুরে বেড়াবার উপযুক্ত সাহস হচ্চে না। ভ্যাঙ্কুভরে জুটবে এণ্ড্রুজ— অব্যবস্থায় সে এদের কারো চেয়ে কম নয়। সুবিধে এই যে আমার প্রয়োজন খুবই অল্প, কারো উপর বেশি ভার চাপাতে ইচ্ছে হয় না, দরকারও হয় না। কাল পর্য্যন্ত শীত খুব বেশি ছিল, আজ সকালে তেমন নেই। তীরের চেহারা ভালো দেখা যাচ্চে না, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কোবেতে পৌঁছিয়ে একটু টানা-টানির মধ্যে পড়ব। সেখানে অনেক ভারতীয় বণিক আছে— অভ্যর্থনার উপদ্রব প্রস্তুত হচ্চে, সইতে হবে— আমার কোথাও নিষ্কৃতি নেই। আজ

৮ই চৈত্র— কিন্তু হায়রে, মলয় পবন কোথায়? আমের বোলের একটুখানি গন্ধ যদি কোথাও পেতুম খুসি হতুম। ২২ মার্চ্চ ১৯২৯

বাবামশায়

তারিখে ভুল করেছি আজ ৯ই চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ। পর্শু সোমবারে আশ্রমে বসন্ত উৎসব। আশা করি এতদিনে পান-বসন্ত উৎসব শেষ হয়ে গেছে।

৫৪

২৪ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

P & O. S. N. Co.
S.S.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, কাল রাত্তিরে জাহাজ কোবে বন্দরে এসে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিল। আজ সকালে এইমাত্র ঘাটের অভিমুখে চলেচে। আর দেরি নেই, বিষম গোলমাল ভিড়ের মধ্যে পড়ব। অপূর্ব্ব তার করেচে সে কোবেতেই আছে— ঘাটে এলেই জাহাজে আসবে। তারপরে— যাই তৈরি হয়ে নিইগে। শীত যথেষ্ট— এরা একে বলে বসন্তকাল— আমাদের পৌষ মাসকে হারিয়ে দেয়। পুনর্জ্জন্ম যদি হয় বাঙলা দেশই ভালো— যদিও— থাক্ সে সব কথায় কাজ নেই। ইতি ১০ চৈত্র ১৩৩৫

বাবামশায়

৫৫

২৮ মার্চ ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এই চিঠিটা পড়লে বুঝতে পারবে। আমার বোধ হচ্চে সৌম্য ওদের উপকার করেছিল। সুধীর হতেও পারে কিন্তু বোধ হয় না। আমি খুব খুসি হয়েছি।

দু তিন দিনের মধ্যে খুব ঠেসে বক্তৃতাদি করতে হয়েচে। কিন্তু এখানে কাজ করে সুখ আছে। তোমরা থাক্‌লে বেশ হত। এরা প্রায় জিজ্ঞাসা করে তোমরা আসবে কিনা। অনেক দেখবার এবং শিখবার আছে। এদের এখানে টানা হেঁচড়া অত্যন্ত বেশি বটে কিন্তু একটা আরাম এই যে এরা যেন আপন লোকের মতো— পাশ্চাত্য দেশে যারা বন্ধু তারা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়, কিন্তু যারা বন্ধু নয় তাদের সঙ্গে কেমন একটা কঠিন দূরত্ব, তাতে অস্বস্তি বোধ হয়। যাক্‌গে আজ বিকেলে পাড়ি দিতে হবে। ৯ দিন ভাসতে ভাসতে ডাঙায় পৌঁছব। নল্‌ডেরাতে যত আরামে ছিলুম এ জাহাজে তা পাবনা। চলে যাবে। আমার সঙ্গে পুপের এক জায়গায় গভীর মিল আছে— আমাদের উভয়েরই মতে শান্তিনিকেতনের মতো জায়গা ভূমণ্ডলে নেই। বউমা শুনে হাসবে, ভাববে মাসখানেক যেতে না যেতেই আমাকে ঘরের টানে টেনেচে কথাটা মিথ্যে নয়— তবু কর্ত্তব্য সাধনে বিঘ্ন হবেনা।

বাবামশায়

৫৬
৩১ মার্চ ১৯২৯

বৌমা য়োকোহামা ছেড়ে কয়দিন বেশ একটু দোলা লাগিয়েছে। আজ রাত্রে সমুদ্র একটু শান্ত হবার চেষ্টা করচে। শীত রীতিমত। মোটা মোটা কাপড় পরে বেড়াচ্চি। শরীর যতটা, কাপড় চোপড় তার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশি। ঐটে ভালো লাগেনা— মনে হয় যেন দেহটাকে মোটা পাঁচিলওয়ালা জেলখানায় পূরেচে। টাকার সাহেব একেবারে শয্যাগত। সুধীন্দ্র অনেকটা অটল আছে। অপূর্ব্বর খাওয়া কামাই যাচ্চে না। য়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভর পর্য্যন্ত সমুদ্রপথ প্রকাণ্ড লম্বা— যেন বরুণ পুরীর চিৎপুর রোড। আজ ৩১শে মার্চ্চ। কাল পয়লা এপ্রেল। সমুদ্র যদি তার নিজের বছর মাফিক ঠাট্টা করে তা হলে অতল পরিহাসের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে। তোমরা কোথায় কি ভাবে আছ ভালো রকম আন্দাজ করতে পারচি নে, তার কারণ জল হাওয়া একেবারেই তফাৎ— জল হোলো কালা পানি, বাতাস হোলো কালিয়ে দেওয়া, আর ডাঙার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই। সূর্য্য যেন অভিমন্যুর মতো— কয়দিন আগে মেঘের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করেচে কিছুতে আর বেরতে পারচে না। আকাশটা যেন শূন্য পেয়ালা, দেবতা কবে সূর্য্য কিরণের সোনার মদ তাতে ঢালবেন তাই অপেক্ষা করে আছি। শান্তিনিকেতনের মানুষ প্রশান্ত মহাসাগরের নাম শুনে ভুলেছিল কিন্তু... ব্যবহারটাতে তোলপাড় করে দিয়েচে।

বাবামশায়

৫৭
[৫ এপ্রিল ১৯২৯]

বৌমা, জলচর এবার ডাঙার দিকে তাকিয়েচে, ভাবচে কি জানি কি গতি হয়। সেখানে শিকারীর আড্ডা, সেইজন্যেই এত উৎকণ্ঠা। বরুণদেব এতদিন করুণ ছিলেন, আশা করি যক্ষপুরীর মালেকদের সঙ্গে সখ্য হবে। লক্ষের প্রতি লক্ষ্য করচি— পরিণামে আর কিছু না হয় ত হরিনাম সম্বল। মনটাকে নিরাসক্ত নির্লোভ করেই রেখেচি। ঘড়িতে রাত্রি সাড়ে দশটার দিকে কাঁটা এগিয়ে এসেচে। কাল সাতটার সময় সকালে জাহাজ ঘাটে পৌঁছবে— আটটার সময় তীরে উত্তীর্ণ হবো। ইতিমধ্যে ডাক্তার আছে, নানাপ্রকার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর আছে। জানাতে হবে এক স্ত্রী ও এক ঈশ্বরে আমার মতি— বলতে হবে এই মহাদেশে বাস করা, চাষ করা বা ধর্ম্মনাশ করায় আমার বিশেষ সখ নেই। তা ছাড়া বসন্ত রোগের টীকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞান পত্রতলব করবে। সে পত্র আমার নেই— ঋতুরঙ্গ বইখানা আছে তার থেকে প্রমাণ করতে পারি বসন্ত ঋতুর টীকা আমার কপালে আছে— কিন্তু ম্লেচ্ছরা তার অর্থ বুঝতে পারবে না। আশা করি আমি ছাড় পাব, কারণ গরজ আমার চেয়ে ওদেরই বেশি। এবার শুয়ে পড়ি— কাল ভোরে উঠ্‌তে হবে। রোজই ভোরে উঠি কিন্তু তাড়াহুড়া ছিল না— আলো জ্বালিয়ে কমলালেবু ও কলা খেতুম— তার পরে আসত চা। তার পরে অপূর্ব্ব। তারপরে ইত্যাদি—

৫৮

১২ মে ১৯২৯

ওঁ

বৌমা বাড়িমুখেই চলেছিলুম। তোমরা আসবে শুনে আবার কিছুদিনের জন্যে মন স্থির করে বসেচি। পাখীটা উড়বে বলেই ডানা মেলেছিল, আবার ঘাড় হেঁট করে মাটিতে নেমে দাঁড়িয়েচে। জাপানের লোকেরা প্রস্তাব করেচে এখানে গ্রীষ্মের কয় মাস অর্থাৎ অগস্টের শেষ পর্য্যন্ত তাদের আতিথ্য গ্রহণ করি। ফস্ করে রাজি হতুম না। কিন্তু জানি তোমার অনেকদিনের ইচ্ছে জাপান দেখতে, এবং এখানে তোমার পক্ষে দেখবার জিনিষও অনেক আছে তাই রেডিয়ো যোগে ওদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়েছি। জাপান আমার নিজেরও ভাল লাগে, জাপানীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে তা হোক্ তবু শরীর মন শান্তিনিকেতনের দিকেই ঝুঁকে থাকে, —আর দেশ দেশান্তরে বক্তৃতা করে বেড়াতে ইচ্ছে করে না। চারদিকের টানাটানিতে ভারি অস্থির করে তোলে। আমার মুষ্কিল এই যে, আমাকে নানা দলের লোক দাবী করে, সকলের মৎলব বুঝতে পারি নে, পাক খেয়ে বেড়াই। এখানে এসেই ভারতবর্ষীয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছি, সবাইকে চিনি নে, বুঝি নে, কাউকে এড়াতেও পারি নে। ওরা আমার পরে দখল দাবী ক'রে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে বসে আছে— চেষ্টা করচি যাতে আজই টোকিয়োতে একটা হোটেলে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারি। তুমি আসবে শুনে এখানে সবাই খুব খুসি হয়েছিল— এলে খুব যত্ন আদর পেতে পারতে। অপূর্ব্বকে বলেছি অমিয় হৈমন্তীকে সহায় করে এখানে তোমার আসবার প্রস্তাব করতে। এখনো তো সময় আছে। শুনলুম একটা জাহাজ আছে যেটা এখান থেকে যাবার মুখে জাভা হয়ে যায়— সেটা পেলে তোমার জাভা দেখাও হয়। এবার দেশ ছেড়ে অবধি দেশের খবর পাইনি বল্লেই হয়। টাকার-এর অব্যবস্থায় বোধ হচ্চে এক দফা চিঠি

মারা গেছে। অদ্ভুত ব্যাপার এই, এ সব দেশের খবরের কাগজে ভারতবর্ষের নামগন্ধও থাকে না। দৈবাৎ অতি সংক্ষেপে আভাস পাই যে কি সব গোলমাল হচ্চে। এক একবার ভাবি ভালোই— মনটাকে সম্পূর্ণ ফাঁকা রেখে অবিচলিত চিত্তে নিজের কাজ করে যাওয়াই ভালো। আমার বয়স উনসত্তরের কোটায় তিন দিন এগিয়েচে, অর্থাৎ সত্তর পৌঁছতে ৩৬২ দিন বাকি, আর কি এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার সময় আছে? বৈশাখ প্রায় শেষ হয়ে এল, শান্তিনিকেতনে নিশ্চয় এখন ছুটি, কুয়োর জল পাঁকের দিকে নেমেচে— অসহ্য গরম— কিন্তু এখানে এখনো যথেষ্ট ঠাণ্ডা— শীতের কাপড় পরে আছি। ইতি

বাবামশায়

৫৯

[১৯ অগস্ট ১৯২৯]

ওঁ

বৌমা

সুমিত্রা সংশোধন পরিমার্জ্জন শেষ করে কাল পড়ে শোনালুম। লোকে ভালো বল্‌চে বলা বাহুল্য। কিন্তু ধাঁ করে অভিনয় হতে পারবে এ আশা করতে পারিনে। অজিন বিক্রমের পার্ট পারবে না। কে পারবে? লোক কোথায় পাব? এই তর্ক চল্‌চে।

আমাকে আরো দু চারদিন এখানে ধরে রাখবে। প্রথম অনুনয় হচ্চে রাণীর— দ্বিতীয়, আমার বই ছাপার ব্যবস্থা। মহুয়া এবং সহজ পাঠ। ইতিমধ্যে রথী এখানে আসবে এমন একটা কথা শুনচি। যদি অভিনয়ের কোনো সুব্যবস্থা সে করতে পারে চেষ্টা করে দেখুক।

সেই আমার কাঠের Sealগুলো— মহুয়ার এবং আমার bookplate এর, কালীর pad সুদ্ধ কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। ওকুরাকে বই পাঠাব তাতে ছাপ মারতে হবে।

আশা করি হারা-সান সিঙাড়া কচুরি খাজাগজার অনুশীলনে আমার অনুপস্থিতির দুঃখ ভুলেচে।

ভয়ঙ্কর মশা— দিনের বেলাও নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু তাদের কামড়ের জ্বালা বীরভূমের মশার চেয়ে অনেক কম।

আজ দিনুরা আসবে শুনচি। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৩৬

বাবামশায়

এই কাটাগানটিও আছে চিঠির এক পাশে :

দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে।
ওগো বঁধু আমার সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ পরে।

৬০

[২ মে ১৯৩০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এরিয়ামের চিঠিতে সব খবর পাচ্চ জেনে চিঠি লেখা সম্বন্ধে পরিপূর্ণমাত্রায় কুঁড়েমি করচি। বস্তুত আজকাল আমার লেখার স্রোত

একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি— যারা সমজদার তারা বলে এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু বুঝতে পারচি এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো। তুমি যে একদা বলেছিলে আমার ছবিগুলো ভালো জাতের, সে কথাটার পরখ হয়ে গেল, এরাও তাই বলচে— শুনে আশ্চর্য্য ঠেকচে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া যদি না থাক্‌ত তাহলে ছবি ভালোই হোক্ মন্দই হোক কারো চোখে পড়ত না। একদিন রথী ভেবেছিল ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনিই ঘটে— অত্যন্ত ভুল। এর এত কাঠখড় আছে যে সে আমাদের পক্ষে অসাধ্য— আন্দ্রের পক্ষেও। খরচ কম হয়নি— তিন চারশো পাউণ্ড হবে। ভিক্টোরিয়া অবাধে টাকা ছড়াচ্চে। এখানকার সমস্ত বড়ো বড়ো গুণীজ্ঞানীদের ও জানে— ডাক দিলেই তারা আসে। Comptesse de Noailleও উৎসাহের সঙ্গে লেগেচে— এমনি করে দেখতে দেখতে চারদিক সরগরম করে তুলেচে। আজ বিকেলে প্রথমে দ্বারোদ্ঘাটন হবে— তার পরে কি হয় সেইটেই দ্রষ্টব্য। যাই হোক, এখানকার পালা সাঙ্গ হলে ছবিগুলো ঘাড়ে করে কী করতে হবে ভেবে পাইনে। ডাল বলচে জুনে স্টকহল্‌মে একবার যাচাই করা যাবে সেখানেও একটা সোরগোল হতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে? বার্লিনে কে দায় নেবে? দায় কম নয়। লণ্ডন ছবি দেখাবার পক্ষে খারাপ জায়গা নয় এই কথা সকলে বলচে— অতএব ছবিগুলো আমার সঙ্গে সেখানে নিয়ে যাওয়া মন্দ পরামর্শ নয়। প্যারিসে যদি ঠিক সুর লাগে তাহলে সব জায়গাতেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। ভিক্টোরিয়া ছবি বিক্রির কথা বলছিল— বোধ হয় এই উপলক্ষ্যে নিজে কিনে নেবার ইচ্ছে। আমি বলেচি এখন বেচবার কথা বন্ধ থাক্। আর যাই হোক্ আমার ছবি দেশে ফিরতে দেব না— অযোগ্য লোকের হাতে অবমাননা অসহ্য।

রথীর জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। ওখানে যদি যথেষ্ট উপকার না হয় তাহলে কী করবে? একবার কি ভিয়েনাতে চেষ্টা দেখবে? আমার বোধ হচ্চে

রথীকে কোনো ভালো জায়গায় প্রায় বছর খানেক রাখা দরকার হবে। সেই রকম বন্দোবস্ত করা ভালো। Kali Phos এবং Natrum Phos যদি ও অনেকদিন প্রত্যহ খায় তবে আমার বিশ্বাস উপকার পাবে। তোমার নিজের শরীর আশা করি ভালো। আমাকে নিরতিশয় ক্লান্ত করেচে। ভিক্টোরিয়া স্থির করেচে এখানকার একজন বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে আমার পরীক্ষা করাবেন। শরীর তো একরকম করে চল্‌চে কিন্তু যে পরিমাণে প্রত্যহ চুল উঠ্‌চে তাতে আন্দাজ দেশে ছবিও যদি না ফেরে চুলও ফিরবে [না]। এখানে আসবার সময় নারকেল তেলের শিশিটাকে [না এনে] ভালো করিনি ওটা চুলের পক্ষে ভালো।

ভিক্টোরিয়ার আমেরিকায় যাবার তাড়া। কেবল আমার এই ছবির জন্যেই আছে। কিন্তু আর বেশি দিন থাকবেনা। এই মাসের ৭ই ৮ই যাবে। তার পরেই আমার ইংলণ্ডের পালা আরম্ভ হবে। সে আবার সম্পূর্ণ একটা নতুন অধ্যায়। এণ্ড্রুজের বিশ্বাস লেকচারটাতেও একটা রব উঠ্‌বে। কিন্তু ওতে আমার মন নেই।

পুপুকে আমার জোব্বার মধ্যে আচ্ছন্ন করবার যে কাজ পেয়েছিলুম সেটা বন্ধ হওয়াতে আমার জোব্বাগুলো হতাশ হয়ে ঝুলে পড়েচে। কিন্তু তা ছাড়া আর একটা কারণ আছে, আমার অধিকাংশ জোব্বার বোতাম ও তার বন্ধনীতে সামঞ্জস্য নেই সুতরাং সেগুলো বহন করি বাক্সে, দেহে নয়। সুহৃৎ কেমন আছে— ওখানে ভালো পাঁউরুটি ও ফ্রোমাজের অভাব হবে না কিন্তু তার দ্বারাতেই কি সকল অভাব দূর হতে পারবে?

বাবামশায়

৬১

১ জুন ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বক্তৃতা দিতে দিতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েচি রাজধানীতে। আছি আর্য্যভবনে। এতদিন ছিলুম আতিথ্য আদর অভ্যর্থনার ভিড়ের মধ্যে— সর্ব্বদাই ঘেঁষাঘেষি— নব পরিচিতের দৃষ্টির সম্মুখে। এখানে অসংখ্য অপরিচিতের নির্জ্জনতায় আরাম বোধ করচি। এ বাড়িটা বেশ রীতিমত ভালো, আরামের, কোনো নোংরামি বা বিশৃঙ্খলতা নেই। একমাত্র অসুবিধা এই যে এখানে অরবিন্দের আসবার কোনো বাধা নেই। আহারটা সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী দস্তুরের। উপকরণ খাঁটি, রান্নাও ভালো। লোকেরা ভদ্র ও আতিথেয়। কিছু কিছু নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের সূচনা হয়েচে। আজ রাত্রে আগা খাঁয়ের হোটেলে ডিনার। খুব আমিরী হোটেল, কেবলমাত্র ওমরাওদের অধিকার সেখানে। বামনজি এই কথাটা খুব জোরের সঙ্গে আমার কর্ণগোচর করেচে। আমি ভয়ে সম্ভ্রমে অভিভূত। এত বড়ো সম্মান জীবনে ক'বারই ঘটে। কাল রাত্রে রোটেনস্টাইন গৃহিণীর আমন্ত্রণ। তারপরে অদৃষ্টে আরো কত সম্মান সমারোহ আছে জানিনে। ৩রা জুনে পেন্ ক্লাব। ৫ই জুনে বার্ম্মিংহাম্ আর্টিষ্ট দরবারে আমার অভ্যর্থনা। তার পর দিনে লেনার্ডের ওখানে। তার পরে কোন্ নাগাদ তোমাদের বাসায় ভিড়তে পারব সেইখানেই সেটা স্থির হবে। মোট কথা একেবারে হয়রান হয়ে গেছি। কয়দিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম— আজো তার দুর্ব্বলতার বোঝা পিঠের উপর চেপে বসে আছে। কোথাও এক কোণে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারলে বাঁচি। জগতের হিত করতে আর ইচ্ছা করচে না।

নীলমণির সাহচর্য্যে উদয়নের ঊর্দ্ধলোকে উত্তীর্ণ হবার বাসনা মনে বেদনা আনয়ন করচে। ইতি

বাবামশায়

৬২

১৮ অগস্ট ১৯৩০

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। দিনের পর দিন। সবাই বল্‌চে এমন কাণ্ড হয় না কখনো। আমি মনে মনে ভাবচি এটা আমারি কীর্ত্তি। আমি বর্ষার কবি। শ্রাবণমাসে বর্ষামঙ্গল আমার পিছনে পিছনে সমুদ্রপার হয়ে এসে হাজির। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তেই হবে, "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে" এ কবিতাটা ঠিক খাটচে না। হৃদয় নাচ্‌চে না— দমে আছে। আরো দমেচে যেহেতু এণ্ড্রুজ এসে উৎপাত আরম্ভ করেচে। তার মতে আমাকে চল্‌তে হবে। আমি প্রমাণ করতে চাচ্চি যে আমি নাবালক নই। যাকগে— আগামী মঙ্গলবারে যাব জেনিভায়। সেখানে আর এক পালা। শুনচি আয়োজন করেচে খুব বড়ো রকমের। আদর অভ্যর্থনার অভাব হবেনা। কিন্তু সেখানে নানাবিধ শ্রেণীর মানুষ আছে— তার মধ্যে আছে আমার স্বদেশের লোক।

এখানকার ন্যাশনাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েচে শুনেচ। তার মানে তারা পৌঁচেচে ছবির অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্যে ভাবছিল— টাকা নেই কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে আমি জর্ম্মানিকে দান করলুম দাম চাইনে। ভারি খুসি হয়েচে। আরো অনেক জায়গা থেকে

একজিবিশনের জন্যে আবেদন আসচে। একটা এসেচে স্পেন থেকে— তারা চায় নবেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়চে কবি নামকে ছাপিয়ে। থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ— খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর,— জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুর বেলা; নদীরধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে— কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল পলাশ মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুল্‌চে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করচে— আমার জানলার কাছ পর্য্যন্ত উঠেচে চামেলি লতা। নদীতে নেবেচে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম কেদারা— মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্য্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে লীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাক্‌বে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটীরে তার বাসা— যখন খুসি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুন্‌তে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ কালে সাহিত্য আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে— নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো— সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে, জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে

মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাস্‌চে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু, তার বাছুর নিয়ে। শাকসবজির ক্ষেত আছে, বিঘে দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়া দাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট— রান্নাঘর নেই। থাক্‌ এই পর্য্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়চে আছি বর্লিনে— বড়ো লোক সেজে— বড়ো কথা বল্‌তে হবে— বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চল্‌তে হবে দিনের পর দিন— জগৎ জোড়া সব সমস্যা রয়েচে তর্জ্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী— তার অনেক দাবী, অনেক দায়— ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্‌ আমার স্টুডিয়ো। কত দিনই বা বাঁচব— ইতিমধ্যে কর্ত্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক্‌— রেলে চড়ে, মোটরে চড়ে, জাহাজে চড়ে, ব্যোমযানে চড়ে— সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি

বাবামশায়

৬৩
[২৪? অক্টোবর ১৯৩০]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, পাছে তোমরা ভয় পাও তাই আমি নিজের হাতে তোমাদের চিঠি লিখচি। আমার অবস্থা যে পূর্ব্বের চেয়ে খারাপ তা নয়। সেই রকমই। তবে কি না ডাক্তার বলচে এটা ভালোরকমের অবস্থা নয়। অর্থাৎ পূর্ব্বেও

ভালো ছিল না এখনো ভালো নয়। এখানকার একজন সব-সেরা হৃদ্‌রোগতত্ত্বজ্ঞ আমাকে দেখতে এসেছিলেন। উলটিয়ে পালটিয়ে নানা রকম ঠোকাঠুকি করে তিনি খুব জোর্‌সে বল্‌লেন, সব রকম এন্‌গেজ্‌মেণ্ট এখনি বন্ধ করে দিয়ে অন্তত নবেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ এদেশ থেকে দৌড় দিতে হবে। ডাক্তার রোজ দুবার করে আমাকে দেখ্‌তে আসেন। কিছু ওষুধ দিয়েচেন তাতে আমি উপকারও পেয়েছি। কিন্তু বক্তৃতাদি বন্ধ। তাঁর উপদেশ এই, দেশে ফিরে গিয়ে ভালোমানুষের মত অত্যন্ত চুপচাপ করে দিন কাটাতে হবে। আমিও তো দৌড়ধাপ করতে চাইনে— বিশ্বভারতীর ভূতে আমাকে দৌড় করায়। সেই ভূতটাকে ঝাড়াবার জন্যেই এত কষ্ট করে এদেশে আমার আসা। এইমাত্র এখানকার কোয়েকার সমাজের প্রধানবর্গ এখানে এসেছিলেন। তাঁরা আমাদের ভাষায় যাকে বলে মুক্তকণ্ঠ— অর্থাৎ সাদা ভাষায়, খুব দরাজ গলা করেই বল্‌লেন টাকার জন্যে এবার আমাকে ভাবতে হবে না। দৈন্য আমাদের দূর হবেই একথা পাকা। অতএব জীবনের বাকি কয়েকদিন আর পরের দ্বারে হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন ঘুচল। একটা ইজিচেয়ার, একটা ইজ্‌ল্ আর একটা স্টুডিয়ো এবং খানকয়েক বই— আর এ ছাড়া লীলমণি, এ হলেই আমার দিন কাটবে— ময়ূরাক্ষী নদীটা বোধ হচ্চে যেন সম্ভবপরতার পরপারে।

তার পরে ছবির কথাটা বলে রাখি। আরিয়াম হলেন তার উদ্যোগী। বস্‌টনে কাজ সুরু হয়েচে। সেও দেখি মুক্তকণ্ঠ— অর্থাৎ সেও দরাজ গলায় বল্‌চে, ছবি কসে বিক্রি হবে। লোকে খুসি, এবং যাকে বলে বিস্মিত। তা ছাড়া বোধ হয় এও ভাবচে এ মানুষটার কি জানি কখন্ কি হয়, এর পরে ছবিগুলোর দাম বাড়বে। যাই হোক ভাবগতিক দেখে আরিয়াম ঠিক করে রেখেচে বস্টনে এবং নিউইয়র্কে ছবি সমস্ত বিকিয়ে যাবে। আমারও সেটা অসম্ভব বোধ হচ্চে না— কারণ আমার সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা সত্য সত্যই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেচে।

যদি বিক্রি হয় তা হলে কিছু মোটা গোছের টাকা হাতে আসবে। এই টাকাটা সমস্তই যেন তোমাদের ধার শোধের জন্যেই ব্যবহার হয়। আর কিছুরই জন্যে নয়। তোমাদের ঋণের চিন্তা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত কাবু করে রেখেচে। তোমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে একটুও হাত দিতে চাই নে বলেই নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলুম। অথচ বুঝতে পারছিলুম রথীর শরীর ভেঙে যাবার অন্যতম কারণ এই দুশ্চিন্তা। আমার ছবি বিক্রি করে এই দায় ঘোচাব বলে একান্ত আশা করেছিলুম। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারটা ক্রমে আমার প্রত্যয়গোচর হয়েচে যে, আমার ছবির দাম আছে এবং সে দাম বাড়বে। আজ হোক কাল হোক এই ছবি থেকে ঋণ শোধ হবেই। তার-পরে— তারপরে কি সে কথা বলি।

ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েচে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেকদিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করে ছিলুম আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়— আমরা যেন ট্রস্ট্রির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোষাক দাবী করতে পারব কিন্তু সে ওদেরি অংশি[শী]দারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম জমিদারী রথ সে রাস্তায় গেল না— তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সঙ্কল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেচি— কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তাহলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান করেচি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ হোল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে

তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেচে। মৃত্যুর আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?

আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর দূরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করেচি আজ হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ভিৎ পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকি নি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হূ হূ করে এঁকে ফেললুম আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কি? জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন। আমার Religion of Manও সেই পরিশিষ্টেরই অঙ্গ। জীবনে যা কিছু সুরু করেছি তা সারা করে যেতে হবে। কোনোটা বাকি থাকবে না।

এই পরিশিষ্টের শেষ অংশে ধনীর পোষাক আমাদের ছাড়তে হবে নইলে লজ্জা ঘুচবে না। আমার ভাগ্যবিধাতার আশ্চর্য্য বিধান এই যে এখন থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবিকা নিজের চেষ্টায় উপার্জ্জন করতে পারব। এদেশ থেকে রঙীন কালী আর ছবির কাগজ নিয়ে যাব— তার পরে ভরসা করচি আমার ছবি আঁকা নিরর্থক হবে না। দেশের লোকে আমাকে বিশেষ কিছু দেয় নি ভালোই হয়েচে— নিন্দা অনেক সয়েচি সেও ভালো হয়েচে। সুদীর্ঘ নিঃসঙ্গ দুঃখের পথ মনে হচ্চে যেন আজ সফলতায় উত্তীর্ণ হবে— স্বদেশের কাছে অনেক আশা করে বঞ্চিত হয়েচি, বন্ধুরাও পদে পদে প্রতিকূলতা করেচে— কিন্তু কিছু ক্ষতি হয় নি— বরঞ্চ তাদের আনুকূল্যই হয় তো আমার সইত না। ইতি

বাবামশায়

৬৪

২৫ নভেম্বর ১৯৩০

ওঁ

1172 PARK AVENUE

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ রাত্রে একটা ভোজ আছে। পাঁচ শো লোক মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে। এটা যে আমার পক্ষে কত বড়ো পীড়া তা কেউ বুঝবে না। খ্যাতির আড়ম্বরে অনেকখানি মস্লা থাকে যা কেবলমাত্র ওজন বাড়াবার জন্যে কিন্তু সেইটের বোঝা বড়ো অসহ্য। এই দেশে সব জিনিষকেই আয়তনে বড়ো করে তোলবার একটা ভয়ঙ্কর নেশা আছে— যে কেউ যে কোনো কাজ করতে চায় আতিশয্যের যন্ত্র সঙ্গে রাখে— তাকে বলে পাব্লিসিটি। তাতে কেবলি আওয়াজ বড়ো করে, আকার বড়ো করে, চীৎকার ক'রে বল্‌তে থাকে আমার দিকে চেয়ে দেখো। হাজার হাজার লোকে এই রকম চীৎকার করচে। হায়রে, এর মাঝখানে আমি কেন? কি পাপ করেছিলুম? বিশ্বভারতী? প্রায়শ্চিত্ত করে বিদায় নিতে পারলে বাঁচি। প্রতি পদে মনে হচ্চে সত্যকে মিথ্যে করে তুলচি— সেই মিথ্যের বোঝা কি ভয়ঙ্কর! নিজেকে অত্যন্ত সহজ করে বাজে সাজ সরঞ্জাম সব ফেলে দিয়ে হাল্‌কা হয়ে বসব কবে সেই কথাটাই দিনরাত্রি ভাবচি। লিখব পড়ব ছবি আঁকব আমার কাঁকর-বিছানো বাগানে সকালে বিকালে একটু পায়চারি করে আসব— তার পরে জানলার ধারে একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে খোলা আকাশে রঙীন মেঘের সঙ্গে আমার রঙীন কল্পনার মিলন ঘটাব— ইত্যাদি ইত্যাদি কত কি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মস্ত বড়ো প্রফেট, ফিলজফার এই বাজে কথাটা সম্পূর্ণ লোপ করা আর সম্ভব নয়। সুতরাং দেশ বিদেশ থেকে চিঠি আসবে আগন্তুকের দল

আসবে, নানা প্রশ্নের নানা জবাব দিতে হবে— তবু তার মধ্যে থেকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বাঁচাতে পারলে সেইখানে আমার চিত্রশালা খুলব— দর্শনার্থীর মধ্যে কখনো কখনো পুপু আসবে— তাকে বোধ হয় বাঘের গল্প বলে ভোলানো আর সম্ভব হবে না— গল্পের চেহারা বদল করব— সুবিধে এই যে সে আমার কাছ থেকে ফিলজফি দাবী করবেনা। :— ২৭ তারিখে ব্রেমেন জাহাজে এখান থেকে দৌড় দেব। তার আগে একবার কানাডায় যাব। য়ুরোপ থেকে জাপানী জাহাজে যাত্রা করবার চেষ্টায় রইলুম। ইতি

বাবামশায়

অমিতার চিঠিখানা তাকে পাঠিয়ে দিয়ো।

৬৫

৩ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, পাড়া গাঁ আমার ভালো লাগে কিন্তু নিজের কোণটুকু আমার আরো ভালো লাগে। নিজের জগৎ নিজের হাতে বানিয়ে তার মধ্যেই বাস করা আমার বরাবরকার অভ্যাস সেইজন্যে সম্পূর্ণ অখণ্ড অবকাশ না পেলে দুই একদিনেই হাঁপিয়ে পড়ি। আদর যত্ন সেবা ভালো লাগে না তা নয়— কিন্তু তাতেও জায়গা জোড়ে, মন বাধা পায়। তাই

শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে মন উতলা হয়ে উঠেচে। কালই অপরাহ্ণ চারটের গাড়িতে দৌড় দেব। প্রতাপকে নিতান্তই দরকার আছে বলে মনে করিনে— বনমালীর সঙ্গে মোবারককে জুড়ে দিলে আমার সংসারে তো বিশেষ অভাব থাকেনা। তোমাদের ওখানে প্রতাপকে না হলে তোমাদের কষ্ট হবে— ওকে সেখানে রেখে দিলে আমি খুসি হতুম এবং নিশ্চিন্ত হতুম। যদি ইচ্ছে করো ওকে পাঠিয়ে দিতে পারি— নিশ্চয় জেনো আমার শিকি পয়সার অসুবিধা হবেনা। আমি গরমকে ভয় করি নে, মশাকে ভয় করি— তাকে পরাস্ত করবার যতরকম পরীক্ষা সম্ভব, করে দেখব— তার ফলে হয় তো বিশ্বের একটা হিতসাধন হতেও পারে। অমূল্যবাবু এসেছিলেন— আলো পাখার যন্ত্র রওনা হয়ে গেছে, দাম চুকিয়ে দিয়েছি। তাঁকে ধরেছি আমাদের জল দান করতে— শীঘ্র যাবেন বলেচেন। যতদিন পারো দার্জ্জিলিঙে থেকো, একেবারে অক্টোবরে এলে ভালো হয়। পুপুকে বোলো সে চলে যাবার পর থেকে পুষ্প আমার কাছেও ঘেঁযে না, তাই সম্পূর্ণ একলা পড়ে গেছি। আপাতত বনমালী ছাড়া আমার আর গতি নেই। ইতি

বাবামশায়

৬৬

[১৫ এপ্রিল ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল পয়লা বৈশাখের উৎসব হয়ে গেল। বাইরে থেকে বেশি লোক আসেনি আশ্রমের সবাইকে নিয়েই একরকম জমেছিল। তোমরা চলে

যাওয়ার পর প্রথম কয়েকদিন বেশ একটু রীতিমত শীত পড়েছিল। একবার বৃষ্টি হয়েও গেল তার পরে গরম পড়েচে। কিন্তু এমন কিছু কষ্টকর বলে মনে হচ্চে না। ফুল অপর্য্যাপ্ত ফুটচে— বেলফুল টগর মধুমঞ্জরী কাঞ্চন কুড়চি অজস্র।

নীতু চলে গেল। বুড়ি তার বন্ধুদের নিয়ে হো হো করে বেড়াচ্চে। টাকাগাকিরা গরমে হাহুতাশ করে মোলো। কিন্তু হোচিসান কোনোমতেই হার মানতে চায় না। আজ সন্ধে বেলায় সে চা-উৎসব করবে উদয়নের পশ্চিমপ্রাঙ্গনে।

Flatulace এর জন্যে রথীকে Lycopodium 30 দিয়ো। আমার বিশ্বাস পাহাড়ের জলটা রথীর পক্ষে পথ্য নয়।

বাবামশায়

পুপুর "সে" একেবারেই নিরুদ্দেশ। হয়তো দার্জ্জিলিঙে চলে গেছে। এখানে তার একটা কুকুর তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। আমার বিছানার নীচে রাত্তিরে শুয়ে থাকে।

৬৭

২৮ এপ্রিল ১৯৩১

ওঁ

উদয়ন

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমার টেম্পেরেচারে বাড়াবাড়ি তেমন কিছুই নয় যেমন গুজবটাতে। কি করে সুরু হল শুন্‌লেই বুঝতে পারবে জিনিষটার ওজন

কি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেহে তাপনল প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছিল, উত্তাপের পরিমাণ আটানব্বই ডিগ্রির পাঁচ ছয় ফোঁটা ঊর্দ্ধে। বিনাকারণে উদ্বিগ্ন হতে যাদের সখ তারা বল্‌লে একেই তো বলে জ্বর। তার পর থেকে লোকসমাজে প্রকাশ, আমার শরীর ভালো নেই। অথচ শরীরের চালচলন সম্পূর্ণ সহজ লোকের মতোই। অবশ্য বৈশাখমাসে গ্রীষ্মকালের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েচে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। মধ্যাহ্ন কালটা যথোপোযুক্ত উত্তপ্ত বোধ হয়— তোমার গন্ধরাজের গাছগুলো অত্যন্ত বিমর্ষ। পাখীরা ঠোঁট ফাঁক করে জল খুঁজে বেড়াচ্চে। আকাশে একটা নীলিম লঘু কুহেলিকা। রোজ আশা করে থাকি উত্তর পশ্চিমে সজল জলদের আশ্বাস পাওয়া যাবে কিন্তু দিগন্ত একেবারে দেউলে। যাই হোক যা আশঙ্কা করা যায় তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

নুটুদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেচি। তিনি কিছুমাত্র অপ্রসন্ন নন। অনুষ্ঠান কি রকম হওয়া কর্ত্তব্য সেই প্রশ্ন করে তিনি প্রমথ নাথ তর্কভূষণকে পত্র লিখবেন বলেচেন। উত্তর এলে তার পরে আলোচনা করব কার দ্বারা কাজ সমাধা করা যেতে পারে। ছুটির মধ্যেই কার্য্য সম্পন্ন হবে এই কথাই এ পর্য্যন্ত স্থির আছে। কোনো বিঘ্নের আশঙ্কা করচিনে।

তোমাদের সব্‌জি ক্ষেতের কোণে একটা কুয়ো খোঁড়া সুরু করা হয়েচে। এইটে আমার সত্তর বছর বয়সের একটা দানস্বরূপ রইল। ইতি
১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

বাবামশায়

হোচি সানকে দিনুরা দার্জ্জিলিঙে নিমন্ত্রণ করেছিল। গরম তার পক্ষে অসহ্য হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্মোৎসবের আগে কোনোমতেই যেতে রাজি হোলো না। কিন্তু তার পরেও না গেলে ও তো বাঁচবে না। বড়ো আশ্চর্য ভালো মেয়ে ও।

৬৮

৯ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কাল অনুষ্ঠান খুব ভালো করে সম্পন্ন হয়েচে। তুমি নিশ্চয় মনে করচ আমি নুটুর বিয়ের কথার উল্লেখ করচি। কিন্তু যদি নিজের জন্মদিনের ব্যাপারটাকে তার পূর্ব্বেই বসাই তবে আশা করি সেটাকে অহঙ্কার বলে গণ্য করবেনা। সকলে সবসুদ্ধ খুব খুসি। এরকম অনুষ্ঠান কলকাতায় কিছুতেই সম্ভবপর হয় না।

নুটুর বিয়ের আদ্যন্তবিবরণ নিশ্চয় কোনো লেখিকার পত্রে পেয়েচ। সমস্ত বাধা অতিক্রম [করে] কাজ সমাধা হয়েচে। এই ব্যাপারে কুমার মহলে চাঞ্চল্য জন্মেচে। মুকুলও সুরেনের পথ অবলম্বন করতে উৎসুক, গোরাও।

তোমরা থাকলে সকলেই খুসি হোত কিন্তু এই ডবল টানাটানি রথীর সইত না সে নিশ্চিত। কিন্তু আশ্রমে দিনুর যে সব বহুতর ভক্ত ও ভক্তরা আছে তারা নিশ্চয় ঠিক করে রেখেছিল। কালকের মত দিনে দিনু কখনই নিষ্ঠুর ভাবে দূরে থাকতে পারবেনা। তার পরে তারা যখন শুন্‌লে দিনুর সদয়হৃদয় বিচলিত হয়েছিল কেবল দিনুনীর কঠিন শাসনে সংকল্প অপরিণত রইল তখন তারা মনে মনে সান্ত্বনা পেল। অথচ দিন এখানে স্নিগ্ধ, একটুও গরম নয় এমন কি, মাঝে মাঝে ঠাণ্ডার আক্রমণে দ্বার বন্ধ করে গায়ে কাপড় দিতেও হয়েচে।—অনেক রকম উপহার এসেচে তার অধিকাংশই তোমার ভাণ্ডারে যাবার যোগ্য। সেই যে আঙটি তোমাকে দিয়েছি সেটা থাকলে বর-বরণের উপকরণ সুন্দর হতে পারত। প্রশান্তরা এসেচে। হাজার হাজার চিঠি লিখতে হচ্চে এবং প্রত্যহ বিশ পঁচিশ হাজার লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ চলচে— বোধ হচ্চে আগামী

বৎসরের জন্মদিনটা এই বৎসরেই নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। ইতি
২৩ বৈশাখ ১৩৩৮

বাবামশায়

৬৯

১৭ মে ১৯৩১

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা— পারস্যকে ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু পারস্য কিছুতেই ছাড়ল না। মরিয়া হয়ে বললে শরীরে দুর্ব্বলতা যদি থাকে ভালো ডাক্তার সঙ্গে এনো সমস্ত খরচ রাজা দেবেন।

মঙ্গলবার অর্থাৎ পর্শু রাত্রে বর্দ্ধমান থেকে বেরোব। সঙ্গে সুরুলের ডাক্তার এবং অমিয়র বদলে ধীরেন। অমিয় এখন পুরীতে বিদায় নিতে গেছে। কিন্তু সে আমার দেখাশোনা করতে পারবেনা— সেটা তার ধাতে নেই। আরিয়ামকে নিতে প্রবৃত্তি হোলো না। অন্য নানা কারণ ছাড়া একটা কারণ হচ্চে তার অগোছালো ধাতে আমার বিস্তর ক্ষতি হয়েচে আর সাহস হয় না। ধীরেনের বুদ্ধিও আছে পটুতাও আছে। যাই হোক সব ঠিক হয়ে গেছে।

পুপুমণির চিঠিতে একটা গল্পের ভূমিকা করেছিলুম এমন কি নায়কের এবং পাল্লারামের ছবিও এঁকেছি। ও যদি একটুও ঔৎসুক্য প্রকাশ করত তবে এতদিনে এ গল্প অনেকটা দূর এগোত।

তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছ। যতদিন পারো থেকো— বর্ষার আরম্ভেই

নেমে এসোনা। এখানে এ বছর বৃষ্টিবাদল হয়ে ঠাণ্ডাই চলেচে— গাছপালা মাঠঘাট এখনো সরস সবুজ।

কাপড়চোপড় গোছানোগাছানোর ধূম চলচে।

নুটুদের বিয়ে দেখতে দেখতে পুরোনো হয়ে গেছে— এখন গোরার বিয়েটা না হলে ভালো লাগচেনা। তারো ভূমিকা চলচে তোমরা নিশ্চয় উপসংহার ভাগ দেখতে পাবে।

জ্যৈষ্ঠমাসের সব কাগজেই দেখা গেল ফাল্গুন মাসের মুক্তধারা বেরিয়েচে— বর্ষার মুক্তধারাও এবার সেই ফাল্গুনেই দেখা দিয়েছিল তার পরে দীর্ঘকাল গেছে খরা। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বাবামশায়

৭০

[মে ১৯৩১]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, নীলরতন বাবুর মত এই যে টেম্পেরেচার আর একটুখানি স্বাভাবিক হওয়া পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং যাওয়া আমার পক্ষে ভালো হবে না। এখন ৯৭ থেকে ৯৯ এর নীচে পর্যান্ত ক্ষণকালের জন্যে ওঠা নামা করে। ক্রমে সহজ অবস্থায় আসচে। দার্জ্জিলিঙে বৃষ্টি বাদল দেখা দিয়েছে বলে আমার শরীরে ওটা স্বাস্থ্যকর হবে না। তার পরে যখন তোমরা খবর দিলে আমার জন্যে আলাদা বাড়ি ভাড়া করবে তখন থেকে আমার উৎসাহ চলে গেছে। তাহলে তোমাদের বাড়ি বোধ হয় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। অনিশ্চিত ফলের প্রতি প্রত্যাশা করে আমার জন্যে অনর্থক অর্থনাশ

করবে আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির দিনে এটা আমার সহ্য হবেনা। আজ কলকাতায় যাব জোড়াসাঁকোর ছাদের উপরে। ডাক্তার আছে, পথ্য আছে, পাখা আছে, পত্তুলাল আছে, ছাদে পায়চারি আছে— চলে যাবে।

গোরা অত্যন্ত চঞ্চল। কাল তার সম্ভবপরা বধূর ভাইয়ের আসবার কথা ছিল— স্টেশনে কেবলি ট্যাক্সি পাঠিয়েচে। গোবিন্দর প্রাণ বেরিয়ে গেল— সুবেদাকে ঘুমতে দিচ্চে না— সাতটার গাড়ি বৃথা চলে গেল— এগারোটার গাড়িতেও কারো দেখা নেই— গোবিন্দর বারান্দায় তক্তাপোষে শুয়ে রাত কাটিয়েচে। থেকে থেকে সকলকে হেঁকে হেঁকে বলচে, আমার মন নিরাসক্ত— আবার পরক্ষণেই পরামর্শ করচে ঘরে যে সাইডবোর্ড আছে তাতে কি কি আসবাব রাখা আবশ্যক। এদিকে আমরা ভাবচি সুদীর্ঘ দশ বৎসরের পরে হঠাৎ কী এমন দুর্নিবার কারণ ঘটতে পারে যাতে মেয়ের অভিভাবকদের আর সবুর সইচে না। ওদিকে গোরা তার বন্ধুদের কাছে জানাচ্চে যে যে মেয়ে একদা ক্ষণকালের জন্যে তার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করে এই দশ বৎসর কাল কঠোর কৌমার্যব্রত অবলম্বন করে বোলপুরের উদ্দেশে তাকিয়ে বসে আছে তাকে নিরাশ করা মহাপাপ। বন্ধুরা বলচে নিশ্চয় তোমার কপাল ভালো, নইলে কপালে অতবড়ো একটা আব ফুলে উঠল কেন? এদিকে রাণীর আত্মাভিমানে গুরুতর আঘাত লেগেচে— কারণ সে ছিল সাতবৎসর তপস্যায়, এ মেয়ের তপস্যা দশ বছরের, তা ছাড়া তার পূর্ণ দৃষ্টি নিবিষ্ট ছিল সুপরিচিত বরের মুখে, এর শূন্য দৃষ্টি অনিমেষ স্থাপিত অপরিচিত বরের অভিমুখে। প্রজাপতির দুই-পাখা এখন এইভাবে দ্বিধাকম্পিত— দেখা যাক ক্রমশ কি ঘটে ওঠে। এটা বোঝা যাচ্চে আশ্রমের হাওয়ায় একটা ছোঁয়াচ লেগেচে— এমন কি অক্ষয়ের জন্যেও মনে ভাবনাচিন্তা ধরেচে। যুদ্ধে যাকে casualty বলে তার সূত্রপাত হয়েচে। আজ এই পর্য্যন্ত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

বাবামশায়

৭১

[অক্টোবর ১৯৩১]

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার শরীর অসুস্থ হয়েছে শুনে উদ্বিগ্ন হয়েচি। খড়দহে গঙ্গার হাওয়ায় ভালো আছ কিনা লিখো। এখন বুঝতে পারচি, দার্জ্জিলিং গেলে তোমার পক্ষে ভালো হোতো না। এখানে কিছু দিন খুবই গরম গিয়েছে। সকালের দিকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দেয় তার পরে সমস্ত দিন এবং প্রথম রাত্রি গরম থাকে। ক্রমে ক্রমে হাওয়াটা শুকিয়ে গেলে শীতের সময় আসবে। দিনু কলকাতায় গেছে। বুবুকে নিয়ে আজ সুহৃদ যাবে। তোমার শুশ্রূষার জন্যে যদি দরকার বোধ করো তাহলে হৈমন্তীকে খড়দহে পাঠিয়ে দিতে পারি। তুমি ওখানে একলা থাক, সুবিধা হয় না বোধ হয়। আশ্রম শূন্য হয়ে গেছে— তবু অতিথি সমাগম কম হচ্চে না। ছুটি উপলক্ষ্যে নানা লোক আনাগোনা করচে— সুধাকান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। তোমাকে ওষুধের কথা কি আর বোলবো তুমি তো সব জানো। Kali Phos 3^{x} ঘন ঘন খেয়ে অমিয়া উপকার পেয়েচে। লাউয়ের রস খেয়ে দেখবেনা কি।

বাবামশায়

৭২

[অক্টোবর ? ১৯৩২]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, ডাক্তারি বইয়ে হাঁপানি রোগের অধ্যায়টা পড়ে দেখছিলুম। তার মধ্যে একটা কথা দেখলুম সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। লিখেচে

পোষা জন্তুজানোয়ারের সম্পর্ক পরিহার করা কর্ত্তব্য। শরীরের খাতিরে বোধ হয় তোমাকে বাঁদরের মায়া কাটাতে হবে। এ ছাড়া আরো অনেক আলোচনা আছে, typist থাকলে কপি করে তোমাকে পাঠাতুম। ওখানে গিয়ে বোধ হয় টেডি কুকুরের সঙ্গেও আবার তোমার পরিচয় আরম্ভ হয়েছে। এখানে বুড়ি এক কাঠবিড়ালি পুষেচে সে দিনরাত তার আঁচলের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্চে, মানুষের প্রতি কোনো ভয় নেই, বেশ মজা লাগে দেখতে।

এখানে এতদিনে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেচে। পাখা এখন আর চলে না। রোদ্দুরের রংটি কাঁচা সোনার মতো হয়ে এসেছে, হাওয়া দিচ্চে মৃদুমন্দ, শিউলি ফুলে ছেয়ে যাচ্চে গাছের তলা। সমস্ত আশ্রম শূন্য প্রায়। তবু বাইরে থেকে ছুটি-সম্ভোগীদের দলের আনাগোনা চলচে।

মহাত্মাজী পুপুকে যে পোষ্টকার্ড লিখেচেন সেটা এই সঙ্গে পাঠাচ্চি। সে ওখানে কেমন আছে। যথেষ্ট বেড়াবার জায়গা না পেয়ে বোধ হয় কিছু বিমর্ষ আছে।

আমি ছোট একটা গল্প লিখেছি— উপার্জ্জন করবার লোভে। শুনে নিশ্চয় যোগাযোগের কথা তোমার মনে পড়বে। অত বড়ো লেখায় হাত দেবার মত সাহস ও সময় নেই। চাকরি নিয়েচি, এবারে তারি দায় বহন করতে হবে। বক্তৃতা লেখা সুরু করতে আর দেরি করা চলবে না— কিন্তু ভালো লাগচে না— ছেলেবেলায় যেরকম ইস্কুল পালাবার জন্যে ছটফট করতুম সেই রকম ভাবটা মনে জাগচে।

আমার অ্যাসিস্টাণ্ট ডাক্তারের পসার বাড়চে। হাতে অনেকগুলি রুগী আছে— এখনো একটাও মরে নি।

তোমাদের শরীর ভালো আছে শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। বিজয়া দশমী ১৩৩৯

বাবামশায়

৭৩

[মার্চ ১৯৩৩]

ওঁ

SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA.
193 .

বৌমা,

নবীন ভালো রকম উৎরেচে শুনে খুসি হলুম। শাপমোচন সম্বন্ধে উদ্বেগ আছে। পড়বে কে? সাগর? তাহলে কি শাপের মোচন হবে, না সেটা আরো জড়িয়ে ধরবে। স্বর্গে তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই তো অভিশাপ, তোমরা মর্ত্ত্যে যদি সেই কীর্ত্তি কর তাহলে তো উদ্ধার নেই। একবার ভাবলুম সুরেনের দলে জুটে স্বয়ং ওখানে অবতীর্ণ হই। এখানে নানা কাজ আছে বলে হয়ে উঠ্‌ল না! দালিয়াটা ভালো লাগলনা। মায়ার খেলায় প্রথম দিন অনেক ত্রুটি ছিল দ্বিতীয় দিন নিখুঁৎ হয়েছিল— লোকের ভালো লেগেছে। তোমরা যেবার করেছিলে সেবারকার মতো অত ভালো হয় নি। আমি কলকাতায় এখনো নানা জালে জড়িয়ে আছি— ছাড়াতে পারচি নে। কথা আছে আগামী মঙ্গলবারে ফিরব— নিশ্চিত বলা কঠিন। আগামী রবিবারে রাণী প্রশান্তর বিবাহের সাম্বৎসরিক তিথি। একটু ধূম করে উৎসব করবে। অসিতের বাড়িতে আদর যত্ন পাচ্চ তো। আমার শান্তিনিকেতনে যেতে মন সরে না— যত্ন করবে কে? একটা সুবিধা হয়েছে রথী যে মশা তাড়াবার পাউডার করেছে সেটাতে সত্যিই মশা নিবারণ করে। বরানগরের সন্ধেবেলাতে মশার ভিড়ের মধ্যে পরীক্ষা করেছি একটা মশাও রক্ত পায় নি— গন্ধেই দেয় দৌড়। কাল রাণুরা এসেছিল তারাও আশ্চর্য্য হয়েছে। পুপুমণির খবর কি।

বাবামশায়

৭৪
[২৭? নভেম্বর ১৯৩৩]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমাকে বিষম উদ্বেগে ফেলে তুমি তো চলে গেলে, তার পরে এখানে এসে দিনরাত গোলমাল চল্‌চে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই। এ পর্য্যন্ত অভিনয় থেকে ১৪০০০ টাকা পাওয়া গেছে। আরো কিছু পাব। তার পরে ভিক্ষের আয়োজনও চলচে— কিশোরী আর কালীমোহন এই নিয়ে আছে।

প্রথমে শাপমোচন দিয়ে আরম্ভ করা গেল। খুবই জমেছিল, এখানকার কাগজে যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে আমাদের দেশে কোনোদিন তেমন ঘটে নি। তার পর তৃতীয়দিন তাসের দেশ। থার্ম্মোমিটর একেবারে সাব্ নর্ম্মাল। দমে গেল মন। সকালে উঠেই নতুন নাচ গান ঢুকিয়ে তাসের দেশকে সম্পূর্ণ নতুন করে তোলা গেল। আশ্চর্য্য এই যে আয়ত্ত করতে মেয়েদের কিছুমাত্র বিলম্ব হোলো না। "সঙ্কোচের বিহ্বলতা" গানটাতে যে নাচ ওরা লাগিয়েচে সেটা নতুন ধরণের— সেটাতে খুব encore পেয়েচে— বুড়ী আশ্চর্য্য করে দিয়েচে সবাইকে। আবার কাল হবে শাপমোচন। কিন্তু নতুন তাসের দেশটা শাপমোচনের চেয়ে ভালো হয়েছে। তাতে রোমান্স্ এবং রিয়ালিজম্ পাশাপাশি থাকাতে আশ্চর্য্যরকম জমেচে।

পুপুর সঙ্গে তার বাপ ও দিদিদের দেখাশোনা হওয়াতে ওর ধাক্কাটা একেবারে কেটে গেছে— ভালো হোলো। পুপুর বড়ো বোন (তারা বাই নয়) অসাধারণ সুন্দর দেখতে।

আমেদাবাদ পরিত্যাগ করলুম। সবাই বারণ করলে। শ্রীমতী দেখা করতেও আসে নি। শুন্‌চি তার নালিশ এই যে আমরা তাকে ডাকি নি।

আমাদের কাছ থেকে তার যা প্রয়োজন তা সিদ্ধ হয়েচে এখন ভদ্রতারও দরকার নেই।

আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে ওরা দূরে— সেইজন্যে আমার মনটা চিন্তিত আছে। উপায় নেই। অনেক বাজে লোক আমাদের দলের ভার বৃদ্ধি করেছে, খরচও বাড়িয়েচে। ঠিকমতো বাছাই হয় নি। বীরেশ্বর কেন এল? আলু সকলের চেয়ে বেশি কাজের— সমস্ত পথ ও বোধ হয় রাত্তিরেও ঘুমোয় নি।

বৌমা এবার মাঘ মাসে বোটে শিলাইদহে যাবার ব্যবস্থা নিশ্চয় কোরো। তোমার শরীরের জন্যে অত্যন্ত চিন্তিত আছি।

বাবামশায়

৭৫

১০ অগস্ট ১৯৩৪

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমি চলে আসার পর তোমাদের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে আর এখানকার আকাশে নেমেছে ঘোরতর বাদল। এখানে এত বৃষ্টি সারাবৎসরের মধ্যে হয় নি। চাষীদের ক্ষেত শুকিয়ে এসেছিল ক'দিনের মধ্যে বেঁচে উঠেছে ওদের মরা ফসল। সত্যি কথা যদি বলতে হয় এখানে ভালই লাগচে। কালিম্পঙের মহিমা স্বীকার করব কিন্তু এখানকার মাধুর্যের সম্বন্ধে পুপুদিদির সঙ্গে আমার মতের মিল অনুভব করচি।

ছাত্রীর দল আসচে, তুমি নেই, কার হাতে তাদের সমর্পণ করা যায়। বুড়ি মেয়েদের স্বভাব জানে সেই জন্যে মেয়েদের দায়িত্ব নিতে নারাজ।

সুরেন ভীতু মানুষ, যতটা সম্ভব দূরে থাকতে চায়।

হায়দ্রাবাদ থেকে প্রতিমা এসেছে, আছে তোমার তেতালার কুঠরিতে। আমি আছি চুপচাপ, আহারের নিয়ম পূর্ব্ববৎ। কবিতার কাপি? ইতি

বাবামশাই

৭৬

৩১ অক্টোবর ১৯৩৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার জন্যে আমার মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। তোমার কাছ থেকে বা শান্তিনিকেতন থেকে তোমার কোনো খবর পাইনে। আজ পর্য্যন্ত পুরীতে আছ কিনা বা পুরীতে কোথায় আছ তার কিছুই জানতে পারলুম না। অমিয়র মার কেয়ারে এই চিঠি পাঠাচ্ছি আশা করি পাবে।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিষটা এবার সবসুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েচে। কিন্তু এখানকার লোকের মন অসাড়। যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েচি বল্‌লে অত্যুক্তি হবে।

এখানে এসে অবধি ঘোরতর বাদলা বৃষ্টি চলছিল। কাল থেকে আকাশ পরিষ্কার। সেই কারণেই কাল খুব ভিড় হয়েছিল— অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। দুঃখ এই যে লোক ৬/৭ শর বেশি ধরেই না। সেটাকে সৌভাগ্যও বলা যেতে পারে। যদি দর্শকদের জায়গা বেশি বড়ো হোতো, তাহলে দর্শকদের অভাব অত্যন্ত কটুভাবে চোখে পড়ত।

৪ঠা পৌঁছব ওয়াল্‌টেয়রে। আমি থাকব বিজয়নগ্রম্ মহারাণীর নিজ আতিথ্যে। মেয়েরা থাকবে বব্‌লির বাড়িতে। ছেলেরা কোথায় থাকবে জানিনে। ওখানে আমাদের কাজ শেষ হবে ৬ই।

তার পরে দুই একদিনের জন্যে তোমাকে দেখে যাবার জন্যে মনটা উৎসুক আছে। কিন্তু আমাকে নিয়ে পাছে ব্যস্ত হয়ে পড়ো বা স্থানাভাব থাকে সেই ভয়ে মন স্থির করতে পারচিনে। কেবল তোমাকে দেখেই চলে যেতে চাই। ওয়াল্‌টেয়রে যদি তোমার চিঠি পাই তাহলে যাহয় স্থির করব। পুপু মাঝে একটু অজীর্ণে ভুগেছিলো— পথ্যের ব্যবস্থা করে সেরে গেছে।

আশার শিশুকে দেখলুম। সময়ের পূর্ব্বে জন্মেছে বলে খুব ছোট্ট হয়েচে। ওরা এই আড়িয়ারেই একটা বাসা নিয়েচে। তুমি কেমন আছ ওয়াল্‌টেয়রে গিয়ে যেন তার খবর পাই। ইতি

বাবামশায়

৭৭

২৮ মার্চ ১৯৩৫

ওঁ

বৌমা

তোমাদের পথকষ্টের পালা শেষ হয়ে গেছে। অন্তত রেলপথের। ধূলো এবং গরম প্রচুর পরিমাণেই পাবে এই মনে করে উদ্বিগ্ন ছিলুম। যা হোক সে সমস্ত চুকিয়ে জাহাজে চড়ে বসেছ কল্পনা করে নিশ্চিন্ত বোধ করচি। জানি সমুদ্র এখন শান্ত, ধীরেন আছে, তোমাদের যথেষ্ট যত্ন নেবে।— রথীর চিঠিতে জাপানে আমাদের পালাগানের প্রস্তাব শুনেচ। এ সম্বন্ধে তুমি কী চিন্তা করচ জানিয়ো। এ পালা তোমারি স্বকৃত, এখনো তোমারি অঞ্চলে বাঁধা। বিদেশে ওকে একলা রওনা করে দিলে আমরা ওকে সামলাতে পারবনা। জানিয়ে রেখে দিলুম। ভারতে অগষ্ট মাস থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কষ্টকর সময়। সেই সময়টা জাপানে

তোমাদের ভালোই লাগবে। সিংহলের বন্ধুরা যেমন সমস্ত দ্বীপ তোমাদের ঘুরিয়েছিল এরাও তাই করবে— এমন সকল দেশে নিয়ে যাবে যেখানে ভ্রমণ আধুনিক বঙ্গনারীদেরও আয়ত্তের অতীত। তা ছাড়া জাপানে তোমার দেখবার জিনিয বিস্তর আছে— এমন সমাদরে সহজে বিনাব্যয়ে সেখানকার দর্শনীয় দেখে বেড়ানো তোমাদের ভাগ্যে কখনো ঘটবেনা।— সে কথা যাক্। যাদের হাতে তুমি আমাকে সমর্পণ করে দিয়ে গেছ— তাদের মধ্যে সেক্রেটারি ধরা ছোঁওয়ার অতীত। সকালে ডাকের চিঠি আসে, প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। যে বয়সে পরের প্রতি নির্ভর অনিবার্য্য সে বয়সকে ধিক্। গাঙ্গুলি আছেন সদাসর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর শ্রুতিগোচর। কোথাও কিছু ত্রুটি হবার জো নেই। আহারের সময় পুপে এসে প্রায়ই দুঃখ জানিয়ে যায় যে আমি অত্যন্ত কম খাই। সুনন্দা পাখা হাতে মাছি তাড়ায়।

তোমার সেই বৈঠকখানা ঘরে বড়ো লেখবার টেবিল আনিয়ে লেখা পড়া করি। ছবি আঁকবার আসবাবেও ছোট ঘর ভরে উঠেছে— এখনো আঁকা আরম্ভ করি নি। সম্মুখে তোমার বাগানের দিকে চেয়ে দেখি, গাছপালা সব প্রসন্ন।

আজ থেকে অনিলের আসবাব সরিয়ে আনবার কাজ আরম্ভ হবে। গাঙ্গুলি ভার নিয়েছে। তার পরে সেই কুটীরটা আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগব। আমার মেটে কোঠার ছাদ আরম্ভ হয়েছে। নন্দলালরা রোজ একবার করে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে যান। জিনিষটা যথেষ্ট সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠবে এখন থেকে তার নিদর্শন পাচ্চি।

আন্দ্রেকে বোলো, কল্পনা করচি তোমরা তার ভালোবাসা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করচো— দূর থেকে আমি কেবল ঈর্ষা করে মরচি। কোনোদিন আমার অদৃষ্টেও যে এই সৌভাগ্য ঘটবে সে আশা করি নে— সময় পেরিয়ে গেছে। ইতি

বাবামশায়

আন্দ্রে দম্পতিকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ ও ভালোবাসা জানাবে। রঙীন কালী?

৭৮

১৪ এপ্রিল ১৯৩৫

ওঁ

VISVA-BHARATI
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা আজ পয়লা বৈশাখে মন্দিরের কাজ শেষ করে এসেই তোমাদের চিঠি পাওয়া গেল। চিঠি না এসে তোমরা এলেই খুসি হতুম। সমুদ্রের হাওয়াতে তোমরা উপকার পেয়েছ খবর পেয়ে মনটা খুসি হোলো। আমার মনে হয় কিছু দিন ওদেশে থেকে তুমি যদি ভালো করে সেরে আসতে পারো তাহলে ভালো হয়। এখানকার ভাদ্র আশ্বিন কাটিয়ে যদি অক্টোবরের মাঝামাঝি এসো তাহলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। রথীরও তাই করা উচিত। কিন্তু কাজ কামাই করে রথী অতদিন থাকতে পারবেনা। কিন্তু মুষ্কিলের কথা আছে যদি জাপানে যাওয়া হয়। তুমি না থাকলে দলবল নিয়ে কী ফল হবে। আর যাই হোক জাপানটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ নয়— কিন্তু সেপ্টেম্বরে সেখানে আমাদের কাজ আরম্ভ হবার কথা। তার মানে অগষ্টমাসে যাত্রা। মন্‌সুনের সমুদ্রে বেরতে হবে। অবশ্য ওদিকে মন্‌সুনের প্রভাব প্রবল নয়। যাই হোক কথাটা নানাদিক থেকে ভেবে দেখবার বিষয়। এদিকে আমার মাটির ঘর (শ্যামলী) প্রায় সম্পূর্ণ হোলো। জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারব এমন আশা পাওয়া যাচ্চে। কিন্তু তোমরা থাকবে না আমি নতুন বাসায় যাব এটা ভালো লাগচেনা। উপায় নেই।—আজ পর্য্যন্ত গরম বেশি পড়ে নি। দুপুরে শুকনো গরম হাওয়া দেয় কিন্তু রাত্রির

মাঝি থেকে রীতিমতো ঠাণ্ডা। এবারে হয়তো কোথাও যেতে হবেনা। যাদ দুঃসহ হয় তাহলে মৈত্রেয়ীর আশ্রয় নেব, সে খুব অনুনয় করচে। রাণীরা হয় তো সিমলের নীচের পাহাড় ধরমপুরে যাবে— প্রশান্ত আমাকে যেতে বল্‌চে— কিন্তু অতদূরে গরমের সময় রেলে করে যাবার সখ আমার নেই। খুব সম্ভব আমার শামলীতেই চরম গতি। ওটাকে গোছাতে গাছাতে সময় লাগবে তো।—উদয়নে আছি— তোমার boudoirএ আমার শোবার ঘর— তার পাশের বড় ঘরটাতে লেখার টেবিল পড়েছে সেইখানে বসি [বসে] লিখচি। গাঙ্গুলি খুব খবরদারি করচে। শরীর মোটের উপর ভালোই। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৪২

বাবামশায়

৭৯

[২৪ ? মে ১৯৩৫]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বেছে বেছে এই বছর তোমরা বিলেতে গেছো যেহেতু তোমাদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। দীর্ঘকাল বৃষ্টি নেই, বাতাস শুকনো, গরম ক্রমেই চড়ে যাচ্চে— থেকে থেকে ঝড় আসচে, ধূলো উড়চে, মেঘও করে পূর্ব্বে পশ্চিমে, বৃষ্টি হয় না, বাড়ির চাল উড়ে যায়, গাছ পড়ে যায় রাস্তায়। আমি চিরদিন গরমকে উপেক্ষা করে এসেছি, এবার আমার অহঙ্কার টিঁকল না— কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল প্রাণপুরুষ, অনেক চিন্তা করে করে শেষকালে আশ্রয় নিয়েছি বোটে। প্রবীণ লোকেরা নানাপ্রকার ভয় দেখিয়েছিল, মানি নি। উতরপাড়ায় বোট বাঁধা ছিল, সেখান থেকে প্রথমে গেলুম শ্রীরামপুরে, কুণ্ডদের বাড়ির ঘাটে, সেখানটা বাসের অযোগ্য। অবশেষে এসেছি ফরাসডাঙায়। প্রথম দিন ছিলুম স্ট্র্যাণ্ড রোডের

সামনে, সেখানে দলে দলে লোক সমাগম হতে লাগল। সেখান থেকে বোট হটিয়ে নিয়ে এখন যেখানে আছি ঠিক এর সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি। সে বাড়িটা অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়। তার পাশেই একটা একতলা বাড়ি আছে, সেখানে আপাতত আছেন মিসেস মিত্র— তোমরা তাঁকে এবার দেখেছ শান্তিনিকেতনে— বুড়ি তাঁকে জানে কোন্ একজনের রাঙাকাকী বলে। তিনি আর দিনকয়েক পরে চলে যাবেন তখন ঐ বাড়িটা ভাড়া নেব— জুন মাসটা ওটা হাতে রাখতে চাই— ভাড়া ৬০ টাকা। তোমাদের মামা বোধ হয় তাতে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না। বোটে ভালোই লাগচে— জলের উপর দিয়ে হাওয়া আসে অনেকটা তাপ বর্জ্জন ক'রে। এ পর্য্যন্ত লোকজনের উৎপাতও প্রবল হয় নি। তেলেনি পাড়ার বাঁড়ুজ্জে জমিদার আমাকে একটা পাথরের টেবিল ধার দিয়েছেন সেইটে অবলম্বন করে তোমাকে চিঠি লিখচি। এ বোটে শোওয়া বসা খাওয়া নাওয়ার সকলরকম ব্যবস্থাই আছে, কেবল লেখবার প্রয়োজনকে একান্তই উপেক্ষা করা হয়েছিল— যে টেবিলটা বসবার ঘরের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে বিরাজমান, সরস্বতীর চরণকমল পেরিয়ে গিয়ে আরো অনেক নীচে তার পৃষ্ঠদেশ, কলমচালনার পক্ষে একটুও সুবিধাজনক নয়।— সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর হচ্চে এই, চার অধ্যায়কে নিয়ে সৌম্য ঠাকুর অত্যন্ত গম্ভীর গলায় প্রতিকূল সমালোচনা করেচেন, সুভো ঠাকুর লিখেচেন যে স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ নামক এক ব্যক্তির লেখা থেকে ওটা আমি চুরি করেছি, বাইরে লোকেরা কেউ খুব ভালো বল্‌চে কেউ খুব মন্দ। মাঝের থেকে বইটা বিক্রি হচ্চে দ্রুত বেগে। জীবনে সত্য মিথ্যে অনেক নিন্দে শুনেছি কিন্তু পরের লেখা আমাকে চুরি করতে হয় আত্মীয় ছাড়া এমন খবর অতি বড়ো নিন্দুকের কলম দিয়েও বেরোয় নি।

বাবামশায়

৮০

২২ অক্টোবর ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার কাছে নালিশ করবার মতো কিছু খুঁজে পাচ্চি নে। নালিশ করবার বিষয় অত্যন্ত কমে গিয়েছে। ভোরে তিনটের সময় উঠে স্নান করি, মাথায় গায়ে শর্ষে বাঁটা মেখে। আলো যখন হয় চায়ের সরঞ্জাম আসে— মস্ত এক ডালা মাখন খাই চিনি সহযোগে— চিনে চায়ের সঙ্গে থাকে দু তোস রুটি— টেবিলে যোগ দেয় সুধাকান্ত এবং সেক্রেটারি— তাঁদের জন্যে রুটি ছাড়া থাকে সুনন্দা কোম্পানীর রচিত মিষ্টান্ন— সেটাতে আমার অতিথিদের যথেষ্ট উৎসাহ দেখতে পাইনে, —নিশ্চয় সকালে তাঁদের যথেষ্ট ক্ষিদে থাকেনা। বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার মাধ্য ভোজন— একেবারে বিশুদ্ধ হবিষ্যান্ন— আতপ চালের সফেন ভাত, আলুসিদ্ধ, কচুসিদ্ধ, কোনো কোনো দিন অতি সভয়ে খেয়ে থাকি তোমারই বাগানে উৎপন্ন ওল সিদ্ধ। সঙ্গে থাকে এক পাইন্ট ঘোল। তিনটের সময় বাগানের আতা এবং আঙুরের রস। ৬টার সময় ভুষিসমেত আটার দুই খণ্ড রুটি, সিদ্ধ আলু ভাজা সংযোগে, এক পেয়ালা দুধে কিঞ্চিৎ ফলের রস মিশিয়ে। এর অতিরিক্ত যা কিছু আসে সে আসে ঠাকুরের নৈবেদ্যরূপে, ঠাকুরের প্রসাদরূপে সে যায় অন্যের ভোগে।

কার্ত্তিকমাসের আরম্ভ থেকে ক্রমশই ঠাণ্ডা পড়চে, কাল পরশু মেঘ করেছিল, বৃষ্টি ফাঁকি দিয়েই অন্তর্ধান করেছে— আজ স্নিগ্ধ হাওয়া দিচ্চে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা চারদিকেই, কিন্তু গরমের প্রতাপ আর টেঁকে না। লুঙি জামার উপর একখানা ঢিলে কাপড় চড়িয়েছি।

তুমি কবে এসে আমাদের ভার গ্রহণ করবে সেজন্যে তাকিয়ে আছি। ইতি

বাবামশায়

৮১

[২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫]

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা পূপের পোষ্টকার্ডে সংক্ষেপে তোমাদের ভ্রমণের ইতিহাস পাওয়া গেছে। আর যাই হোক শান্তিনিকেতনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না। গাড়িতে তোমাদের একটা গয়নাও গেলনা, তোমার আয়ার নাক ভেঙে যায় নি— ভালো করে গল্প জমে উঠল না। আমাদের এখানে বরানগরের ইতিবৃত্ত ছাড়িয়ে গেছে— এখন চলচে পুলিসের আনাগোনা— বাসুদেব লালধারী, গোরুগুলো বাদে তাদের আত্মীয়স্বজন সব এখন থানায়। ছুটির আরম্ভ ভাগ সরগরম হয়ে উঠচে— সকলের চেয়ে হাঁকডাক করে বেড়াচ্চে সুধাকান্ত— সকালবেলায় যখন চা খেতে আসে তার মুখে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শুন্‌তে পাই— খুসিতে আছে।

মাঝে ইচ্ছা হয়েছিল জাহাজে চড়ে বক্সারঘাট পর্য্যন্ত গঙ্গা উজিয়ে যাই। কল্পনা করতে খুব ভালো লাগে কিন্তু সাহসে কুলোলো না। জাহাজে একবার চড়ে বসলে ভাবনা নেই কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিকাটা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই এক পা বাড়িয়ে দিয়ে আবার সেটা ফিরিয়ে নিয়েছি। শ্যামলী থেকে কোণার্কের কোণ পর্য্যন্ত আমার ভ্রমণের সীমা— ইহজীবনে তার বেশি আর অগ্রসর হতে পারবনা— ইতিপূর্ব্বে যা পরিক্রমণ হয়ে গেছে মনে মনে তারি জাওর কেটে বাকি দিন কটা অতিবাহিত করব। —আজকাল ছুটিতে এখানে আর সব শান্ত গাঙ্গুলির কণ্ঠস্বর ছাড়া। মাঝে মাঝে দর্শনার্থীর দল ভিড় করে, তখন আবার গঙ্গাবক্ষে ভেসে পড়বার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। ওড়বার জন্যে ডানা ঝাপটাতে গিয়ে দেখি ডানা

ভাঙা। তোমার অবর্ত্তমানে মাখনের মাত্রা কমে গেছে কিন্তু রোজ আধগ্লাস ঘোল পেয়ে তোমাকে স্মরণ করি। ইতি লক্ষ্মীপূর্ণিমা ১৩৪২

বাবামশায়

৮২

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ, পালিয়ে এলুম।

এখানে শরতের চেহারা ফুটে উঠেছে— হাওয়ায় একটুখানি হিমের ছোঁওয়া দিয়েছে, রোদ্দুর কাঁচা সোনার রঙের— গাছপালা চারদিকে ঝিলমিল করচে।

নতুন বাড়িতে মিস্ত্রির আক্রমণ। অবশেষে উদয়নে আশ্রয় নিতে হোলো— হয়তো আরো দিন পনেরো এইখানেই স্থিতি। বৃহৎ পুরী শূন্য। এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন প্রতি সন্ধ্যাবেলা তোমার সূর্য্যাস্ত প্রাঙ্গণ নূপুরে মুখরিত ছিল এখন "নীরব রবাববীণা মুরজ মুরলী" কেবল মনে হচ্চে দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, ভুল করেছি। আমার নৃত্যসাধনা গীতচ্ছন্দে উর্ব্বশীদের মহলে কোনোদিন আসন পাব না। অতএব এখন থেকে তাঁদের সেলাম জানিয়ে বিদায় নিচ্চি। যে গানের আসর আমার আয়ত্তের মধ্যে, আন্দাজ করচি সেখানে রসের অভাব ঘটে নি। সেইটুকুতে কিছু পরিমাণ খুসি করতে পেরেছিলেম। এইবার ছুটি। তোমার শরীরের

জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকে। আমার বিশ্বাস, এখন ক্রমে শীতের হাওয়া পড়বে এই সময়ে অন্তত মাসখানেক বোটে করে চরে যদি থাকতে পারো তাহলে সুস্থ হতে পারবে।

আমি কিছুদিন পতিসরের বোটে পদ্মায় ভাসব স্থির করেছি— সে বোটটা আমার ভালো লাগে। ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৪৩

বাবামশায়

৮৩

১৫ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা তুমি পুরী যাচ্চ ভালোই হয়েছে। সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থেকে শরীরটা ভালো করে সেরে এসো।

আমি এখানে ভালোই আছি। বোধ হচ্চে অনতিবিলম্বে শীত পড়বে।

চিত্রাঙ্গদার রিহর্সল চলচে। এর নাচের অংশ সম্বন্ধে বিচার করা আমার পক্ষে শক্ত। শান্তি আছে সে একরকম ঠিক করে নেবে।

বুড়ি এখনো কলকাতায় আছে। ডাক্তার দেখাতে হবে বলে আটকা পড়ে গেছে। কী হোলো তার বুঝতে পারচি নে।

স্টেট্‌সম্যানে পরিশোধের যে বড়ো সমালোচনা করেছে সেটা পড়ে মন কতকটা আশ্বস্ত হোলো। সমস্ত খুঁটিনাটি সাধারণে দেখতে পায় না, মোটের উপর ভালো লাগলেই হোলো।

এখানে সবাই পরিশোধ দেখতে চাচ্ছিল। বুড়ি ছুটির আগে এসে পৌঁছল না অতএব ওটা স্থগিত রইল। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৯৩৬

বাবামশায়

৮৪

[১৭? অক্টোবর ১৯৩৬]

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

ঙ

বৌমা বুড়ির শরীরের খবর হয় তো পেয়েছ। তোমাদের কারোই স্বাস্থ্য ভালো নয়, আমাকে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন করে রাখে। পুরীতে গিয়ে ভালো থাকবে এই কামনা করি।

চিত্রাঙ্গদার দলের বম্বে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল— এখন আমার সম্পূর্ণ ছুটি। তোমার বিশাল পুরীতে কোথাও আর নূপুরের ধ্বনি নেই।

পুপুকে তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলেই ভালো করতে। ওর ব্যবহারটা ক্রমেই অসহ্যের দিকে যাচ্চে। ছেলেবেলায় ওর বন্ধু ছিল ঝগড়ু, এখন হয়েচে গাঙ্গুলি। এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে ওকে বাঁচাবার জন্যে যেমন করে হোক্ ওকে বোর্ডিঙে পাঠানো উচিত। নইলে ওকে কষ্ট পেতে হবে। ওর সমানবয়সী মেয়েদের সংসর্গই ওর পক্ষে অত্যন্ত দরকার।

বাবামশায়

৮৫

[২৬ অক্টোবর ১৯৩৬]

VISVA-BHARATI
SANTINIKETAN, BENGAL.

ওঁ

বৌমা পুরীতে গিয়ে তোমার শরীর ভালো আছে শুনে খুসি হলুম। আমিও হাওয়া বদল করবার জন্যে কাল পরশুর মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। আমি যাচ্চি বাস্-এ চড়ে লেনর্ড্ রোড বেয়ে সুরুলে শ্রীনিকেতনের তেতালার ঘরে। সেখানে চারিদিকে পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে সবুজ রঙের সমুদ্র। পুরীর সমুদ্রের চেয়ে কম নয়। সেই তেতালার বাসা এককালে আমারি ছিল। জীবনে কতবার কত বাসাই বদল করেছি। নতুন বাড়িতে এখনো মিস্ত্রির উৎপাত লেগেই আছে, ধূলো উড়চে, দুমদাম শব্দ চলচে।

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। কাল আশ্রমের লোকেরা প্রণাম করতে এসেছিল। ১২০ জনকে জলযোগ করিয়েছি— অবশেষে তিন জনের খাবার কম পড়েছিল।

রথীরা এসেছে— মীরা এসেছে। বুড়ি ভালোই আছে।— বাতাসে ঈষৎ ঠাণ্ডার আভাস দিয়েছে। মিস্ বস্‌নেক্ থাকেন রাণীর বাড়িতে— দুচারটি ছাত্রী এখনো আছে আশ্রমে। ফরাসী যুবকেরা আছে প্রান্তিকে। ইতি একাদশী ১৩৪৩

বাবামশায়

ওঁ

বৌমা কাল তোমাকে চিঠি
লিখেছি হেনকালে আর তোমার
চিঠি পেয়ে সবটা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়েছি।
আমার সাম্প্রতিক খবর হচ্ছে, সুরুলের
বাড়িতে তেতলার ঘরে বসেছি। ভালো
লাগচে — আকাশ খুব কাছে এসেছে,
আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজন
সর্বদাই ঘাড়ের উপর এসে পড়চে না।
কাল থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন,
টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়চে। বোধ হয়
এমনি দুই দিন [illegible]
[illegible] — বিদায় হলে বাঁচি।
এখানে এসে চিঠি লিখেছি মাঝে
মাঝে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] দিয়েছি। ইতি
২৭।১০।৩৩ বাবামশায়

প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের পাণ্ডুলিপি চিত্র।

৮৬

২৭ অক্টোবর ১৯৩৬

ওঁ

বৌমা

কাল তোমাকে চিঠি লিখেছি হেনকালে আজ তোমার চিঠি পেয়ে মনটা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়েছে। আমার সাম্প্রতিক খবর হচ্চে, সুরুলের বাড়িতে তেতলায় চড়ে বসেচি। ভালো লাগচে— আকাশ খুব কাছে এসেছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজন সর্বদা ঘাড়ের উপর এসে পড়চে না।

কাল থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়চে। বাদলা এমনি গট হয়ে বসেচে যে নড়বার মতো কোনো তাড়া নেই— বিদায় হলে বাঁচি।

এখানে এসে স্থির করেছি মাঝে মাঝে আকাশের সঙ্গে মিতালি করবার জন্যে শ্রীনিকেতনের প্রাসাদশিখরে আশ্রয় নেব। এরা একটা ভদ্র রকমের সিঁড়ি গেঁথে দেবে কথা দিয়েছে। ইতি

বাবামশায়

৮৭

[২৮ জুলাই ১৯৩৭]

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু বৌমা

কোথায় এসেছি বুঝতে পারচিনে। কাল সকালে পৌঁচেছি আত্রাই স্টেশনে। ম্যানেজার ছিলেন, আর ছিল দুটো ডিঙি আর আমার বোট। তোমার মাতুল সেই মুহূর্ত্তে পাল্কী চড়ে মাতুলানীর অভিসারে রওনা হলেন। ভাবলেম আগে থাকতে গিয়ে আমার জন্যে যথোচিত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবেন। রাত নটার সময় শূন্য নির্জ্জন নিরালোকিত ঘাটে বোট এল। আমি তখন একলা বসে হাত পা চালনা করচি। খবর দিলে এইটেই পতিসরের ঘাট— জানতেই পারি নি। মাতুল ক্ষণকালের জন্যে এসে তিরোহিত। বেচারা সুধাকান্ত ভাবলে সেখানে গেলে আহার আরামের সুবিধা হবে। কী দুর্ঘটনা হোলো তার কাছেই শুনতে পাবে। সুখের কথা এই যে মশা নেই, দুর্যোগ নেই, বিশেষ গরম নেই। তাই রাত কাটল ভালোই। সকালে বনমালীকে ডেকে কিঞ্চিৎ চা খেয়ে নিয়েছি। আটটা বেজে গেছে লোকজন কেউ কোথাও নেই। ভাগ্যে আছে কালু আছে বনমালী এবং দুঃখরাত্রির অবসানে এসে পৌঁচেছে সুধোড়িয়া তাই বুঝতে পারচি এটা চন্দ্রলোক নয়, এখানে প্রাণীর চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যায়। "পুনশ্চ" থেকে উদয়নে যাত্রা করলেও যেটুকু চাঞ্চল্য অনুভব করি এখানকার হাওয়ায় তাও নেই। এখানকার খবর এই পর্য্যন্ত। ক্রমশ আরো কিছু খবর জমবে কি না জানিনে। আজ শুনতে পাই পুণ্যাহ, যদি সত্য হয় তাহলে আজ বোধ হয় ছুটি পাব না। কাল বৃহস্পতিবারে উল্টোরথে হতভাগ্য জগন্নাথ

স্বভবনে যাত্রা করবেন। শুক্রবারের গাড়ি ধরে শনিবারে কলকাতায় পৌঁছব। তার পরে স্বস্থানে। বর্ষামঙ্গলের আয়োজন আশা করি এগোচ্চে। সরাইখেলের নাচ আমরা চাইলেই নিজের খরচে পাঠিয়ে দেবে এমন সংবাদ পেয়েছি। সে চেষ্টা করতে দোষ কী। জিনিযটা মোটের উপর দর্শনীয়।

শুনচি প্রজারা বৃহস্পতিবারে দেখা করতে নারাজ। শুক্রবারে ধরে রাখবে, তাহলে রবিবারের পূর্ব্বে যাওয়া ঘটবে না।

বাবামশায়

৮৮

[অগস্ট ১৯৩৭]

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, বর্ষামঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে শৈলজাকে যদি টানতে পার তাহলে কাজটা ভালো হবে। শান্তিকে বাদ দিলে অশান্তি ঘটবে। দুটো মিলিয়ে দিলে দুর্ঘটনা ঘটবে না। গোটা পাঁচ ছয় নাচ এবং সেই নাচের গানের ভার শান্তিকে দিলে ভাগটা সমান থাকবে। সঙ্গীত বিভাগের এই কাজটা তোমার, দায়িত্ব তোমারই। গান, নাচ এবং যন্ত্রসঙ্গীতের প্রোগ্যাম [প্রোগ্র্যাম] তোমাকেই তৈরি করতে হবে। ডিগ্রি নেওয়ার দুষ্কর কর্তব্য আমিই সেরেছি— সঙ্গীত বিভাগের দুঃসাধ্য কাজ তোমারই পরে নির্ভর করচে। তিন পক্ষকে তোমার সামনে একত্রে বসিয়ে কর্মসূচি যদি বানিয়ে তোলো তাহলে জিনিষটা মানানসই হতে পারবে।

বাবামশায়

৮৯

৫ মার্চ ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা

আর চলল না, কাজের ক্ষতি হচ্চে। ভেবেছিলুম দলের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করব কিন্তু তাদের দিনক্ষণ কেবলি পিছতে থাকল। মহাভারত লেখার ভার স্বীকার করে নিয়েছি— অবিলম্বে শুরু করতে হবে। ৭ই তারিখে অর্থাৎ পর্শু সোমবারে শুভক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন জোড়াসাঁকোয় তোমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করে যাব বেলঘরিয়ায়। সুধোড়িয়াকে বোলো যথাসময়ে হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত থেকে যথোচিত নিয়মে আমার অভ্যর্থনা করে।

সেদিন গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে চণ্ডালিকার অভিনয় দেখে বোঝা গেল ওর নাটকীয় নিবিড়তা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বাহুল্য নাচ গান বর্জন করা দরকার বোধ হোলো। সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে যতই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধাজনক। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।

আজ গরমের প্রচণ্ডতা দেখে একটা আসন্ন ঝড়ের প্রবলতার আশঙ্কা করচি। এই ঋতু পরিবর্তনের মুখে পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ের সম্ভাবনা চিন্তার বিষয়।

মেয়েগুলোকে পথের মধ্যে রওনা করে দিয়ে মন আমার কিছুতে সুস্থির থাকবে না। উত্তর পশ্চিম কোণে আজ মেঘের ষড়যন্ত্র দেখা যাচ্চে। হঠাৎ হয়তো দিনাবসানে আকাশে কাল বৈশাখীর প্রথম রিহর্সল বসবে।

তোমার শরীরের খবর ভালো বলেই শুনতে পাই। আমি যাতে ছায়ার ছায়া না মাড়াই বিবি তাই নিয়ে দোহাই পাড়চে। আমার দেহ বিকার

সম্বন্ধে লোকেরা একটা অপরাধী খাড়া করেছে, তাকে অস্পৃশ্য করে তুলে অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছে। ইতি

বাবামশায়

৯০

৭ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, এখানে বসন্ত উৎসবের জন্যে ধরেছে সবাই। সেটা হবার কথা ১৬ই তারিখে। সুতরাং এখন কলকাতায় গিয়ে আবার ফিরে আসার দুঃখ বাঁচাতে চাই। এইজন্যেই, বারে বারে যাতে জন্মের গোলকধাঁদায় আনাগোনা না করতে হয় আমাদের দেশের ভবভয়ভীরুরা শান্ত হয়ে বসে তার সাধনা করে থাকে। আমিও আপাতত শান্ত হয়ে রইলুম। বিশেষত সোনা গেল খুলনা থেকে ফিরতি যাত্রীদের সঙ্গে তুমিও এখানে দিন তিনেক কাটিয়ে যাবার সংকল্প করেছ। তাহলে তোমার সঙ্গে চণ্ডালিকা অভিনয়ের পরামর্শ করবার যথোচিত অবকাশ পাওয়া যাবে। সেই সময়ে কলকাতা সহরে বা তার নিকটবর্ত্তী কোনো জায়গায় আমার অবস্থিতি লোকের কাছে এত শঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে যে তাদের মনের শান্তি রক্ষার জন্যে এই নিরেনব্বই মাইল দূরে আমার থাকাই শ্রেয়।— গঙ্গাতীরের একটা বাসার সন্ধান নিতে ছেড়ো না। কুষ্ঠিতে আছে আমার মীন রাশি। জন্মের বাসার জন্যে মন কেমন করে।

কিছুদিন আগে তিনটে উড়ো টাকা আমার পকেটের মধ্যে ঢুকেছিল। সরস্বতীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে লক্ষ্মী আমার পকেটে বাসা বাঁধতে চিরদিনই আপত্তি করেন। সেই ঈর্ষাপরায়ণা দেবীর অপদৃষ্টির ভয়ে টাকা তিনটে দিয়েছিলেম আমাদের উপায়-সচিবের হাতে। বলেছিলুম চকোলেট কিনে দিতে— আমি মেয়েদের খুসি করব মাঝে মাঝে তাদের হাতে হাতে বিতরণ করে। সেই প্রতিশ্রুত চকোলেটের বাক্স যদি কোনো গতিকে আমার দখলে আসে তাহলে ওরা যখন এখানে আসবে ওদের পুরস্কার দেব এই মৎলব আমার রইল— দেখি শেষ পর্য্যন্ত সেই তিনটে টাকার কী রকম সৎকার হয়।

আর একটা কথা— খুকু যদি দোল উৎসবের সময় এখানে আসতে পারে তাহলে কাজে লাগবে— তার খবর পাবে কিশোরীর কাছ থেকে— যদি আসে তার ভাড়াটা তাকে দেওয়া উচিত হবে।

তোমার অনুপস্থিতিতেই চণ্ডালিকার অনেক কাটাছাটা করতে হয়েছে— তোমার মঞ্জুরির অপেক্ষায় রইলুম। ইতি

বাবামশায়

৯১

[মে ১৯৩৮]

ওঁ

বৌমা তুমি ভালো আছ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। চেষ্টা কোরো ভালো থাকতে। মংপু এবং মংপুর ঘর বাড়ি ও ব্যবস্থা বেশ ভালো লাগবে— বাতাসটি মন্দমধুর বইচে, বসন্তকালের মতো। আমার লেখবার ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে বাইরে চোখ মেললে কাজ কামাই হয়— নানা

রঙের ফুলে চারদিক রঙীন হয়ে রয়েছে।—জোঁক একেবারেই নেই—তাছাড়া সেই উপরে চড়বার দুর্গম রাস্তাটার সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল না। ঐখানে অনিল ও সুধাকান্ত যমদূতের দর্শন পেয়েছিল বলে একটা খুব লম্বা চৌড়া গুজব শোনা গেছে। বাবামশায়

৯২
২২ মে ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, চমৎকার জায়গা, বাড়িটা তো রাজবাড়ি— স্পষ্ট বোঝা যায় ছিল ইংরেজের বসতি— তকতক করচে, কাঠের মেঝে, আসবাবগুলো পরিষ্কার, উপভোগ্য,— উপরে নিচে ঘর আছে বিস্তর, বিছানা আনবার দরকার ছিল না। মৈত্রেয়ী যখন বল্‌লে একটা কথা দিতে হবে, ছুটির শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে, কথা দিতে বিলম্ব হোলো না। তাহলে মাঝে মাঝে তোমাকে কিন্তু আসতে হবে। পরীক্ষা করে দেখো শরীর কী রকম থাকে। দুই একদিন থাকলে বোধ হয় খারাপ লাগবে না। এখানে সুরেন সুধাকান্ত সকলেরই অনায়াস [অনায়াসে] জায়গা হতে পারবে। কালিম্পঙের ঘরের দাবী আমি ছেড়ে দিচ্চি, ওখানে বরঞ্চ অমিতা কিম্বা তোমার কোনো সখীকে আনিয়ে নিতে পারো। তোমার শরীর কেমন আছে লিখো। কেলি সাল্‌ফ্ আর ম্যাগনেসিয়া ফস্ খেয়ো। তোমার খোকা কুকুরটাকে দিনে তিন চারবার করে <u>নেট্রম ফস</u> চার বড়ি খাইওয়ো [খাইয়ো]। এখানে

যত্নের ত্রুটি হচ্চে না। আরো কম হলে চল্‌ত। তোমার জন্যে ভিশি ওয়াটার এক গাড়ি বোঝাই আনিয়ে রেখেছে। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

বাবামশায়

৯৩

২৩ মে ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

না বৌমা, এখানে তোমার এসে কাজ নেই। তোমার শরীরে সইবে না। এখানকার আকাশ বাতাস জলে ভরা— তোমার পক্ষে হয় তো স্বাস্থ্যকর নয়। আমার কোনো অসুখ বা অসুবিধা নেই— ব্যবস্থা ভালোই, সেবাও অক্লান্ত, লোকেরও ভিড় নেই। এখানে লেখার কাজটাও অবাধে চলবে বোধ হচ্চে। মাঝে মাঝে যখন রোদ্দুর ঝলমল করে ওঠে সেটাকে আশার অতীত বলে বোধ হয়। শোনা যায় এই বৃষ্টির উপদ্রব এখানে জ্যৈষ্ঠ-মাসের পক্ষে স্বাভাবিক নয়— তাই আশা করচি দুর্য্যোগটা সাময়িক। কাল রাত্রে মুষলধারে বর্ষণ হয়ে গেছে, সকালে ঘন কুয়াষায় [কুয়াশায়] চারদিক ঢাকা ছিল এখন মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ প্রসন্ন হয়েছে। তোমাদের ওখানেও নিঃসন্দেহ বৃষ্টি বাদল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়েছে। তোমরা সবাই, বিশেষত তুমি, ভালো আছ আশা করা যাক্‌। গ্যাণ্টকে যদি যাওয়া স্থির হয় বনমালীকে ভুলো না। এখানে তার কোনো কাজ

নেই, তবু তার মতে কালিম্পঙ এখানকার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। বোধ করি উমেশ ও হরিপদর বিচ্ছেদ মনে অবসাদ এনেছে। সুধাকান্ত যত বকচে তত খাচ্চে না। যদি তোমার দরকার না থাকে সেই হজমি চাটনিটুকু পাঠিয়ে দিয়ো। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

বাবামশায়

৯৪

[জুন ১৯৩৮ ?]

ওঁ

মংপু

বৌমা দিন গণনা করচি। সীতাকে হনুমান উদ্ধার করেছিলেন আমি হনুমানের বাবার উপর নির্ভর করে আছি— অনিল আমাকে নিয়ে যাবেন এই রকম সংকল্প কিন্তু জানইতো কড়া পাহারা। আমাকে এবারে তোমরা দুজনে মিলে খুব জব্দ করেছ। ভেবেছিলুম— কয়েকদিন এখানে থেকে কালিম্পঙে আশ্রয় নেব— সে রাস্তা বন্ধ করেছ। লক্ষ্ণৌয়ের ঝুনু আশা করেছিল কালিম্পঙে আমার কাছে গিয়ে থাকবে গান শিখবে। সেই জন্যে এসেছিল দার্জিলিঙে। ভালো লাগবে না। তাকে বলেছি শান্তিনিকেতনে বর্ষা উৎসবে যোগ দিতে— যদি রাজি হয় খুব ভালো হবে। আলমোড়ায় আমাকে নিয়ে গেলে না কেন— এখন মনে হচ্চে বেরেলি স্টেশনও খুব খারাপ জায়গা নয়।— কল্পিতা দেবীর নাম আমার অপরিচিত শুনে মৈত্রেয়ী বিস্মিত— তোমাকে বোধ হয় লিখেছে, উত্তর না পেয়ে ভেবেছে রাগ করেচ। আমিও তাকে বলেছি ফাঁস করে দেওয়া ভালো হয় নি। তোমার কী প্ল্যান একটু জানতে দিয়ো।

বাবামশাই

৯৫

[জুলাই ১৯৩৮ ?]

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু এখানেও খুব বৃষ্টি, কিন্তু এখানকার বাদল ভালোই লাগে। দিলীপ সদলে আসবে বলে ভয় লাগিয়েছিল আসতে পারবেনা বলে টেলিগ্রাম পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আজ চিত্রিতা লিখেছে অনিল তাকে আমার বাল্য থেকে শেষ বয়স [পর্যন্ত কয়েক] খানা ছবি পাঠিয়েছে। চিত্রিতা লিখেছে অনিলবাবু খুব ভালো লোক। চিন্তার বিষয়। তোমার শেষ গল্পটা পাঠিয়ে দিয়ো। চারুবাবু উদয়নে আসর জমিয়েছেন। অমিয় এসেছে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা ভালোই লাগবে। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী আজ আমার সেবার ভার নেবা মাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ প্রকাশ করেছে। তবু দিন চলে যাচ্চে— খুব নীরবে।

বাবামশায়

৯৬

২৪ অগস্ট ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা

আমাকে ওখানে যেতে লিখেছ। চিঠি আজই পেলুম। সেই ডাকেই খবরের কাগজে দেখা গেল কালিম্পঙের রাস্তা আর দার্জিলিঙের রাস্তায়

গতিবিধি বন্ধ। গণৎকার বলেছে দুই এক মাসের মধ্যে আমাকে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করতে হবে। সন্দেহ হচ্চে কালিম্পং যাব উড়োজাহাজে করে। এদিকে বর্ষামঙ্গলের জন্যে পরিশোধের রিহর্সল চলচে, তুমি নেই, তাই চলচে না বলাই উচিত— চালাবার মতো তেজ আমার দেহে মনে নেই।— যথাসময়ে তোমার সেই লেখাটি পেয়েছিলুম। তার নাম দেওয়া যেতে পারে দিলীপী জিলিপী। ওর মধ্যে কিছু ঢাকাঢুকি নেই— বেরলে ডুয়েল লড়াইয়ের আশঙ্কা আছে।

রাস্তা যদি পাই তো নিশ্চয় যাব কালিম্পং— কিন্তু বর্ষামঙ্গলের দলকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারিনে। মৃণালিনী সাজবে বজ্রসেন— একটুও সুবিধে ঠেকচে না ভালো লাগচে না। ইতি

বাবামশাই

৯৭

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা মোটের উপর ভাদ্রমাসের ব্যবহার ভালোই ছিল। বিদায় নেবার সময় অভদ্রতা করচে। মনে হচ্চে সমস্ত আকাশের জ্বর হয়েছে। —তুমি ছিলে না, তাই ভয়ে ভয়ে পরিশোধটাকে ঠেলে ঠুলে গড়ে তুলেছিলুম— খারাপ হয় নি। এখন বর্ষামঙ্গল নিয়ে পড়েছি নতুন মেয়েদের

নাচ হবে— নতুন গানও বানিয়েছি। তার পরে আসবে ছুটি। আমি হয়তো চোখ কানের তাড়ায় কলকাতা অঞ্চলে ডাক্তারদের দরজায় ধন্না দেব। তখন ফলতা হবে আমার আশ্রয়। ইতি

বাবামশাই

৯৮

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা

আজ গান্ধী জয়ন্তী হয়ে গেল। সকালে মন্দিরে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছে। এদিকে কিছু দিন থেকে যে প্রাত্যহিক ঝড় বৃষ্টির আয়োজন হয়েছিল সেটা নিঃশেষ হয়েছে। আজ সকাল থেকে উজ্জ্বল রোদ্দুর— চারদিকে আকাশে ছড়িয়ে পড়া শরতের সাদা সাড়ির আঁজলা ঝলমল করচে। এবার আবার একবার হাওয়ায় লাগবে গরমের ঝাঁজ, তবু তার উগ্রতা অসহ্য হবে না। খেয়ে এসে বসেচি, এখন বেলা এগারোটা— ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্চে— পাহাড়ে চড়ে বসে এখানকার শারদশ্রীর মাধুর্য্য বোধ হয় মনে আনতে পারচ না। আর কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা যখন স্থায়িত্ব নেবে তখন যাব গঙ্গার ধারে— আকাশের সাদা মেঘের সঙ্গে পাল তোলা নৌকোর পাল্লা দেওয়া দেখা যাবে। আমার মন অচল পাহাড়ের দিকে যায় না আমার মন নদীর ধারার সঙ্গে ছোটে— কাল হবে

বর্ষামঙ্গল— শান্তির সঙ্গে রফা করে নিয়েছি— ভালোই হবে।— সেই সিন্ধি মেয়েটি খুব ভালো নাচচে,— নাচে তার খুব উৎসাহ— অনতিকালের মধ্যে এ মেয়েটি রাজনটীর দলে ঢুকবে। এবার যখন অভিযানে বেরবে একে পাবে। এ কারো চেয়ে কম নয়।— মংপুতে যত্নে আদরে থাকবে। আমার ভাগ্যে আদর যত্নের কৃপণতা শোচনীয়। ও জিনিষটা এসিস্টেণ্ট পার্সোনাল সেক্রেটারীর হাত দিয়ে যদি পাবার উপক্রম দেখি তবে সকাতরে থামিয়ে দিতে হয়। ইতি

বাবামশাই

৯৯

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

বৌমা

তুমি যে কাজের ফরমাস করেচ তাতে মন লাগানো বড়ো শক্ত। পর্বত চূড়ায় বসে তুমি ঠিক কল্পনা করতে পারবে না কী রকম একটা অবসাদের মাকড়যার জালে জড়িয়ে রেখেছে। কাজ করতে যাই, কেবলি গড়িমসি করতে থাকি। তা ছাড়া তোমার ফরমাসের সঙ্গে আমার সেক্রেটারি সাহেবের প্লানের মিল হচ্চে না। তিনি একটা খুব লম্বা সূচি বানিয়েছেন, টাকার বেড়া জাল ফেলবার উদ্দেশে। ডিসেম্বরের শেষ ভাগ থেকে সুরু করে হায়দ্রাবাদ মৈসোর জামসেদপুর ইত্যাদি ইত্যাদি সহর ঝেঁটাতে ঝেঁটাতে চলতে হবে। তাঁর লক্ষ্য চিত্রাঙ্গদার পরে— দাক্ষিণাত্যে ঐ নাট্যের কোনো পরিচয় হয় নি। নতুন রচনা নিয়ে নতুন জায়গায় পরীক্ষা করতে সাহস হয় না।

আশ্রম এখন শূন্য। অনিল অনিলানী দেশে গেছে। সুধাকান্ত কলকাতায়। বুড়িকৃষ্ণ আর অমিয় আছে। ইতি

বাবামশাই

শুনচি মমতার শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে।

১০০

[৩ অক্টোবর ১৯৩৮]

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু এবারকার ভাপসা গরম শীঘ্র কাটবে বলে মনে হচ্চে না। তোমরা নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের আগে ফেরবার চেষ্টা কোরো না। আমি এখানকার কাজে আর বই ছাপার ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। সেক্রেটারি ভেগেছে দেশে, সুধাকান্ত জ্বরে শয্যাগত, অমিয় দুই একদিনেই ফিরবে লাহোরে। সুধীন্দ্রও ছুটি নিয়ে চলে গেছে এখন আমার একমাত্র সহায় আমার নাতজামাই। খুকু এসেছিল, সে কাজ নিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু কাল তার গান শুনে মনে খটকা লাগল। উপায় নেই।

গঙ্গার ধারের বাগানের রাস্তা বন্ধ ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে ভালোই। এখানে সুকুমার এসে কাজে যোগ দিয়েছেন আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনার দরকার আছে।

স্টেলা ক্র্যামরিশের হাতে আমার ছবিগুলোর কী দশা হোলো জানিনে। কাগজে পড়লুম সে যাচ্চে আফগানিস্তানে।— মৈত্রেয়ীদের

কোনো খবর পাইনে— তারা উপরের সপ্তকে আছে, না নীচে।— তোমাদের শরীর ভালো আছে শুন্‌লে নিশ্চিন্ত হব। ইতি নবমী ১৩৪৪

বাবামশায়

১০১

[৪ অক্টোবর ১৯৩৮]

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা

আমার মারফতে বিবি সরু সরু অক্ষরে এক পোষ্টকার্ড ভর্ত্তি করে তোমাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে বিজয়ার আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিয়েছে।

আজ আশ্রমের সবাই আমাকে প্রণাম করতে আসবে— তাদের জন্যে আহারের জোগাড় হচ্চে। ওদিকে সুধাকান্ত শয্যাগত। বুড়ির উপরে আমার নির্ভর। নানাদেশ থেকে লোক জনের যাতায়াত চলচে, গরমটাও নরম হবার লক্ষণ দেখাচ্চে না। বিজয়া দশমী

বাবামশায়

১০২

৬ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা

উদয়নে ডাকাত পড়েছে হাল আমলের দেবী চৌধুরাণী। আমার আশা ছেড়ে দাও। শুনলুম মংপু নামে জায়গায় কোনো বঙ্গ মহিলা হিটলারের অনুকরণ করে Concentration Camp খুলেছে। আমাকে ভাবতে সময় দিল না— ছোঁ মেরে নিয়ে চল্‌ল— কালিম্পঙের নাম করলে আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দেয়। আমার হাতে এখন পনেরো আনা সম্বল ভদ্রমহিলা তাতেও দমলো না, সেটাও সেই থলিতে পড়বে যার মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে গরীবের দেড় টাকা। আমার এখন নিঃসহায় অবস্থা, যা ভালো মনে করো কোরো। ইতি

বাবামশায়

১০৩

[৮।১০।৩৮]

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা

মৈত্রেয়ীর কান্নাকাটি মানব না। একটুও ভালো লাগচে না। আগে কালিম্পঙে গিয়ে উঠব তার পরে ও যখন পারে নিয়ে যাবে। ভয়ঙ্কর

জেদী মেয়ে, তার পরে, ইচ্ছে করলেই কাঁদতে পারে। ওর কাছ থেকে জেদের পাঠ নিতে হবে।— আজ শনিবার— বিকেলের গাড়িতে জোড়াসাঁকোয় যাব— রবিবারে সেখানে অপেক্ষা করে সোমবারে যাত্রা করব। দার্জিলিং মেল আমার চলবে না— যেটা রাত্তিরে ছাড়ে সিলিগুড়িতে সকালে নটাতে পৌঁছয় সেইটেতেই যাব। ওখান থেকে সেবোক পর্যন্ত রেলেতে যাওয়াই সুবিধে— সেখান থেকে মোটরে চড়ব। সঙ্গে যাবে বনমালী আর রামচরিত (নতুন চাকর)। অন্নদা হবে আমার বাহন।

আশ্বিন প্রায় শেষ হয়ে এল কিন্তু এখনো ঠাণ্ডার লক্ষণ নেই, গরমে সকলেই হাহুতাশ করচে— বোধ হয় আরো মাস খানেক লাগবে পৃথিবীর বুক জুড়োতে।

সুধাকান্তর ছেলের অসুখ এখনো চলচে। ইতি ৯।১০।১১[৩৮]

বাবামশায়

১০৪
[১০ অক্টোবর ১৯৩৮]

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা মংপুর টান কাটিয়ে মৈত্রেয়ীকে কাঁদিয়ে চললুম শান্তিনিকেতনে। দেহটাকে নিয়ে টানাটানি করতে ভালো লাগেনা। আশা করি গরমটা তেমন অসহ্য হবেনা। কাল সকালের গাড়িতে যাত্রা করব। মৈত্রেয়ীরা আজই যাবে। ইতি সোমবার

বাবামশায়

১০৫

১২ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা যাওয়া ঘটে উঠল না। ফিরে এসেছি ধবলীতে। ক দিন ধরে এখানে খুব বৃষ্টি। আশা করি থেমে গেলেই আবার সেই ভাদ্দুরে গুমট মাথা তুলবে না। তোমরা নবেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে কোনোমতেই এসো না। এখানে সব চুপচাপ। সুরেন ধীরেনের সঙ্গে রথযাত্রা করেছে হাজারিবাগে। সুধাকান্তর সঙ্গে এখনো সাক্ষাৎ হোলো না। কাজের ভার নিজের ঘাড়েই পড়েছে। এবারে ছুটির টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। একেই বলে গ্রহ।

বাবামশায়

১০৬

১৬ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা তোমরা ২৪।২৫ শে নামতে চাচ্চ— এমন কাজ কোরো না। ঘোরতর গরম। শরীর যেটুকু সেরেচ এখানে এই অসহ্য গুমটের মধ্যে সেটা নষ্ট কোরো না। যদি উড়ো জাহাজ পেতুম আমি চলে যেতুম পাহাড়ে।

মনে হচ্চে অন্তত নবেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেবতার দয়া হবে না। আমার শরীর সর্বসহিষ্ণু, নইলে শয্যাশায়ী করত। এখন ভাবচি মৈত্রেয়ীর কাছে হার মানলেই জিত হোতো। ইতি

বাবামশায়

১০৭

২৯ মে ১৯৩৯

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

এবারে ভালো চলচে না। পালাই পালাই করচে মন, জষ্টি মাস তার যষ্টি নামালেই দৌড় দেব। ছুটিটা গেল মিথ্যে। কলকাতায় নামলেই আমাকে কর্মজালে জড়াবে অথচ শরীর মন একটুও প্রস্তুত নেই উদ্ধার পাব কবে এবং কী করে জানি নে। নৈনিতালের ব্যর্থপালা শেষ করে তোমরা জয়ন্তীর আশ্রয়ে ভালোই আছ আশা করচি। তাকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো।— তোমার খুকুমণি পলাতকা। তার খোকারই হোলো জিৎ। ইতি

বাবামশায়

১০৮

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা নির্ব্বিঘ্নে এসে পৌঁচেছি। গাড়িখানা খদে পড়বার দিকে ঝুকছিল তখন আমার সহযাত্রিনী লাফ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, দুর্ঘটনার জবাবদীহি করবার জন্যে। শেষ মুহূর্তে ফাঁড়া কেটে গেছে। ঠাণ্ডা আছে কিন্তু শরীরটা পুরো পরিমাণ কর্ম্মপটু হয় নি। এখনো কলম চালাতে পারচি নে— সেটা ভালো লাগচে না। ইতি

বাবামশায়

১০৯

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, জায়গাটা ঠাণ্ডা সন্দেহ নেই কিন্তু নিচে থেকে যে অবসাদ দেহ বোঝাই এনেছিলুম সেটা এখনো নামাতে পারিনি। এবার বোধ হয় মংপুর নাম রক্ষা হবে না। অন্যান্য বার পাহাড় প্রদেশে কলম চলত

ভালোই— এবার সে কোনোমতে খুঁড়িয়ে চলচে। পালে হাওয়া লাগচে না— মন রয়েছে বিমুখ। গল্প এক আধটা লিখব প্রতিশ্রুত ছিলুম-- তাই লিখ্‌তে বসেছি— থমকে থম্‌কে লেখা— মাঝে মাঝে অনেকখানি না লেখা ধূসরতা। পাহাড় ডিঙিয়ে শরতের বাঁশির সুর এসে পৌঁছচ্চে শান্তিনিকেতনের নানা রঙের আলপনা দেওয়া দিগন্ত থেকে এখানকার শৈলমালার স্বপ্নে দেখা আবছায়া নীলিমায়। তোমাদের যে বর্তমান পরিস্থিতি তাতে আস্‌তে বল্‌তে পারিনে। যাক আরো কিছুকাল— যদি সুযোগ ঘটে এসো— স্থানাভাব ঘটবে না— রাত তিনটে পর্যন্ত বাক্যালাপ চলবে। মেয়েদের গৃহ নির্ম্মাণের কথা লিখেছ, কিন্তু ফাউণ্ডর প্রেসিডেণ্টের বাসার কী খবর? লিখতে ঘাড় ব্যথা করে ক্লান্তি আসে অতএব আশীর্বাদ করে কেদারায় হেলান দিয়ে পড়িগে।

বাবামশায়

১১০

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, গোল আলুর মনটা শান্তিনিকেতনের দিকে গড়ায়মান অবস্থায়। তাই তার স্থলাভিষিক্ত করে সুধাকান্তকে ডেকে পাঠালুম— গদিবদল হওয়া ভালো। এখনো এ জায়গাটা ঠিক স্বাস্থ্যনিবাস হয়ে ওঠেনি এমন কি ইতিমধ্যে এখানকার গৃহস্বামীর চিকিৎসা ভার আমাকে নিতে হয়েছিল।

আমার ডিস্‌পেন্‌সরি আমার সঙ্গেই থাকে সেইজন্যে এখানকার হাওয়ায় যদি বৈরিতা দেখা দেয় আমি তার প্রতিকার করতে পারি। কিন্তু সম্প্রতি সুসময় এসেছে বোধ হচ্চে— এখন রথী এলে তার উপকার হতে পারবে, আমার উপর দিয়ে প্রথম ধাক্কা কেটে গিয়েছে। তোমার এবারকার লেখাটাতে অত্যলঙ্কৃত ভাষার বাড়াবাড়িতে তোমার স্বাভাবিক ছবি-আঁকা রচনা চাপা পড়েছিল। ঘনবর্ষায় গুল্ম জালে জড়িত তোমার বাগানের সুষমার মতো। জঙ্গল কেটে ছেঁটে তাকে উদ্ধার করেছি। আলুর হস্তাক্ষর কপি করার কাজে অনুকূল নয়, সেও কুণ্ঠিত, এইজন্যে ওটা অপেক্ষা করচে। গভীর আলস্যে বেষ্টিত আমার গল্প লেখার কাজ নিয়ে সময়ের টানাটানি, যেটুকু অবসর দেখা দেয় সেটা ঝিমিয়ে থাকে, তাই নিজে কিছু করতে পারি নে। আজ সকালের রৌদ্র কুহেলি শয্যা থেকে বেরিয়ে এসেছে— মনে হচ্চে ভালো দিনের সূচনা করচে। ইতি

বাবামশাই

১১১

৬ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

বৌমা

রথী আসচেন আশা করি ভালই থাকবেন। এতদিন অত্যন্ত ভিজে হাওয়ার উপদ্রব চলছিল ভালো লাগছিল না— আশা করি রৌদ্রের প্রসন্নতা সুরু হবে।

তোমার লেখাটা মেজে ঘযে দিয়েছি— তার শেষ অংশটা বদলেছি কিছু মনে কোরো না। আমার তো মনে হয় সবসুদ্ধ সুখপাঠ্য হয়েছে— পূজোর বাজারে অনায়াসে চলবে। তোমার বড় মা সন্ধান পেলে লুফে নেবেন। কিন্তু এটা প্রবাসীর যোগ্য। হাত বদল করতে চাও যদি পরিচয়ে চেষ্টা দেখতে পারো। এখান থেকে পালাবার চেষ্টায় ছিলুম। কিন্তু তুমিতো বম্বাই অভিমুখে, তাহলে আমি কার আশ্রয়ে যাব। শূন্যঘরে মন বসে না।

আমার গল্পটা শেষ হয়ে গেছে চুনকাম পলস্তার কাজ চলচে।

আলু বোধ হয় দমে গেছে, অর্থাৎ আলুর দম। কথা ছিল আসচে বিশে তারিখে রওনা হব। সেটা ক্যান্‌সেল হয়ে গেছে। এখানে ওর প্রধান আড্ডা মিসেস গাঙ্গুলির ঘরে। মাসীর সঙ্গেও খুব উচ্চ হাস্য চলে। ইতি

বাবামশায়

১১২

২৫ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার চিঠিখানি পড়ে মন খুব খুসি এবং নিশ্চিন্ত হয়েছে। অবাধে তোমাদের সংকল্প সিদ্ধ হোক এই কামনা করি। উপসংহারে বিলম্ব না হয় এই ইচ্ছাটাই মনের মধ্যে ঘুরচ্চে।

আমাদের এখানে শীত খুবই তীব্র হয়ে উঠচে— রৌদ্র হয়ে এসেছে বিরল, মেঘে কুয়াশায় আকাশ রয়েছে আচ্ছন্ন। সর্ব্বাঙ্গে একরাশ কাপড়

জড়িয়ে মনে হচ্চে যেন বারো আনা বিলুপ্ত হয়ে আছি। দেহটা মুক্তি কামনা করচে। মোটের উপর স্বাস্থ্য ভালই। এখানে এসে রথীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। এ জায়গায় আছি আর দিন দশেক। ৫ই নবেম্বরে দেব দৌড়। ততদিনে হেমন্ত কাল সোনার ধান পাকিয়ে উপভোগ্য হবে। আমার নতুন বাড়ির গাঁথুনি চল্‌চে— তারজন্যে কৌতূহল আছে মনে। বনমালীর জন্যেও উৎসুক আছে মন। আমার একটা নতুন গল্প শেষ হয়ে গেছে। পুপুকে আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি

বাবামশায়

১১৩

২২ এপ্রিল ১৯৪০

ওঁ

SANTINIKETAN,
BENGAL,
INDIA.

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, তোমার কাছে ছেলেমানুষের মতো নালিশ করতে লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু আমাকে তোমরা চাপাচুপি দিয়ে ছেলেমানুষ করে রেখেছ, নিরুপায় ভাবে পরনির্ভরতা বহন করচি। একটা দৃষ্টান্ত দিই। পাহাড়ে আসব, জিনিষপত্রের ভার ছিল কানাইয়ের উপর, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও সতর্ক। হঠাৎ এক সময়ে আলু এসে আমার আসবাবের এক অংশ ঝড়ের মতো ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে জোড়াসাকোয় নিয়ে গেল। তাই নিয়ে

বনমালী নিষ্ফল উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। ষ্টেশনে এসেও ও তাদের তাড়া দিয়ে বল্‌লে সব ঠিক আছে। তার পরে এখানে এসে পৌঁছে ক্লান্ত দেহে সমস্ত সকাল বেলা হারানো জিনিযের জন্যে খোঁজ করে আবিষ্কার করা গেল সেগুলো পৌঁছয়নি। তার মধ্যে ওষুধপত্র সাবান প্রভৃতি ছিল, সে জন্যে ভাবি নে, কিন্তু লোকশিক্ষা সংসদের জন্যে পশুপতি ডাক্তারের লিখিত manuscript এবং সুকুমার সেনের রচিত দুখানা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে। সেই দুখানা বইয়ের মধ্যে একখানা সম্পূর্ণ ছাপা শেষ হয় নি— আমি সুনীতিকে বারবার আশ্বাস দিয়েছি হারাবার ভয় নেই, এবং আমি সে বই মন দিয়ে পড়ব।— দোহাই তোমাদের, আমার অভিভাবকের সংখ্যা কমিয়ে দাও; আমার জীবনযাত্রার প্রয়োজন খুব স্বল্প, একজনের উপর দায়িত্বভার দিলে এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে না। আপাতত অন্তত ঐ বই তিনখানা যদি উদ্ধার করে পাঠাতে পার, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। বাকি সমস্ত খবর সুধাসমুদ্রের কাছ থেকে পাবে। ইতি

বাবামশায়

১১৪

৩ [সেপ্টেম্বর ১৯৪০]

ওঁ

SANTINIKETAN,
BENGAL.
INDIA.

বৌমা, তোমাদের বাড়িটা দেখি। শূন্য হাঁ হাঁ করচে। না আছ তুমি, না আছে রথী— প্রধান ব্যক্তি যে আছে সে হচ্চে নাথু।

নিদারুণ শরতের তাপ আকাশে এসেছে। কৃপণ বর্ষণ কালো মেঘের ভিতর থেকে সমস্ত পৃথিবীকে অভিশাপ দিচ্চে। হংস বলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানস সরোবরের দিকে, মংপুতে মাগুর মাছের সরোবর তীরেও হয় ত শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম। গল্পটা শেষ হয়ে গেছে— এখন তাতে প্লাস্টার লাগাচ্চি।

আজ রাত্রে দেবতা যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বর্ষামঙ্গল হবে। সকালে বৃক্ষরোপণ হয়ে গেছে।

আমার শরীরে ভালো মন্দর জোয়ার ভাঁটা চলছিল। সম্প্রতি ভালই আছি।

মংপুতে যাবার পূর্বে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আহার্যের খরচ সম্প্রতি বেড়ে গেছে।

শাকপাতা খাচ্ছিলুম অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে মাছ মাংস ধরতে হয়েছে। আমার সম্বলের মধ্যে শুনচি তোমার কাছে টাকা দশেক প্রচ্ছন্ন আছে। সেটাতে ক'দিন চলবে জানিয়ো— সেই অনুসারে ওখানকার মেয়াদ স্থির করতে হবে।

মাংপবীকে আশীর্বাদ জানিয়ো

বাবামশায়

১১৫

৩০ জুলাই ১৯৪১

ওঁ

বেলা দশটা

জোড়াসাঁকো

মামণি

তোমাকে নিজের হাতে লিখতে পারিনে ব'লে কিছুতে লিখতে রুচি হয় না। কেবল খবর নিই আর কল্পনা করি যে তুমি ভালো আছ— অন্তত এখানকার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে দূরে থেকে কিছু আরামে আছ। কিছু তাপ এখনো তোমার শরীরে আছে সেটা ভালো লাগছে না। কেননা ক্ষুদ্র শত্রুর জেদটাই সবচেয়ে দুঃখজনক। আমাকে প্রত্যহই একটা-না-একটা খোঁচা দিচ্ছেই— বড়ো খোঁচার ভূমিকা স্বরূপে। শুনেছি বড়োর আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয় এই সব ছোটো-ছোটের উপদ্রব যেমন। যা হোক এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশি দেরি নেই, চুকে গেলে নিশ্চিন্ত থাকব। ইতি

বাবামশায়

গ্রন্থপরিচয়

প্রতিমা দেবী

প্রতিমা দেবী (৫ নভেম্বর ১৮৯৩ - ৯ জানুয়ারি ১৯৬৯) বিনয়িনী দেবী ও শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা এবং গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী। অতি অল্প বয়সেই তাঁকে বৈধব্যবরণ করতে হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় ১৯১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। প্রতিমা দেবীর বয়স তখন মাত্র ষোলো অতিক্রম করেছে।

রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে চেয়েছিলেন যে নানা বিদ্যার চর্চার মধ্য দিয়ে প্রতিমা দেবীর ব্যক্তি-সত্তা একটা পূর্ণতা অর্জন করুক। এ ব্যাপারে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং এর জন্য প্রথম থেকেই তিনি উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথেরও যে এ সম্পর্কে একটি কর্তব্য আছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তাঁদের বিয়ের অনতিকাল পরেই তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'কিন্তু একটা কথা মনে রাখতেই হবে। তুই লেখাপড়া সমাধা করে জীবন পথের পাথেয় সংগ্রহ করে প্রস্তুত হয়ে সংসারে প্রবেশ করেছিস— কিন্তু বৌমার তা হয় নি— এখনো সে ছেলেমানুষ— জগতের সম্বন্ধে এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের বিকাশ হয় নি। ...কাজেই তাঁর চিত্তকে জাগিয়ে তোলবার ভার তোকে নিতে হবে— তাঁর জীবনের বিচিত্র খাদ্য তোকে জোগাতে হবে— তার মধ্যে যে সকল শক্তি আছে তার কোনোটা মুষড়ে না যায় সে দায়িত্ব তোর।' চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ. ৯-১০।

কয়েকমাস পরে (১০ সেপ্টেম্বর ১৯১০) রথীন্দ্রনাথকে তিনি আবার লেখেন, 'বেলা তোদের পুরীতে নিয়ে যেতে চাচ্চে। তাহলে বৌমার পড়াশুনা সমস্ত উলট-পালট হয়ে গিয়ে ওর খুব ক্ষতি হবে। এখন কিছুদিন যাতে ওর কোনো প্রকার disturbance না হয় সেজন্যে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।' —বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪।

কার্যত, প্রতিমা দেবী যখন যেখানে ছিলেন— শান্তিনিকেতনে, শিলাইদহে বা

জোড়াসাঁকোয়— সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিয়ের কিছু কাল পরে প্রতিমা দেবী যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসে থাকেন, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁকে ইংরেজি পড়াতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন স্থানান্তরে যেতেন তখন শিক্ষার ভার পড়ত আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপর। প্রতিমা দেবীর উপযুক্ত শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথই জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মারফত মার্কিন মহিলা মিস বুর্ডেটকে শিলাইদহে আনিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে প্রতিমা দেবী যখন রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় এসে বাস করেন, তখন তিনি ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক গৃহ-বিদ্যালয় 'বিচিত্রা'য় শিক্ষালাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-শিক্ষার ভার দিলেন শান্তিনিকেতন থেকে আগত শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীকে, শিল্পশিক্ষার দায়িত্ব দিলেন শিল্পী নন্দলাল বসুকে। এঁরা দুজনেই ছিলেন 'বিচিত্রা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তীকালে প্রতিমা দেবী প্যারিসে R. La Montagne St. Hubert-এর কাছে ফ্রেস্কোর কাজ শিখেছিলেন। ফরাসি শিল্পী আঁদ্রে কারপেলেস্ যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তাঁর কাছেও তিনি অঙ্কন বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেন। আঁদ্রে কারপেলেস্ আর প্রতিমা দেবীর সহযোগিতাতেই ১৯২১-২২-এ কলাভবনে হাতের কাজ শেখানোর জন্য 'বিচিত্রা' বিভাগের পত্তন হয়েছিল। এই 'বিচিত্রা'ই ছিল শ্রীনিকেতনের পূর্বসূচনা। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর তৎকালীন কলাভবনের সহপাঠীরাও প্রতিমা দেবীর কাছ থেকে শিখেছিলেন ইউরোপীয় ফ্রেস্কোর বিশেষ পদ্ধতিটি। দ্র. বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'চিত্রকথা', ১৯৮৪, পৃ. ১৫২, ৩৯৭।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রতিমা দেবী সাহিত্যচর্চাতেও উৎসাহিত হন। তাঁর রচিত অনেক গল্প ও কবিতা 'প্রবাসী' ও 'কবিতা' পত্রিকায় 'কল্পিতা দেবী' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল (কল্পিতা দেবী নামটিও ছিল রবীন্দ্রনাথের দেওয়া)। এগুলি পরে তাঁর 'চিত্রলেখা' (১৩৫০) গ্রন্থে সংকলিত হয়। তাঁর 'নৃত্যরস', 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' ও 'চণ্ডালিকা' এই তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয় 'নৃত্য' (১৩৫৬) গ্রন্থে। তাঁর রচিত অন্য দুটি গ্রন্থ 'নির্বাণ' (১৩৪৯) এবং 'স্মৃতিচিত্র' (১৩৫৯)। এ ছাড়া উল্লেখ্য, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (ভাদ্র ১৩৪৯) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'গুরুদেবের চিত্রকলা' এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ -প্রকাশিত প্রতিমা দেবীর অঙ্কিত কয়েকটি নির্বাচিত চিত্রের সংকলন *Protima : An Album of Paintings* (1968)।

শান্তিনিকেতনের জীবনধারার সঙ্গে প্রতিমা দেবী নিজেকে নানাভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে শান্তিনিকেতনের নানা নাট্যাভিনয়, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে ক্রমে অভিনয়, অভিনয়ের রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, নৃত্যকলা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ও দক্ষতা জন্মেছিল। ১৯৩০ সালে 'নবীন' অভিনয়ের সময়ে প্রতিমা দেবী অনেকগুলি গানের সঙ্গে (যেমন 'চলে যায় মরি হায়', 'ওরে গৃহবাসী', 'ওরা অকারণে চঞ্চল', 'হে মাধবী দ্বিধা কেন') নৃত্যের পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৩ সালে শান্তিনিকেতন থেকে তিনিই নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে লক্ষ্ণৌতে যান এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি সেখানে সার্থকভাবে পরিবেশিত হয়।

পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় তাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতার উপর রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই নির্ভর করতেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতাচার্য প্রয়াত শৈলজারঞ্জন মজুমদার লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা, পরিশোধ ইত্যাদি কাব্যনাট্য নিয়ে নৃত্যের পরিকল্পনা মুসাবিদার কথা কখনো তেমন বিবেচনা করেন নি। এর কল্পনার প্রথম উদয় প্রতিমা দেবীর মনে। তিনি একটা খসড়া খাড়া করে বাবামশাইয়ের কাছে নিয়ে যান। আলোচনা করেন কাব্যনাট্যকে কীভাবে রূপান্তরিত করা যেতে পারে নৃত্যের ছন্দে। শুরু হল এক নূতন সৃষ্টির প্রয়াস।... এ কথা অবশ্য স্বীকার্য রবীন্দ্র-শিল্পসৃষ্টির নৃত্যের দিকটায় প্রতিমা দেবী একটি সার্বভৌম ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নাচের শিক্ষা ও ভঙ্গিকে কীভাবে সংকলন করে একটি নৃত্যধারার প্রবর্তন করা যায় তারই জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। মণিপুরী, কথাকলি, গুজরাতি নাচের রীতি— এ-সব নিয়েই পরীক্ষা চলেছিল। এই নৃত্যের দিক উদ্‌ঘাটনে পরিপূর্ণ প্রেরণা ছিল প্রতিমা দেবীর।...

প্রতিমা দেবী উপলব্ধি করেছিলেন নৃত্য-রীতি ও ধারার বৈশিষ্ট্য অটুট রাখার জন্য স্বরলিপির অনুকরণে 'নৃত্য লিপি' সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা। প্রতিমা দেবী এই উদ্দেশ্যে আশ্রমের নতুন মেয়েদের নিয়ে নাচের ক্লাস করতেন। এই ক্লাসে— 'বাকি আমি রাখব না, কোন্ দেবতা সে, ওরে ঝড় নেমে আয়, ওগো বধূ সুন্দরী' ইত্যাদি গানের বিশেষ নৃত্য-পরিকল্পনাগুলির পরম্পরা সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতেন। নাচের বোল ইত্যাদি ছাত্রীদের লিখে রাখতে বলতেন, কলাভবনের শিল্পীদের নিয়ে নৃত্যের

ভঙ্গি আঁকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনৃত্যের একটি মার্গ ফুটে ওঠে তাঁর প্রেরণায়।

রবীন্দ্রোত্তরকালে শান্তিনিকেতনে 'নটীর পূজা', 'অরূপরতন' ও 'ডাকঘর' অভিনয়ে প্রতিমা দেবীর পরিচালনা কালে আমার সুযোগ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করার। তখন যেন তাঁর নাটক পরিচালনার রীতিতে স্বয়ং গুরুদেবের রীতিরই প্রত্যক্ষ অনুবর্তন অনুভব করতাম।' —'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫, পৃ. ২৮৬-৮৮।

এইভাবে সাহিত্য, চিত্রকলা ও নৃত্যচর্চার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন বিকশিত হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনে। অন্যদিকে শুশ্রূষা, অতিথিপরায়ণতা, স্বভাব-মাধুর্য ইত্যাদি গুণের দ্বারা তিনি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত নির্ভরস্থল। এই সংকলনের শেষের দিকে অনেক চিঠিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি শান্তিনিকেতনেই থেকে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে প্রতিমা দেবীর সম্পর্ক কতটা নিবিড় ছিল তা জানা যায় তাঁর প্রতি শান্তিনিকেতনবাসীদের শ্রদ্ধা নিবেদনে। এ জন্য দ্রষ্টব্য, 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দান' এবং 'প্রতিমা দেবীর অভিভাষণ' ('বিশ্বভারতী নিউজ', জানুয়ারি ১৯৬৯, পৃ. ১৭৩-৭৯) এবং 'প্রতিমা দেবী স্মরণে উপাচার্যের ভাষণ,' Mahasweta Sinha 'Bauthan as I saw her', 'প্রতিমা দেবীর আশীর্বচন' এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যান্যদের লেখা— বিশ্বভারতী নিউজ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, পৃ. যথাক্রমে ২০৭-০৮, ২১১-১৩ ও ২১৫ এবং বিশ্বভারতী নিউজ, নভেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৯৩-১০১। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য শান্তিদেব ঘোষ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, ১৩৯০; চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, ১৩৮৭।

পত্র-পরিচয়

পত্র ১। 'আমরা ত কাল অনেক স্রোত ঠেলে'— রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শিলাইদহের উদ্দেশে রওনা হন ২২ আষাঢ়, ৬ জুলাই। তার আগের দিন এসেছেন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায়। প্রতিমা দেবী তখন আছেন শান্তিনিকেতনে।

পত্র ২। 'নীচের বাংলা'— শান্তিনিকেতনের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নিচু অঞ্চলে অবস্থিত একটি টালির বাড়ি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) ১৯০৬ সাল থেকে আমৃত্যু এই বাড়িতে বাস করেছেন। বাড়িটির বর্তমান নাম 'দ্বিজ-বিরাম'। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবীর স্মৃতিকথায়— এটির উল্লেখ এ রকম, 'ফুলবাগানের ভিতর দিয়া একটি চওড়া বারান্দা-ঘেরা বাড়িতে উঠিলাম। বাড়িটির চারদিকেই বাগান, কয়েকটি সুন্দর আমলকী গাছ চোখে পড়িল। শুনিলাম ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি। ...বাড়িটির নাম শুনিলাম নিচু বাংলা।' সীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি' ১৯৬৪, পৃ. ২১।

পত্র ৩। ১ ও ২-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত ভ্রমণ শেষে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। তার পর রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে আবার তিনি পতিসরের উদ্দেশে যাত্রা করেন ১৬ অগস্ট (১৯১০)। দ্র. প্রভাত মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬১, পৃ. ২৪৪। এই পত্রটি পতিসরের যাত্রাপথে লিখিত বলে অনুমিত। কবি এর পর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২৯ অগস্ট।

'ভোলার মৃত্যুতে'— এই চিঠি লেখার অল্পদিন আগেই (২৫ জুন ১৯১০) শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র ভোলার (সরোজচন্দ্র) আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

'সন্তোষ-হিরণের খবর পেয়ে'— শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অপর পুত্র

সন্তোষচন্দ্রের সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরতা হিরণ্ময়ীর সাময়িক অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। হিরণ্ময়ী ক্ষিতিমোহন সেনের বন্ধু ড. প্রসন্নকুমার সেনের কন্যা।

পত্র ৪। 'মা মা হিংসীঃ'— এই শ্লোকটির পূর্ণরূপ

পিতা নোহসি পিতা নো বোধি
নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ।

(শুক্ল যজুর্বেদ, ৩৮। ২০)

পত্র ৫। 'অভিনয়ের দিন'— 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অভিনয়। এটি শারদাবকাশের পূর্বে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্মিলিত নাট্যোৎসব, অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১০ সালের ৪ অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

'তোমার বাবা'— শেযেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

'প্রভাতের মা'— রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মা গিরিবালা দেবী। তিনি তখন বালিকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়ে 'দেহলি' বাড়িতে থাকতেন। তাঁর আকস্মিক অসুস্থতা প্রসঙ্গে জীবনীকার লিখেছেন, 'তিনি মাঝে মাঝে কবির সহিত শান্তিনিকেতনে দেখা করিতে যাইতেন। একদিন তথায় গিয়া হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন; কবি তাঁহাকে নিজ বাসায় হাঁটিয়া আসিতে দিলেন না; এবং দুই দিন শান্তিনিকেতনে রাখিয়া রাত্রি জাগিয়া চিকিৎসা করেন।' 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৩৮, পৃ. ২৯৯-৩০০।

'মেয়েদের অভিনয়ের উৎসাহ খুব...'— ১৩১৫ থেকে ১৩১৭ পর্যন্ত মেয়েদের পড়াবার যখন ব্যবস্থা হয়েছিল, তখনকার মেয়ে-বোর্ডিং-এর ছাত্রীরা খুবই সফলভাবে 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির দ্বিতলে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র অভিনয় করেছিল। এর পর তাদের উৎসাহ বেড়ে যাওয়ায় 'কাহিনী' (১৯০০) গ্রন্থের 'সতী' রচনাটিরও অভিনয়ের একটা চেষ্টা হয়, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত ঘটে উঠতে পারে নি।

পত্র ৭। 'রাজা' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ থেকে এই চিঠির তারিখ অনুমিত।

'রাজা অভিনয়ের'— এটি 'রাজা' নাটকের প্রথম অভিনয়, অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৫ চৈত্র ১৩১৭ (১৯ মার্চ ১৯১১) সালে। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন ঠাকুরদার ভূমিকা। কলকাতা থেকে আগত দর্শকদের মধ্যে ছিলেন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর কন্যা শান্তা ও তাঁর বন্ধুর দল। পরবর্তীকালে শান্তাদেবী শান্তিনিকেতনে এই অভিনয় দর্শন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'সেবার প্রথম "রাজা" অভিনয় হয়। মাটির নাট্যঘরে খড়ের চালার তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্য তোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।' এই সময়কার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র কালীপদ রায়ও লিখেছেন, '১৯১১ সালে বসন্তোৎসবের পূর্বে দেখেছি রাজা নাটকের প্রথম অভিনয়ের প্রস্তুতির ঘটা। ...প্রাচীন অভিনয়ের ধারা, মঞ্চসজ্জা এবং সাজ পোযাক প্রভৃতি সবেরই আমূল পরিবর্তন ঘটল।' (দ্র. যথাক্রমে শান্তাদেবী, 'রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা', পৃ. ১৬০ এবং কালীপদ রায় "ব্রহ্মচর্যাশ্রমের স্মৃতি", বিশ্বভারতী নিউজ, জানুয়ারি ১৯৮০, পৃ. ১৮৯)।

'মেমের জঞ্জাল'— মার্কিন গৃহশিক্ষিকা মিস বুর্ডেটের প্রস্থান। কবি এই প্রসঙ্গে কন্যা মীরাদেবীকেও লেখেন— 'তোর বন্ধু Miss Bourdatteও তোদের খুব নিন্দে করে দিব্যি তোদের টাকায় পেট ভরিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেছে।' চিঠিপত্র ৪, ১৩৫০, পৃ. ২৪।

পত্র ৮। 'বর্ষশেষের...গেল'— এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ভাষণ 'বর্ষশেষ' ও 'নববর্ষ' পরে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে সংকলিত। দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৯৮।

পত্র ৯। 'পঞ্চামৃত...প্রভৃতি উৎপাত'— মাতৃহীন মীরাদেবীর সন্তান (নীতীন্দ্রনাথের জন্ম) সম্ভাবনা উপলক্ষে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রাঁচিতে এই অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন। এর আগে (পোস্ট মার্ক ১ অগস্ট ১৯১১) রবীন্দ্রনাথ মীরা দেবীকে লিখেছিলেন, 'তোর মেজ মা তোকে তাঁর কাছে রাঁচিতে রাখবার প্রস্তাব আমাকে জানিয়েছেন। সে জায়গাটি খুব ভাল, তোর বেশ ভাল লাগবে— শরীরও ভাল থাকবে।'

চিঠিপত্র ৪, ১৩৫০, পৃ. ২৫। কিন্তু জামাতা নগেন্দ্রনাথের এতে সম্মতি ছিল না। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে লেখেন, 'মোটের উপর ওকে নড়াচড়া বেশি না করাই ভাল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।' কৃষ্ণকৃপালনি-সংগ্রহ, ভল্যুম-৬, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা।

'একেবারে' ... এলে' রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত এই জাপান ভ্রমণ এই সময়ে কার্যকরী হয় নি।

পত্র ১০। পূর্ববর্তী চিঠির ভ্রমণ পরিকল্পনার অনুবৃত্তি এবং 'শারদোৎসব'-এর অভিনয়ের প্রস্তুতির উল্লেখ থেকে এই চিঠির তারিখ অনুমিত।

এই চিঠি ও পরবর্তী চিঠিতে ব্যক্ত কবির ভ্রমণ আকাঙ্ক্ষা অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি।

'শারদোৎসব'— এটি 'শারদোৎসব' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১১-তে (৬ আশ্বিন ১৩১৮)। দ্র. চিঠিপত্র ৪, ১৩৫০, পৃ. ৩০।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু উৎসবমূলক নাটকগুলির মধ্যে 'শারদোৎসব'ই সর্বপ্রথম রচিত (৭ ভাদ্র ১৩১৫, ৩ অগস্ট ১৯০৮)। শারদোৎসবের প্রথম অভিনয় হয় ৮ আশ্বিন ১৩১৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৮) সালে। আশ্রম বিদ্যালয়ের বালকদের সঙ্গে এই অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিক্ষকরা। রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রম্পটারের ভূমিকা। দ্র. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি। 'বিশ্বভারতী নিউজ', মে-জুন ১৯৮৬, পৃ. ২৯৫। (শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের সৌজন্যে) 'মেয়েদের দল'— অভিনয় দেখতে অন্যান্য যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতি। দ্র. সীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি' (১৩৭১), ৩৪-৩৯।

পত্র ১১। চিঠিপত্র ৩-এর প্রথম সংস্করণ থেকে এই পত্রের তারিখ গ্রহণ করা হয়েছে।

'Cookদের'— Thomas Cook and Sons নামে লন্ডনের বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানির কথা।

'সেই Astronomy'-র বই— Robert Stawell Ball (1802–1857)-এর *The Story of the Heavens* (1891)। দ্বাদশ-সংখ্যক চিঠিতে বইটির নাম উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য মীরা দেবীকে লেখা পত্রাংশ (পোস্টমার্ক ১ অগস্ট ১৯১১), 'রথী তোদের Ball-এর Astronomy পড়ে শোনাচ্চেন? ও বইটা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন আমার এত ভাল লেগেছিল যে আমার আহার নিদ্রা ছিল না'— চিঠিপত্র ৪ (১৩৫০), পৃ. ২৫।

দিনু— দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)। দিনেন্দ্রনাথ ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি সংগীতভবনের সঙ্গে যুক্ত হন। রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষাদান ও রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রণয়নে তাঁর ভূমিকার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'ফাল্গুনী' নাটকের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী' রূপে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। কিছু বিদেশী গল্পের অনুবাদ এবং বেশ-কিছু কবিতা ও সংগীতও তিনি রচনা করেছেন। এগুলি দিনেন্দ্র রচনাবলীতে (১৩৪৩) গ্রথিত। তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ১৯৩৪।

পত্র ১২। চিঠিপত্র ৩-এর প্রথম সংস্করণ থেকে এবং এর পূর্ববর্তী ১১-সংখ্যক চিঠির অনুক্রমে এই চিঠির তারিখ নির্ধারিত।

'বইখানা ...পড়েছিলুম'— ১৮৯৪-র জুনের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারির কাজে শিলাইদহে বোটে বাস করছিলেন সম্ভবত তখনই তিনি Robert Stawell Ball-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইগুলো পড়েছিলেন। রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সংবলিত Ball-এর আরো যে দুটি বই পাওয়া যায় তা হল *In Starry Realms* (1892) *Story of the Sun* (1893)।

পত্র ১৩। 'চিঠিপত্র' তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণে (১৩৪৯) এই চিঠিটির কাল লিখিত হয়েছে এইভাবে : [১৯১৫-১৯১৮]। কিন্তু চিঠিটির অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে একে ১৯১৪ সালের অক্টোবরে লিখিত বলে অনুমান

করবার কারণ আছে। 'তোমরা যখন ফিরে আস্‌বে তখন দেখ্‌তে পাবে আমি নিজের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছি'— এই কথাটির প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে যে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে তাঁদের সুরুলের বাড়িতে কিছুদিন কাটাবার পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে আসেন ৯ আশ্বিন ১৩২১ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৪), কেননা রথীন্দ্র-নাথেরা চলে যান চাঁদিপুর আর পুরীতে সময় কাটাবার জন্য। ১৬ আশ্বিন (৩ অক্টোবর) রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর উদ্দেশে একটি 'আশীর্বাদ' লেখেন তিনি, 'গীতালি'র উৎসর্গ কবিতা হিসেবে সেটি মুদ্রিত হয়েছে। এই কবিতার প্রাক্‌রূপের কয়েকটি লাইন ছিল এরকম :

আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম তারে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
জেগেছি অনেক রাত্রি ভেবেছি অনেক—
ক্ষণেক বা আশা হয়, আশঙ্কা ক্ষণেক।
হৃদয়ের তোলাপাড়া তুফানের ঢেউ—
মনে ভাবি আমি ছাড়া নাই বুঝি কেউ।
এমন করিয়া বলো কাটে কত কাল,
মাঝি যে তাহারি হাতে ছেড়ে দিনু হাল।

এই লাইনগুলির সঙ্গে আলোচ্য চিঠিটির বক্তব্যের সাদৃশ্য খুব অস্পষ্ট নয়। চিঠিতে লিখেছেন : 'আমাকে তোমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকবে না— ঈশ্বর তার থেকে আমাকে মুক্তি দেবেন। ...ঈশ্বর তোমাদের সেই পবিত্র সাধনাকে সজীব করে জাগ্রত করে রেখে দিন এই আমি কামনা করি। ...তোমাদের ঈশ্বরকে তোমাদের আপনার জীবনের আলোতে তোমাদের আপনাদের সুখদুঃখ ও ভালমন্দের সংঘাতের ভিতর দিয়ে একদিন পাবে আমাকে সে জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না— সে জন্যে আমি তাকিয়ে থাকব না।'

'আশীর্বাদ' কবিতাটির শেষ অংশ ছিল :

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।

এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও চিন্তা তাহে নাই;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

চিঠিতে ব্যক্ত মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয় রথীন্দ্রনাথের কাছে লেখা কবির একটি তারিখহীন চিঠি। দ্র. চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ. ২৭-৩২।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় এন্ড্রুজের কাছে লেখা তারিখ চিহ্নিত দুটি চিঠির এই অংশগুলি : 'It seems as though I am coming out of the mist once more, and I am trying to throw off my shoulders the burden that has been oppressing me all these days' (4 October 1914) এবং 'My period of darkness is over once again, ...preaching I must give up, and also trying to take up the role of a beneficent angel to other. I am praying to be lighted from within, and not simply to hold a light in my hand.' *Letter to a Friend*, 1928, p. 47।

'বেলা নিশ্চয়ই ভালই আছে ভালই থাক্‌বে'— পারিবারিক কোনো অশান্তির কারণে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে চলে যান ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে। এর পর তাঁরা বসবাস করতে থাকেন এন্টালির ২৭/১ ডিহি শ্রীরামপুর রোডে। সেই সময় থেকে, সম্পর্কগত জটিলতার জন্য রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই বেলাকে নিয়ে উদ্‌বেগে থাক্‌তেন।

পত্র ১৪। বুদ্ধগয়ার ভ্রমণ প্রসঙ্গ থেকে চিঠির তারিখ অনুমিত। 'গীতালি'র ৮১-৮৪ সংখ্যক গানগুলি রচিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে ২১ আশ্বিন ১৩২১, অর্থাৎ ৮ অক্টোবর ১৯১৪। ৮৫-৮৯ সংখ্যক গানগুলির রচনাস্থান বুদ্ধগয়া, ২৩ আশ্বিন বা ১০ অক্টোবর।

পত্র ১৫। ১৯১৬ সালের ৩ মে কবি কলকাতা থেকে জাপানের উদ্দেশে রওনা

হয়েছিলেন জাপানি জাহাজ 'তোসা মারু'-তে। তিনি রেঙ্গুনে পৌঁছেছিলেন ৭ মে অপরাহ্ণে এবং সেখান থেকে পেনাঙ অভিমুখে রওনা হন ৯ মে রাত্রে। এই সূত্র থেকে এই চিঠির তারিখ নির্ধারিত।

'কাল এখানে...হয়ে গেল'— এ সম্পর্কে কবি মীরা দেবীকে লিখছেন, 'আজ বিকেলে এখানকার জুবিলি হলে সকলে মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে— বিষম একটা হট্টগোল বাঁধাবে। কোনো উপায় নেই— চুপ করে সইতে হবে। চুপ করে সইতে হলেও বাঁচতুম— কিছু না বলেও চলবে না। সেদিন এত বড় একটা ঝড় গেল তারপরে আবার এই হাঙ্গাম— এ সাইক্লোনের বাড়া।'— চিঠিপত্র ৪, পৃ. ৭২।

এই সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা' শীর্ষক বিবরণ থেকে জানা যায়— 'রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্রই অভ্যর্থনা কমিটির সভ্যগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলী দলবদ্ধ হইয়া কয়েকখানি মোটরগাড়ীর সহিত মিছিল করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী নির্দিষ্ট বাসস্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যান। পথে বর্ম্মিজ, মান্দ্রাজী, মারাঠা, পার্সী, বাঙ্গালী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোকে "বন্দেমাতরম্" "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী জয়" শব্দে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পরদিন অপরাহ্ণে স্থানীয় জুবিলি হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। প্রায় চারি সহস্র লোক এই অভ্যর্থনা সভায় যোগদান করিয়াছিল। জুবিলি হলে এরূপ জনতা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। ... অভিনন্দন পত্র দুইখানি ব্রহ্মদেশীয় শিল্পীর কারুকার্য্য শোভিত দুইটি রজত আধারে কবিবরকে প্রদান করা হয়।' প্রবাসী ১৩২৩, আষাঢ়, পৃ. ২১৫-১৬।

'ঝড়ের বর্ণনা'— এই ঝড়ের বর্ণনা 'সবুজপত্র', জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩-এ প্রকাশিত 'জাপান-যাত্রীর পত্র'-তে বিধৃত ও পরে 'জাপান-যাত্রী' (১৩২৬) গ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ১৬। জাপানের কোবে বন্দর থেকে লিখিত। ২২ জ্যৈষ্ঠ তারিখেই কোবে থেকে লিখিত হয়েছে 'জাপান-যাত্রী'-র ২৩-সংখ্যক পত্র।

পত্র ১৭। ইয়োকোহামা থেকে কবি ২০ জুলাই (১৯১৬) প্রমথ চৌধুরীকে যে

পত্র লেখেন, (চিঠিপত্র ৫, পৃ. ২১৫) সেই সূত্রে এই চিঠির কাল অনুমিত। এই সময়ে তিনি জাপানি ধনী বণিক ও শিল্পরসিক সানকেই হারাসানের অতিথি হয়ে ছিলেন।

'অন্তত নন্দলালের এখানে আসা নিতান্ত আবশ্যক'— রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছে পরে পূর্ণ হয়েছিল। ১৯২৪ সালে তাঁর চীনজাপান ভ্রমণের সময়ে সঙ্গী নিতে পেরেছিলেন নন্দলাল বসুকে।

বাঁদরটা— কবির সঙ্গী তরুণ শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে।

'আমি সম্ভবত ... ছাড়ব'— প্রকৃতপক্ষে কবি ২ সেপ্টেম্বর (দ্র. এই সংকলনের ১৮-সংখ্যক পত্র) জাপান থেকে আমেরিকা রওনা হন 'কানাডা মারু' জাহাজে। আমেরিকার সিআটলে তিনি পৌঁছন ১৮ সেপ্টেম্বর। Sujit Mukherjee, *Passage to America,* 1964, p. 211

পত্র ১৮। আমেরিকায় পাড়ি দেবার প্রসঙ্গটি থেকে বোঝা যায়, এ চিঠির তারিখ ৮ অগস্ট ১৯১৬ (১৩২৩)-এর পরিবর্তে ভুল করে ১৯২৩ লেখা হয়েছে।

পত্র ১৯। 'মীরার খুকী হওয়ার'— মীরা দেবীর একমাত্র কন্যা নন্দিতার জন্ম ২৮ আষাঢ় ১৩২৩, ১২ জুলাই ১৯১৬, বুধবার।

'খোকার জন্যেও'— মীরা দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথের কথা। 'বিচিত্রার কাজ'— প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রাসভা' বাংলাদেশের সংস্কৃতিচর্চার একটি প্রধান স্থান হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের যৌথ উদ্‌যোগে ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়ে ও বধূদের ঘরোয়াভাবে উন্নত আদর্শে চিত্রকলা, সাহিত্য ও সাধারণ শিক্ষাচর্চার জন্য গৃহ বিদ্যালয় 'বিচিত্রা' স্থাপিত হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির বাইরে থেকেও দু-একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা চিত্রকলার পাঠ নিতে এখানে যোগ দিয়েছিলেন। পরে এর সম্পূর্ণ নাম হয় 'Bichitra Studio for Artists of the New-Bengal School'। 'বিচিত্রা'য় চিত্রকলা-শিক্ষণের ভার ছিল শিল্পী নন্দলাল বসুর, সাহিত্য-শিক্ষার ভার শান্তিনিকেতন থেকে আগত শিক্ষক অজিত কুমার চক্রবর্তীর

এবং সাধারণ শিক্ষার ভার ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর। রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক উদ্‌যোগে 'বিচিত্রা' গৃহ বিদ্যালয়ের সীমা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের শিল্প ও সাহিত্যচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব গ্রন্থাগারের সব বই এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগারের প্রচুর বই নিয়ে গড়ে ওঠে 'বিচিত্রা'র সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। একে একে শিল্পী অসিতকুমার হালদার, মুকুলচন্দ্র দে, জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাই 'বিচিত্রা'র সঙ্গে যুক্ত হন। 'বিচিত্রা'র চিত্রকলা শিক্ষণের পরিপূরক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধটি। 'বিচিত্রাসভা'র উদ্‌যোগে গড়ে ওঠে একটি গ্রাম্য শিল্প সংগ্রহশালা। এই সভার প্রেরণাতেই রচিত হয় অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' পুস্তিকাটি। 'বিচিত্রা'র সাহিত্যসভায় যোগ দিতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সে যুগের অনেক বিশিষ্ট গুণী মানুষেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই পত্রাংশ, ১৯১৮ : 'বিচিত্রায় শরৎ চাটুজ্যে যে গল্প পড়েছিলেন সে ত নেহাৎ মন্দ হয় নি। আমার ত বোধ হয় অধিকাংশ শ্রোতারই ভাল লেগেছিল। পরশু বুধবারে শাস্ত্রীমশায়কে আগে থাকতে বলা হয়েচে নইলে এইবার দিনুকে নিয়ে একটু গানবাজনার আয়োজন করা যেত।'

'এখানকার একজন আর্টিস্ট'— জাপানি চিত্রশিল্পী কাম্পো আরাই (১৮৭৯-১৯৪৫)। তিনি ছিলেন ওকাকুরা-প্রতিষ্ঠিত জাপানি শিল্পসভার সদস্য। ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানি শিল্প রসিক হারাসানের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তখন বিখ্যাত শিল্পী টাইকানের মারফত ১৬ মে আরাই-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শিল্পশিক্ষক হিসেবে আরাই ১৯১৬-র নভেম্বরে এদেশে আসেন ও দু বছর এখানে থাকেন। এখানে থেকে তিনি একদিকে যেমন নন্দলাল প্রভৃতিকে হাতে-কলমে জাপানি পদ্ধতিতে কালি-তুলির ব্যবহার শেখান অন্য দিকে অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ভারত-শিল্পের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, ভারতের বৌদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শনগুলো পরিদর্শন করেন এবং অজন্তা গুহার অনেক চিত্রের নকল করেন।

তৎকালীন শিল্পীদের ওপর আরাই-এর শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব সম্পর্কে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'কম্পু আরাই-এর আঙ্গিকগত দক্ষতা ছিল যথেষ্ট। কম্পু আরাই-এর প্রভাবেই সম্ভবত গগনেন্দ্রনাথ কালি-তুলির কাজ শুরু করেন। করণ-কৌশলের মার প্যাঁচ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কখনো মাথা ঘামান নি। এই নূতন পরিবেশেও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অনেক পরিমাণে উদাসীন। জাপানি শিল্পের এই আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নন্দলাল ও গগনেন্দ্রনাথের সূত্রে আধুনিক শিল্পে আত্মপ্রকাশ করে। তবে নন্দলালের হাতে এই নূতন প্রভাব নন্দলাল-প্রবর্তিত শিক্ষানীতিকেও অনেক পরিমাণে চালিত করেছিল।' বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, 'চিত্রকথা' (১৯৮৪), পৃ. ১৩৩।

১৯২৩ সালে জাপান ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ কাম্পো আরাইকে একটি রেশমী কাপড় উপহার দেন। তিনি তাতে কালো কালি ও ব্রাশে শাক্যমুনির চিত্র রচনা করেন। ১৯৮৯ সালে আরাই পরিবারের লোকেরা এই চিত্রটি বিশ্বভারতীকে উপহার দেন।

জাপানি আর্টিস্ট প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবীর এই পত্রে যে উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে তুলনীয় রথীন্দ্রনাথকে লেখা (২২ অগস্ট ১৯১৬) রবীন্দ্রনাথের পত্র : 'দু তিন মাস পরে "আরাই" বলে এখানকার একজন ভাল আর্টিস্ট কলকাতায় যাবেন। তাঁকে অন্তত ছমাসের জন্যে বিচিত্রায় রাখবার বন্দোবস্ত করিস। নতুন বাড়ীর একটা কোণের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিস্ আর খাওয়া তোদের সঙ্গেই চল্‌বে। মাসে ১০০ টাকা মাইনে দিতে হবে। অবনকে বলিস্ ছ মাসের ছশো টাকা বেশি কিছু নয় কিন্তু নন্দলালরা যদি এঁর কাছ থেকে খুব বড় আয়তনের পটের উপর জাপানি তুলির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেড়ে উঠবে, এঁর ইচ্ছা ইনি ভারতবর্ষীয় ছবি আঁকাই ওর জীবনের ব্রত করবেন। ... যদি ওঁকে তোদের পছন্দ হয় তাহলে একবছর কিম্বা দুবছর রাখতে পারিস— তাহলে ছেলেরা সবাই তুলি ধরতে ওস্তাদ হয়ে উঠবে।' চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ. ৪৮-৪৯।

পত্র ২০, ২১, ২২। ২১-সংখ্যক পত্রের সঙ্গে ২০ ও ২২ সংখ্যক পত্র দুটির বিষয়-

গত যোগসূত্র লক্ষ করে তিনটি চিঠিই কাছাকাছি সময়ে এবং একই উপলক্ষে লেখা বলে অনুমিত। তাই ২১ সংখ্যক পত্রের কাল অনুযায়ী ২০ ও ২২-সংখ্যক পত্রের কাল অনুমিত। অবশ্য ২০, ২১ ও ২২ সংখ্যক চিঠি তিনটি আদৌ প্রতিমা দেবীকে লিখিত কি না এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ এই সংকলনের অন্য সব চিঠির থেকে এই তিনটি চিঠির সম্বোধন ভিন্নতর। তা ছাড়া প্রতিমা দেবীর মা বিনয়িনী দেবীর মৃত্যুতে কবি যে চিঠিটি লেখেন (পত্র ২৭) তার সঙ্গে এই চিঠিগুলোর কোনো ভাবগত সাদৃশ্য নেই— ২০, ২১ ও ২২-সংখ্যক চিঠি তিনটি যেন কাছের মানুষের কাছে লেখা নয়, কোনো দূরের মানুষের কাছে লেখা নৈর্ব্যক্তিক চিঠি। কিন্তু এই তিনটি চিঠির প্রাপক আর কে হতে পারেন তা এখনও নির্ধারণ করা যায় নি। প্রতিমা দেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্য সব চিঠির সঙ্গেই এই চিঠি তিনটিও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে একই ফাইলে সংরক্ষিত ছিল। তা ছাড়া ২১ ও ২২-সংখ্যক চিঠি দুটি রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী বেঁচে থাকতেই প্রতিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি হিসেবে চিঠিপত্র ৩-এর প্রথম সংস্করণে (১৩৪৯) মুদ্রিত হয়েছিল বলে আপাতত এই সংকলনেরও অন্তর্গত হল।

পত্র ২৩। 'আমি বহুকাল ... বেঁচেচি।' সময়ের দিক থেকে যে কবি অনেক কাল পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন তা নয়। জাপান-আমেরিকা ভ্রমণ-শেষে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ১৩ মার্চ ১৯১৭। সেই থেকে নানা কাজের তাগিদে তাঁকে বার বার কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে হয়, আর এই কাজগুলো ছিল কবি মনের পক্ষে অশান্তিকর। মাদ্রাজ সরকারের দ্বারা অ্যানি বেসান্তের অন্তরীণ এবং কংগ্রেসের ভাবী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন— এ নিয়ে জুন থেকে অক্টোবরের প্রথমভাগ পর্যন্ত কলকাতায় রাজনৈতিক তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কবি এ-সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অ্যানি বেসান্তের অন্তরীণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে কবির প্রতিবাদ, রামমোহন লাইব্রেরি হলে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ পাঠ (৪ অগস্ট), 'বেঙ্গলি'

পত্রিকায় কবির খোলা চিঠি (৭ সেপ্টেম্বর), জোড়াসাঁকোয় রাজনৈতিক বৈঠক (৮ সেপ্টেম্বর), আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হতে কবির সম্মতি ও পরে প্রয়োজন না থাকায় পদত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহে কবি মন বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া নানা রকম সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানে, যেমন ১৫ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিসভা, ২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী, শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে পারিতোষিক প্রদান ইত্যাদি উপলক্ষে ভাষণদানেও কবিকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এর পর জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে দুই দিনব্যাপী (১০ ও ১১ অক্টোবর) 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থাপনায় ও অভিনয়ে অংশগ্রহণে কবিচিত্ত অধিকৃত। এইভাবে পর পর বিচিত্র কর্মজালে বদ্ধ থাকার পর শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ফিরে এসে কবি এই চিঠি লেখেন।

এই পত্রের সঙ্গে তুলনীয় শিলাইদহ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬তে এন্ড্রুজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র : 'Coming away from Calcutta, I have come to myself. Every time it is a new discovery to me. In the town, life is so crowded that one loses the true perspective. After a while it makes me feel weary of everything, simply because the truth of our own self is lost sight of'– *Letters to a Friend* 1928, p. 72.

'বিচিত্রা'য় ডাকঘরের প্রথম দিনের অভিনয় আয়োজিত হয়েছিল বিচিত্রার সদস্যদের জন্য— দ্বিতীয় দিনের অভিনয় হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য, অ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অসিত হালদার, আশামুকুল দাশ প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছিলেন।

পত্র ২৪। 'বর্ষারম্ভের উৎসব'— এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তা 'নববর্ষ' নামে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৬) প্রকাশিত হয়।

পত্র ২৫। চীন ভ্রমণ উপলক্ষে সিঙ্গাপুর থেকে হংকং যাওয়ার পথে জাপানি জাহাজ 'আতাসুতা মারু' থেকে লিখিত।

পত্র ২৬। চীন যাত্রার পথে মালয়ের পেনাঙ বন্দর থেকে লিখিত। 'আজ পেনাঙে পৌঁচেছি' কথাটির থেকে এ-চিঠির কাল নির্ধারিত।

'একজন মাদ্রাজী'— স্থানীয় অ্যাডভোকেট পি. কে. নাম্বায়ার।

'তার মধ্যে দুটো লিখে ফেলেচি'— কবির অন্যতম সঙ্গী কালিদাস নাগের দিনলিপি ('কবির সঙ্গে একশো দিন', ১৩৯৪) থেকে জানা যায় যে অন্তত এর প্রথমটি ২৭ মার্চের আগেই লেখা হয়ে গেছে। ওই তারিখে কালিদাস নাগ লিখছেন, 'কবির সঙ্গে তাঁর প্রথম চীন বক্তৃতা পড়ে ফেলা গেল'।

'তাকে "মানে না মানা" গান শোনাবার'— 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটকের অন্তর্গত গান 'ও যে মানে না মানা'।

পত্র ২৭। 'মাঠের ধারে'— তখন উত্তরায়ণ এলাকার উত্তর দিকে ছিল খোলামাঠ। নির্মীয়মাণ 'উদয়ন' বাড়িটির কথাই কবি বলতে চেয়েছেন।

পত্র ২৮। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়োনেস আইরিস থেকে এই চিঠিটি লিখিত। এই প্রসঙ্গে কবির এই সময়কার ভ্রমণসূচি স্মরণযোগ্য। চীন-জাপান ভ্রমণের শেষে কবি কলকাতায় পৌঁচেছিলেন একুশে জুলাই (১৯২৪)। এর পর পেরুর স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে কবি প্রথমে ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হন ১৯-এ সেপ্টেম্বর। এই যাত্রায় প্যারিস পর্যন্ত কবির সঙ্গী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও পুপে। তার পর লন্ডন থেকে এলমহার্স্ট এসে কবির সঙ্গে মিলিত হন। এলমহার্স্টকে নিয়ে কবি শেরবুর্গ বন্দর থেকে 'আন্ডেস' জাহাজে পেরুর উদ্দেশে যাত্রা করেন ১৮ অক্টোবর।

'এখানকার একজন মহিলা... দিয়েচেন'— এই মহিলা স্পেনীয় লেখিকা, রবি অনুরাগিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। কবি এঁর নামকরণ করেছিলেন 'বিজয়া'। কবির 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থটি এঁরই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। উল্লিখিত বাগানবাড়িটির নাম মিরালরিও। কবির অসুস্থতার জন্য ভিক্টোরিয়া এখানে কবির থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বাগানবাড়িটি তাঁর নিজের ছিল

না— এটি তাঁর এক আত্মীয়ের।

'ডিসেম্বর ... হব'— অসুস্থতার জন্য কবির শেষ পর্যন্ত পেরু যাওয়া হয় নি।

পত্র ২৯। 'হিজিবিজি বিদ্যা' স্বরচিত লেখা সংশোধন করে কবি কাটাকুটির মধ্য দিয়ে তার যে চিত্ররূপ দিতেন তারই উল্লেখ।

'ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি... সেটা কবিতায়'— এই কবিতাটির প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'পূরবী' কাব্যের 'তৃতীয়া' (৪ ডিসেম্বর) কবিতাটি। কবিতাটির তারিখ থেকে এবং 'ডিসেম্বরের পয়লা থেকে এখানে গরম পড়েচে' কথাটির থেকে এই চিঠির সময় অনুমান করা যায়। পুপে প্রসঙ্গে 'পূরবী'-র আরো কটি কবিতা দ্রষ্টব্য : 'বিরহিণী' (২০ ডিসেম্বর)। আরো দ্রষ্টব্য 'বীথিকা'র সংযোজনে 'পুপুদিদির জন্মদিনে' (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)।

'তৃতীয়া' কবিতাটি যেভাবে রচিত হয়েছিল, 'পূরবী'-তে ঠিক সেইভাবে মুদ্রিত হয় নি। শেষ দুটি স্তবকে অনেকখানি বদল এবং অন্য স্তবক-গুলিতেও অল্প অল্প পরিমার্জনা লক্ষ করা যায়। মূল পাঠটি এখানে দেওয়া হল :

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে?
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন-হাওয়ার দান
বসন্ত তার দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান;
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে পালিয়ে সে যায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক্, অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মাণিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলা,
হৃদয়টি ওর হোক্ না কঠোর, মিষ্টি ত ওর গলা॥

আলো যেমন চম্‌কে বেড়ায় আম্‌লকির ঐ গাছে

তিন বছরের প্রিয়া আমারে দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে এসে বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন বছরের দোল।
তবু, ক্ষণিক রঙ্গ-ভরে হৃদয় করি' লুট
নাচের পালা ভঙ্গ করে' কোন্‌খানে দেয় ছুট।
আমি ভাবি, এইবা কি কম, প্রাণে ত ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হোক্ আমার ত মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলেম, মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা ত আছে॥

বন্দী হ'তে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
শরৎ প্রভাত দিয়েছে ওর সর্ব্ব দেহে মেলে'
শিউলি ফুলের তিন বছরের পরশখানি ঢেলে'।
বুঝতে নারি তবু কেন আমার বেলায় ফাঁকি
ভরা নদীর জোয়ার জলে কলস ভরে না কি?

তবু ভাবি, বিধি আমার নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা, তার ত আছে দাম।
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে॥

কবি বলে' লোকসমাজে আছে আমার ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
যাই হোক মোর কীর্তিকলাপ ওর কাছে নাই মান,
আজ বসেছি তারি দিতে উচিত প্রতিদান।
কেমনে যে ওর মনের গতিক জানবে বিশ্বজনে,
এই কবিতা বুঝবে যখন লাগ্‌বে সরম মনে।

ওর আছে এক বাঁদর ছানা, আর আছে এক পুসি,
ঝগড়ু বোকার সঙ্গ পেলে হয় কি বিষম খুসি।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি'॥

বয়স হলে ইচ্ছা হবে আকাশ পানে চেয়ে,
আবার হতে কবির প্রিয়া, তিন বছরের মেয়ে।
ইচ্ছা হবে, কালো তাহার তরল চাহনীতে
শ্রাবণ মেঘের তিন বছরের সজল ছায়া নিতে।
ইচ্ছা হবে ছন্দে আমার গড়তে নাচের ছাঁদ,
জলের ঢেউয়ের তালে যেমন দোলায় ছায়ার চাঁদ।
সাঁওতালিনী, নেপালিনী, সঙ্গী তাহার নানা,
ছাগল বাছুর ভোঁদা কুকুর বাঁদর বেড়ালছানা,
ঝগড়ু বোকা, বুড়ো মালী, বজায় রইবে সবে,—
কবির বিশ্বে ছোট বড় সবারি ঠাঁই হবে॥

পত্র ৩০। পত্রটি চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ থেকে লিখিত। ১৯২৬-এর ইউরোপ ভ্রমণের পথে কবি প্রাগে ছিলেন ৯ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। এখানে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে ১২ অক্টোবর চেক ভাষায় ও ১৩ অক্টোবর জার্মান ভাষায় 'ডাকঘর' নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কবির ভ্রমণসঙ্গী নির্মলকুমারী মহলানবিশ লেখেন, 'রসটকে এবং আরো দু একটা শহরে জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয় করেছিল কবিকে দেখাবার জন্যে। মনে আছে পোশাক ইত্যাদি আমাদের দেশের মতো করবার চেষ্টা করলেও চামড়ার রং বদল করবে কেমন করে? তাই যখন খালি গায়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে দইওয়ালা অমলের ঘরের সামনে দিয়ে 'চাই দই, দই চাই' হেঁকে যাচ্ছে তখন আমার খুব মজা লেগেছিল। ...অভিনয় যে খুব ভালো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবি খুশি হয়েছিলেন ওদের করা ডাকঘর দেখে।' নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে', ১৩৭৬, পৃ. ১৯৮-৯৯।

পত্র ৩১। কবি প্রাগ থেকে ভিয়েনায় যান ১৫ অক্টোবর। কিন্তু ১৬ তারিখ সকাল থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন ড: ওয়েঙ্কেবাকের পরামর্শ অনুযায়ী এক সপ্তাহের জন্য সমস্ত বক্তৃতা বাতিল করে দেওয়া হয়। কবি ভিয়েনায় থাকেন ১৫ থেকে ২৫-এ অক্টোবর পর্যন্ত, বুডাপেস্টে যান ২৬-এ। শারীরিক কারণে কবির রাশিয়া ভ্রমণের কার্যসূচীও বাতিল হয়ে যায়।

'রথীর শরীরের উপর দিয়ে'— আন্ত্রিক জটিলতা ও অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য বার্লিনে ২০ সেপ্টেম্বর রথীন্দ্রনাথের শরীরে একটি বড়ো রকমের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। দ্র. নির্মলকুমারী মহলানবিশ, 'কবির সঙ্গে য়ূরোপে', ১৩৭৬, পৃ. ২৮২-৮৩।

পত্র ৩২। চিঠিটি ভিয়েনা থেকে লিখিত। অ্যালবার্ট কাহ্‌ন তৎকালীন ফ্রান্সের বিখ্যাত ধনী, শিল্পরসিক গুণগ্রাহী, অতিথিবৎসল সদাশয় ব্যক্তি। ১৯২০-২১ সালে ও ১৯২৬-এর জুলাই মাসে ইউরোপ ভ্রমণের কবি প্যারিসের শহরতলীতে কাহ্‌নের বিখ্যাত অতিথিশালা 'Autour de Monde'-তে বাস করেছিলেন।

পত্র ৩৩। এই চিঠি ও পরবর্তী কয়েকটি চিঠি ১৯২৭ সালে কবির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে ভ্রমণ উপলক্ষে লিখিত। যাত্রাপথে কবি সিঙ্গাপুরে পৌঁছে সেখানকার গভর্নরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন ২০ জুলাই। এই সূত্রে চিঠিটির তারিখ নির্ধারিত।

কবির ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বালি, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বিকীর্ণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও শিল্পকলার উপাদান সংগ্রহ। কবির সঙ্গী ছিলেন শান্তিনিকেতনের শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর ও ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীদের নিয়ে কবি কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যাত্রা করেন ১২ জুলাই (১৯২৭), মাদ্রাজ থেকে রওনা হন ১৪ জুলাই। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে কবির ভ্রমণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে অধ্যাপক আরিয়াম উইলিয়মস্‌ ও সংগীতজ্ঞ আর্নল্ড বাকে সস্ত্রীক আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

'চিঠির নাম দিয়ে'— এই সময়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় কবির জাভা ভ্রমণের বিবরণ 'জাভাযাত্রীর পত্র' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। বর্তমান সংকলনের ৩৬, ৩৮, ৩৯ ও ৪০-সংখ্যক পত্র 'বিচিত্রা' পত্রিকায় যথাক্রমে অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন (১৩৪৪) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই চারিটি চিঠি 'যাত্রী' গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'কুমুদিনীর... পরিচয়'— 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নায়িকা কুমুদিনী। এই উপন্যাসটির রচনা শুরু হয়েছিল মে-জুন (১৯২৭) মাস থেকে। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'যোগাযোগ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৪৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত। প্রথম দুটি সংখ্যায় এর নাম ছিল 'তিন পুরুষ'। পরে নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'। গ্রন্থাকারে এর প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬ সালে।

পত্র ৩৪। 'ভারতবর্ষের কাগজে'— ১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণের সময়ে কবি ইংরেজ-নিযুক্ত শিখ সিপাহীর দ্বারা জনৈক চীনবাসীকে নিগৃহীত হতে দেখে বহির্ভারতে ভারতীয় সৈন্যনিয়োগের বিরুদ্ধে 'শূদ্রধর্ম' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২) প্রবন্ধটি রচনা করেন। এর ইংরেজি অনুবাদ 'The Sudra Habit' 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ ১৯২৭-এ (পৃ. ২৭৩-৭৫)। কবির মালয় ভ্রমণের সময়ে 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিকৃত তথ্য পরিবেশিত হয় সিঙ্গাপুরের গ্র্যানভিল রবার্টস্ -সম্পাদিত 'মালয় ট্রিবিউন' পত্রিকাটিতে— 'Dr Tagore's Politics' এই নামে ২ অগস্টের সম্পাদকীয় নিবন্ধে। এর পর 'মালয় ট্রিবিউনের' দুরভিসন্ধিমূলক তথ্য বিকারকে নিন্দা করে একটি জোরালো লেখা প্রকাশিত হয় ওখানকার স্থানীয় ভারতীয় সংবাদপত্র 'মালয়ান ডেইলি এক্সপ্রেসে'। এই লেখায় 'Anti Tagore bubble pricked— an object lesson in dishonest journalism— mischievous propaganda exposed'— এই-সব কড়া মন্তব্য করা হয় ঐ কাগজের ৬ অগস্টের সংখ্যায়। দ্র. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০), পৃ. ২০৪-০৮।

একই দিনে (৬ অগস্ট) কবি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'খুব সমারোহ চল্‌চে। এতটা যে হতে পারে তা মনেও করি নি— এখানকার প্রতিকূল

পক্ষের কেউ কেউ সেজন্যে ঈর্যান্বিত। তারাই চক্রান্ত করে আমার সেই চীনে সেনা পাঠানোর প্রতিবাদ নিয়ে গোলমাল করচে। তাতে কিছু ক্ষতি হয়েচে সন্দেহ নেই।'

'একজন ফিরিঙ্গি এডিটর'— 'মালয় ট্রিবিউন' কাগজের সম্পাদক গ্র্যানভিল রবার্টস্।

পত্র ৩৫। 'বাকে এখানে ... যেতে'— ডাচ সংগীত বিশারদ আর্নল্ড বাকে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে গবেষণার জন্য কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ভ্রমণে সহায়তার জন্য বাকে দম্পতি আগেই এসে জাভায় পৌঁছেছিলেন। জাভা থেকে তিনি এসেছেন সুমাত্রায়। উল্লেখ্য, এই প্রসঙ্গে কবি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন 'বাকে সুমাত্রায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেচে। তার কাছে যা খবর শোনা গেল তাতে বোঝা যাচ্চে জাভায় সমস্ত বন্দোবস্ত বেশ ভালোই হয়েচে। ...বাকে সেখানে আমাদের আগে যাওয়াতে অনেক সুবিধে হয়েচে। ওখানে কম্যুনিস্ট উৎপাতে সেখানকার গবর্মেন্ট উতলা হয়ে আছে। বাকে আমাদের সঙ্গে থাকাতে ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এখানকার কাজ শেষ হলেই বাকে দম্পতি শান্তিনিকেতনে ফিরবে।'

পত্র ৩৬। 'তার ... হবে না'— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০) গ্রন্থটিতে (পরিবর্ধিত রূপ : 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম দেশ' ১৩৭১) এই ভ্রমণের এক বিশদ ও সরস বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

'এই ভাবটাকে ... লিখেচি'— উদ্ধৃত কবিতাটি 'নূতন কাল' নামে 'পরিশেষ' (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

চিঠিটি 'যাত্রী' (১৩৩৬) গ্রন্থের 'জাভাযাত্রীর পত্র' অংশে নবম রচনা হিসেবে মুদ্রিত আছে।

পত্র ৩৮, ৩৯, ৪০। এই চিঠিগুলিও 'জাভাযাত্রীর পত্র'-র ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং অষ্টাদশ রচনা হিসেবে মুদ্রিত।

'বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে কবিতা'— 'বোরোবুদুর' কবিতাটি 'পরিশেষ' (১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।

পত্র ৪১। 'কাল যে কবিতা লিখেচি'— পত্রে উদ্ধৃত কবিতাটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৪-এ 'বালী' শিরোনামে মুদ্রিত হয় ও পরে 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে 'সাগরিকা' নামে প্রকাশিত হয়।

'বোরোবুদুর' কবিতার ইংরেজিটা— এটি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে অক্টোবর ১৯২৭-এ মুদ্রিত হবার পর 'Boro-budur' নামে *Collected Poems and Plays* (1936) গ্রন্থে সংকলিত হয়, p. 451। অনুবাদে কবিতাটি এইরকম :

The sun shone on a far-away morning, while the forest murmured its hymn of praise to light; and the hills, veiled in vapour, dimly glimmered like earth's dream in purple.

The King sat alone in the coconut grove, his eyes drowned in a vision, his heart exultant with the rapturous hope of spreading the chant of adoration along the unending path of time :

'Let Buddha be my refuge.'

His words found utterance in a deathless speech of delight, in an ecstasy of forms.

The island took it upon her heart; her hill raised it to the sky.

Age after age, the morning sun daily illumined its great meaning.

While the harvest was sown and reaped in the near-by fields by the stream, and life, with its chequered light, made pictured shadows on its epochs of changing screen, the prayer, once uttered in the quiet green of an ancient

morning, ever rose in the midst of the hide-and-seek of tumultous time :

'Let Buddha be my refuge.'

The King, at the end of his days, is merged in the shadow of a nameless night among the unremembered, learning his salutation in an imperishable rhythm of stone which ever cries :

'Let Buddha be my refuge.'

Generations of pilgrims came on the quest of an immortal voice for their worship; and this sculptured hymn, in a grand symphony of gestures, took up their lowly names and uttered for them :

'Let Buddha be my refuge.'

The spirit of those words has been muffled in the mist in this mocking age of unbelief, and the curious crowds gather here to gloat in the gluttery of an irreverant sight.

Man today has no peace,— his heart arid with pride. He clamours for an ever-increasing speed in a fury of chase for objects that ceaselessly run, but never reach a meaning.

And now is the time when he must come groping at last to the sacred silence, which stands still in the midst of surging centuries of noise, till he feels assured that in an immeasurable love dwells the final meaning of freedom, whose prayer is :

'Let Buddha be my refuge.'

মুদ্রিত অনুবাদের পাদটিকায় লেখা ছিল 'Boro-budur is the great Buddhist Stupa built on a hill-top in the island of Java'।

পত্র ৪২। পত্রটি পেনাঙ থেকে লিখিত। কবি শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে পৌঁছেছিলেন ৮ অক্টোবর (১৯২৭)।

পত্র ৪৩। 'আমার এ চিঠি ... পারো'— অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে ১৯২৮ সালের মে মাসে কবির ইউরোপ-যাত্রার কথা ছিল। তা ছাড়া চিকিৎসার জন্য অসুস্থ রথীন্দ্রনাথও প্রতিমা দেবী ও পুপেকে নিয়ে মাদ্রাজ বা কলম্বো থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইউরোপ যাত্রা করবেন ঠিক ছিল। কলম্বোতে কবির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁরা আগে থেকে কোডাইকানালে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। পত্রটি শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত।

'বীরলার টাকা'— কবির ইউরোপ ভ্রমণের জন্য যুগলকিশোর বিড়লার প্রদত্ত টাকা। এর আগে কবির জাভা ও বালী ভ্রমণের জন্য তিনি দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। দ্র. চিঠিপত্র ১২, পৃ. ৪৮৬।

পত্র ৪৪। শেষ পর্যন্ত শারীরিক কারণে এবারে কবির ইউরোপ-যাত্রা স্থগিত থাকে। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চিকিৎসার জন্য রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী পুপেকে নিয়ে ১৭ মে কলম্বো থেকে ইউরোপ যাত্রা করেছেন। 'আপাতত অ্যাডিয়ারে আশ্রয় নিয়েছি।' শারীরিক কারণে কবির ইউরোপ যাওয়া হল না জানতে পেরে অ্যানি বেসান্ত কবিকে বিশ্রামের জন্য অ্যাডিয়ারে নিয়ে আসেন। কবি আর তাঁর সঙ্গীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্লাভাৎস্কি হাউসে। এই চিঠিটা যেদিন লেখা হয় সেদিনই সন্ধ্যায় অ্যানি বেসান্ত কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করেন।

'ইতিমধ্যে নীলগিরিতে ... নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে'— নীলগিরির অন্যতম শৈলাবাস কুন্নুরে কবির অভিজ্ঞতা বিষয়ে দ্রষ্টব্য নির্মলকুমারী মহলানবিশ রচিত 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' (১৩৬৩)।

'জন্মদিন খুব ঘটা করেই...'— বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর আহ্বানে পঁচিশে বৈশাখ জোড়াসাঁকো বিচিত্রাভবনে যে জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়, তার সমারোহের একটি অংশ ছিল তুলাদান। 'কবির ওজনের

পরিমাণে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থরাজি নানা পাবলিক লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানে দান করিবার জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছিল।' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৯৭, পৃ. ৩৪৭)।

পত্র ৪৫। 'পণ্ডিচেরিতে ... দরকার'— কিছুদিন বিশ্রামের পর কবি আর-একবার ইউরোপ যাত্রার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যাত্রা করেন ২৮ মে। পথে অরবিন্দের সঙ্গে পণ্ডিচেরিতে তাঁর সাক্ষাৎকার হয় ২৯ মে (১৯২৮)। এই সাক্ষাৎকারে কবিচিত্ত অভিভূত হয় এবং সেদিনই তিনি 'অরবিন্দ ঘোষ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। এটি প্রবাসীতে শ্রাবণ ১৩৩৫-এ প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা কবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও লিখে জানান কলম্বো থেকে। দ্র. চিঠিপত্র ১২, ৯০-সংখ্যক পত্র ও পত্র-পরিচয়।

পত্র ৪৭। 'বৃক্ষরোপণের ইতিহাসটা তোমাকে লিখতে...'— ১৪ জুলাই (১৯২৮) তারিখে 'বৃক্ষরোপণ' অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথম সেই অনুষ্ঠান সভায় পঞ্চভূতের রূপ গ্রহণ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বিশী (ক্ষিতি), সুধীর খাস্তগীর (অপ্), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (তেজ), মনোমোহন দে (মরুৎ), অনাথনাথ বসু (ব্যোম)। বৃষবাহক ছিলেন আরিয়াম ও বিনায়ক মাসোজি।

'আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম'— ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম আর মাঙ্গলিক নামে এই ছটি কবিতা পরে 'বনবাণী' (১৩৩৮) গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে।

'এই উপলক্ষ্যে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম'— পত্র ৪৮-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪৮। 'এবার একটা ... আগের চিঠিতে লিখেচি'— গল্পটি 'বলাই', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫-এ প্রকাশিত ও পরে 'গল্পগুচ্ছে' সংকলিত।

'রাণী ২১০ নম্বরেই ... ধরেচে'— কলকাতার ২১০, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে মহলানবিশদের বাসভবন ছিল। নির্মলকুমারী মহলানবিশ তখন দীর্ঘকাল ধরে স্বল্প জ্বরে ভুগছিলেন।

পত্র ৪৯। 'যে সময়টা ... আমলের'— শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯৮৯) তখন

ছিলেন কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর আমন্ত্রণে কবি তাঁর চৌরঙ্গীস্থিত সরকারি আবাসে বাস করেন ৮ অগস্ট থেকে ৩১ অগস্ট (১৯২৮) পর্যন্ত। এখান থেকেই তিনি ৩০-এ অগস্ট রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'এখানে মুকুলের বাড়িতে কিছুকাল কাটল। ...ঘরদুয়োরও ভালো, চারদিকে বাগান, সামনে মস্ত পুকুর, বড় বড় গাছ— রাস্তা দূরে— কলকাতায় আছি বলে মনে হয় না। সামনে একটা বারান্দা আছে সেখানে বসে গাছপালা আকাশ দেখতে খুব ভালো লাগে।' চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ. ৮৭।

'চাইনিজ বন্ধু স্যু'— অধ্যাপক ৎসু-সী-মো। ১৯২৪ সালে কবির চীন ভ্রমণ কালে ইনি ছিলেন কবির সঙ্গী ও দোভাষী। তিনি শান্তিনিকেতনে এলে পর তাঁকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে একটি অভিভাষণ দিয়েছিলেন। এই অভিভাষণ ও তার উত্তরে সু-সী-মোর প্রতিভাষণ ও সংবর্ধনার বিবরণ পাওয়া যায় অনাথনাথ বসুর 'শান্তিনিকেতনে চৈনিক সুধী ৎসু-সী-মোর অভ্যর্থনা' রচনাটিতে, (প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ, পৃ. ৩৬৮-৭০)।

'যার নামে চা-চক্র খোলা হয়েচে'— ৎসু-সী-মো-র নামে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি চা-মজলিশের প্রবর্তন করেছিলেন 'সুসীম চা-চক্র' নামে। আশ্রমের অধ্যাপক ও কর্মীদের অবসরকালীন মিলনের জন্য এই মজলিশ। মজলিশের উদ্‌বোধন উপলক্ষে কবি গান বেঁধেছিলেন 'হায় হায় হায় দিন চলি যায়'।

'১৬ ডিসেম্বর ... সম্পূর্ণ হবে'— তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড আরউইন ১৬ ডিসেম্বর সকালে সদলবলে হাওড়া থেকে ট্রেনযোগে রওনা হয়ে বিকেল ৩ টে নাগাদ বোলপুরে পৌঁছেছিলেন। আশ্রম পরিদর্শন করে তাঁরা সে রাত্রেই কলকাতায় ফিরে যান। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার ও তৎকালীন গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'এতকাল আশ্রমে গবর্ণরগণ আসিয়াছেন— আশ্রমের ভিতরে পুলিশের উপর কখনো কোন ভার অর্পিত হয় নাই। কিন্তু এবার দেশের রাজনৈতিক অশান্তির কথা বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ সে দায়িত্ব গ্রহণ

করিতে সাহসী হইলেন না, তিনি পুলিশ বিভাগের উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিলেন। আশ্রমের কর্মীদের সনাক্ত হইবার জন্য এক প্রকার গেরুয়াবর্ণ আলখাল্লা পরিধান করিতে হইয়াছিল।' দ্র. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৯, পৃ. ৩৩৩।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গিয়ে লর্ড আরউইন সি. এফ. এন্ড্রুজকে এ বিষয়ে যে চিঠি লেখেন তা তাঁর আগমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোকপাত করে : 'প্রথমেই আমরা কুটির শিল্প সামগ্রীর সংগ্রহ নিয়ে আয়োজিত একটি প্রদর্শনী দেখলাম, তারপর দেখলাম কতকগুলি সমবায় সমিতির কার্যাবলী এবং কৃষিকার্যের কিছু নমুনা। সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা আম্রকুঞ্জে কবির সঙ্গে মিলিত হলাম। এখানে কবি আমাদের স্বাগত জানিয়ে মর্মস্পর্শী একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন ... তারপর গেলাম চা-পানের জন্য কবির বাসগৃহে। ...সবার শেষে ছিল এক ঘণ্টার একটি ছোট নাটকের অভিনয়।' সনৎকুমার বাগচী, 'রবীন্দ্রনাথ ও কয়েকজন রাজপুরুষ', ১৩৯৪, পৃ. ২২।

পত্র ৫০। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে ক্যানাডার National Council of Education-এর চতুর্থ সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে কবি কলকাতা থেকে বোম্বাই যাত্রা করেন ২৬-এ ফেব্রুয়ারি। কবির সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপক বয়েড জি. টাকার (Boyd. G. Tucker), অপূর্বকুমার চন্দ ও কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

'সুরেনের মহাভারত ...করছিলুম'— কবি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত 'মহাভারত' বইটির একটি পরিমার্জিত আকার দান করেন। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এটি পরে 'কুরুপাণ্ডব' নামে প্রকাশিত হয় ২৫ বৈশাখ, ১৩৩৮-এ। কবি এই প্রসঙ্গে ২৮-এ ফেব্রুয়ারি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'মহাভারতের নিছক গল্প অংশটুকুকে চিহ্নিত করে দিয়েছি। ওর প্রথম অংশটা বাদ পড়বে। যেখান থেকে কৌরব পাণ্ডবদের বাল্যলীলা সুরু হয়েচে সেখান থেকেই বই আরম্ভ হবে। পেন্সিল দিয়ে ঘেরা অংশগুলো ত্যাগ করতে হবে। শেষের অনেকখানি বাদ। সব সুদ্ধ বোধ হয় ১৫০।২০০ পাতার বেশি হবে না। খুব আঁট করে দিয়েছি— পড়তে

বেশ ভালো লাগবে। এটা স্কুল পাঠ্য হবার বাধা নেই।' দ্র. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪।

'কুরুপাণ্ডবের' ভূমিকায় কবি লেখেন 'কিছুকাল হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সংকলন করেন। তাহাকেই সংহত করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে বাংলা রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত। তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কথা মনে রাখিয়া শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের উচ্চতর বর্গের জন্য এই গ্রন্থখানির প্রবর্তন হইল। অন্য বিদ্যালয়েও যদি ইহা ছাত্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহারযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে।'

পত্র ৫১। 'তিন সহচরে'— বয়েড জি. টাকার, অপূর্বকুমার চন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

পত্র ৫২। মূল পত্রের উলটো পিঠে রবীন্দ্রনাথের আঁকা জলপাত্রের ছবিটি আছে।

পত্র ৫৪। মূল পত্রের উলটো পিঠে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি আছে।

পত্র ৫৫। চিঠিটি ক্যানাডা যাত্রার পূর্বে ইয়োকোহামা বন্দর থেকে লিখিত।

'এই চিঠিটা ... উপকার করেছিল'— প্রতিমা দেবীকে লিখিত এই চিঠির সঙ্গেই কবি রথীন্দ্রনাথকে এই প্রসঙ্গে লেখেন 'টোকিয়োতে যে রাত্রে পৌঁছলুম সেই রাত্রেই একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আমাকে একখান সাদা সিল্ক উপহার দিলে। তার ইতিহাস হচ্চে এই যে, সে তার ছেলেকে দেখতে য়ুরোপে গিয়েছিল। মার্সেলসে পৌঁছে দেখলে তার ছেলে তাঁকে নিতে আসে নি। য়ুরোপের ভাষা জানে না। একে একে সব লোক নেবে গেল— কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না— ওর দুরবস্থা দেখে একজন ভারতীয় যুবক ওকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হল। ওকে নিয়ে রেলগাড়ি করে প্যারিসে গিয়ে ওর ছেলের হোটেল খুঁজে বের করে পৌঁছিয়ে দিলে। ছেলে তখন রোগে শয্যাশায়ী, ভেবে অস্থির হয়েছিল ওর মা কি করে ওর কাছে আসবে। দশ দিন বাদে ছেলেটি মারা গেল। এই

ভারতীয় যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি। বার্লিনে তার বাসা। বুঝতে পারা গেল সৌম্য। বিবরণটা শুনে ভারি খুসি হয়েচি।'— 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯।

পত্র ৫৬। মূল পত্রের মাঝখানে একটি ছবি আঁকা আছে। সেই ছবিকে বেষ্টন করে চিঠিটি লেখা। ছবিটি যেন দর্পন হাতে কোনো নারী।

পত্র ৫৭। এই চিঠিটিরও সূচনায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি আছে, চিঠিটি তার নীচে। ছবিতে প্রাগৈতিহাসিক জলচর প্রাণীর আদল আছে। 'যক্ষপুরীর মালেকদের'— আমেরিকার ধনী সম্প্রদায় কবির অভিপ্রেত। এদের সম্পর্কে কবির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠিতেও। 'Flowing oil well'-এর চিত্রশোভিত একটি পোস্টকার্ডে তিনি দিনেন্দ্রনাথকে লেখেন— 'ছবিটা ভাল করে দেখ্— কেরোসিন তেলের অন্ধকূপ-এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠ্‌চে ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরদের এই দশা— এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সূর্য্যের আলো এদের মানস চক্ষে পৌঁছয় না।' (রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত)

'ঋতুরঙ্গ বইখানা'— ১৩৩৩ সালের বসন্তে রচিত 'নটরাজ-ঋতু-রঙ্গশালা' ১৩৩৪-এর আষাঢ়-সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়, অগ্রহায়ণে কলকাতায় 'ঋতুরঙ্গ' নামে এর অভিনয় হয়। সে-অভিনয়ের জন্য নতুন করে কবিতা লেখা হয়েছিল। ১৩৩৪-এর পৌষ মাসে 'মাসিক বসুমতী'-তে 'ঋতুরঙ্গ' নামে সেটি প্রকাশিত। এখন 'বনবাণী' (১৩৩৮) গ্রন্থের অন্তর্গত।

পত্র ৫৮। মূল পত্রে একটি পাখির ছবি আঁকা আছে। উল্লেখ্য কবির অভিলাষ অনুযায়ী প্রতিমা দেবীর জাপান যাওয়া কোনোদিনই ঘটে নি। মনে রাখা যেতে পারে যে কবি ক্যানাডায় পৌঁছেছিলেন ৬ এপ্রিল। ক্যানাডা থেকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে পৌঁছন ১৮ এপ্রিল। এখান থেকে কবি জাপান যাত্রা করেন ২০ এপ্রিল। তার পর হনলুলু হয়ে তিনি ইয়োকোহামায় পৌঁছন ১০ মে। সেখান থেকে আসেন টোকিয়োতে, ইমপিরিয়াল হোটেলে।

পত্র ৫৯। কলকাতা থেকে লেখা। ক্যানাডা-জাপান ভ্রমণ শেষে কবি কলকাতায় পৌঁছেছিলেন ৫ জুলাই (১৯২৯)।

'সুমিত্রা সংশোধন'— ক্যানাডা যাত্রার পূর্বে ঘরোয়া অভিনয়ের জন্য কবি 'রাজা ও রানী' নাটকটি পরিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে রূপদান করেছিলেন 'ভৈরবের বলি' (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯) নামে। কিন্তু কবির মনোমতো না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এটি অভিনীত হয় নি। কবি 'রাজা ও রানী'-কে পুনরায় নব কলেবরে রূপায়িত করেন 'তপতী' (১৮ অগস্ট ১৯২৯) নামে। 'সুমিত্রা' বলতে 'তপতী' নাটকটিই এখানে অভিপ্রেত। 'তপতী' প্রথমে শান্তিনিকেতনে এবং পরে ২৬, ২৮, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবরে জোড়াসাঁকোয় অভিনীত হয়েছিল।

'অজিন ... পারবে না'। শেষ পর্যন্ত কবি স্বয়ং বিক্রমদেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

পত্র ৬০। এই পত্রে প্যারিসে কবির প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর দিনটি উল্লিখিত হওয়ার সূত্রে পত্রটির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। কবি হিবার্ট লেকচার দেবার জন্যে অক্সফোর্ডে যাওয়ার পথে প্যারিসে এসেছেন। এখানে 'Gallery Pigalle'তে কবির প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী হয় ২ মে ১৯৩০-এ। এই প্রসঙ্গে কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন (৮ মে ১৯৩০), 'আমার ছবির প্রদর্শনী চলচে। ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশের সময় যেমন বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল, ছবি নিয়েও প্রায় তেমন হল। বর্ণনা করে লাভ নেই— এদের দেখার মধ্য দিয়ে দেখলে তবে ঠিক বুঝতে পারতে।' দেশ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩৩, পৃ. ৬২৭।

'রথীর জন্যে উদ্বিগ্ন আছি'— উল্লেখ্য ১৯৩০-এ কবির ইওরোপ যাত্রার সময়ে রথীন্দ্রনাথও সপরিবারে কবির সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন ইওরোপে চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য। কলকাতা থেকে যাত্রা করে মাদ্রাজে পৌঁছেই রথীন্দ্রনাথ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে ড: সুহৃৎনাথ চৌধুরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। কবি যখন প্যারিসে রথীন্দ্রনাথ তখন চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে।

পত্র ৬১। উল্লেখ্য প্যারিস থেকে কবি লন্ডনে যান ১১ মে। লন্ডন থেকে তিনি

যান বার্মিংহাম। বার্মিংহামের কাছে 'উডব্রুক' ছিল কোয়েকার সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। 'উডব্রুকে' কবি থাকেন ১৩ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত। তারপর তিনি যান অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডে ১৯, ২১ ও ২৬ মে (১৯৩০) এই তিনদিন হিবার্ট লেকচার দেবার পর কবি লন্ডনে ভারতীয় অতিথিশালা 'আর্য্যভবন'-এ এসে থাকেন ৩০ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত। হিবার্ট বক্তৃতার বিষয় ছিল 'The Religion of Man'।

'রোটেনস্টাইন গৃহিনীর আমন্ত্রণ'— উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যাপারে এবং চিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর শিল্পী বন্ধু উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের মতামত জানবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। ফ্রান্সের কাপ মার্তাঁয় অবস্থানকালে ৩০ মার্চ ১৯৩০-এ তিনি এ বিষয়ে রোটেনস্টাইনকে এক দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিলেন। প্যারিসে তাঁর চিত্র প্রদর্শিত হওয়ার পর এ সম্পর্কে তিনি পুনরায় শ্রীমতী রোটেন-স্টাইনকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, ৯ মে।

বার্মিংহামে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী হয় ২ জুন এবং লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে, ৪ জুন তারিখে।

মনে রাখা যেতে পারে যে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের (১৮৭২-১৯৪৫) সঙ্গে কবির পরিচয় সুদীর্ঘকালের। ১৯১১ সালের জানুয়ারিতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁদের প্রথম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট রোটেনস্টাইন এর পর লন্ডনে ফিরে গিয়ে তাঁর গল্প ও কবিতার ইংরেজি তর্জমা পড়ে অভিভূত হন। ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডে রোটেনস্টাইনের বাড়িতেই গীতাঞ্জলির তর্জমা পাঠের আসর বসেছিল এবং তাঁরই মাধ্যমে ইংল্যান্ডের 'ভাবুক সমাজে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হন। এই সময়ে রোটেনস্টাইন তাঁর ছ'টি প্রতিকৃতিও অঙ্কন করেন। এরপর থেকে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ ও চিঠিপত্রের মারফত রোটেনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকাল পর্যন্ত। রোটেনস্টাইন তাঁর *Men and Memories* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্র. William Rothenstein (1900-1922), *Men and Memories*, vol. 2, পৃ. ২৫০, ২৬২-

৬৯, ২৭২, ২৭৮, ২৮২-৮৫, ২৯৯-৩০২, ৩৭৮; *Since Fifty : Men and Memories (1922-1938)*, পৃ. ৪৩-৪৬, ৫০, ১১১-১২, ১৫৩, ১৭৩, ১৭৫-৭৯, ২৮৮-৮৯।

আরো দ্রষ্টব্য : অশ্রুকুমার সিকদার, রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনস্টাইন, ১৯৭১।

পত্র ৬২। চিঠিটি জেনিভা যাওয়ার পথে বার্লিন থেকে লিখিত।

'এন্ড্রুজ ... করেচে'— এন্ড্রুজ ইংল্যান্ডে কবির বই প্রকাশের কাজে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি জার্মানিতে এসে কবির সঙ্গে মিলিত হন।

'এখানকার ন্যাশনাল ... শুনেচ'— এই প্রসঙ্গে একই তারিখে কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন, 'বার্লিন ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে। এই খবরটার দৌড় কতকটা আশা করি তোমরা বোঝো। ইন্দ্রদেব যদি হঠাৎ তাঁর উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতেন আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে তাহলে আমার নিজের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতুম। ...কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই, আমি বাঙালি বলে এটা আপন হতেই বাঙালির জিনিস নয়। এই জন্যে স্বতই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেছি।' পথে ও পথের প্রান্তে, ১৩৬৩, পৃ. ১১১-১২।

'ময়ূরাক্ষী নদীর ... রান্নাঘর নেই'— ঠিক দু বছর পরে চিঠির এই অংশটুকুই ঈষৎ পরিবর্তিতরূপে 'বাসা' নামে গদ্য কবিতার আকারে 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

পত্র ৬৩। আমেরিকার নিউ হ্যাভেন থেকে ২৪ অক্টোবর কবি রথীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন তাতে এই পত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলির সাদৃশ্য লক্ষ করে এই চিঠিটি একই দিনে লিখিত বলে অনুমিত। দ্র. চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ. ৯৯-১০১।

'এখানকার কোয়েকার ... হবে না'— কোয়েকার সমাজের প্রধানদের

মধ্যে অন্যতম ছিলেন হেভেরফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, খ্যাতনামা লেখক রুফাস জোনস্। এই প্রসঙ্গে কবি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'এখানকার অন্য সব খবর আশাজনক। নিতান্ত আধ-পেটা অবস্থায় ফিরতে হবে না। একটা মস্ত সুবিধা এই যে আমাকে আর দৌড়াদৌড়ি করাবে না— বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোকাবিলায় কথাবার্তা চলবে। রুফাস জোনস্ বললেন রকফেলারের সঙ্গে কথা চালাচালি তাঁরাই করতে পারবেন, আমার থাকবার দরকার হবে না।' চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ. ১০০-০১।

'নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের পরে'— চিঠির এই অংশের সঙ্গে তুলনীয় ৩১ অক্টোবর ১৯৩০-এ রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির এই পত্রাংশ : 'তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেচে।' চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ. ১০৩।

এই সময়ে প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ চিকিৎসার জন্য ইউরোপে অবস্থান করছিলেন।

পত্র ৬৪। 'একটা ভোজ'— নিউইয়র্কের বিল্ট্‌মোর হোটেলে এই ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পত্র ৬৫। চিঠিটি কলকাতা থেকে লিখিত।

অমূল্যবাবু— ইঞ্জিনিয়ার অমূল্যচন্দ্র বিশ্বাস। একটি আমেরিকান কোম্পানি শান্তিনিকেতনে নলকূপ খননের কাজে ব্যর্থ হলে পর কলকাতার এই ইঞ্জিনিয়ারই এ বিষয়ে প্রথম সাফল্য অর্জন করেন। কবি উৎসারিত জলধারার নামকরণ করেছিলেন 'অমূল্য-উৎস'। দ্র. Visva-Bharati Annual Report 1933, p. 21।

পত্র ৬৬। 'নীতু চলে গেল'— মীরা দেবীর একমাত্র পুত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জার্মানিতে মুদ্রণবিষয়ক শিক্ষালাভের জন্য রওনা হয়ে গেছেন।

টাকাগাকিরা— জাপানী জুজুৎসু শিক্ষক নকুজো তাকাগাকি ও তাঁর স্ত্রী। জুজুৎসু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ অনেক কালের। এর আগে শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য তিনি ১৯০৫ সালে

প্রখ্যাত জাপানি শিল্পী ওকাকুরার মাধ্যমে জিন্নোসুকে সানোকেও আনিয়েছিলেন। তাকাগাকি দু বছরের চুক্তিতে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেছিলেন ১৯২৯-এর নভেম্বরে। এরপর রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৯৩১-এর ১৬ মার্চ কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে তাকাগাকির পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা জুজুৎসু ক্রীড়া ও কসরতের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধান হয়েছিল 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' গানটির দ্বারা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন, 'গানটি দিয়া ক্রীড়া প্রদর্শনী হইল, কিন্তু দর্শকের কোনো ভিড় নাই। কবির বড় আশা ছিল বাঙালি ছেলেমেয়েরা এই আত্মরক্ষা ও দুর্বৃত্ত-দমনের সহজ কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইবে। তাকাগাকি বৎসরাধিককাল আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যা ও কৌশল বাহিরের কেহ গ্রহণ করিতে আসিল না। বিজ্ঞাপন দিয়া বৃত্তি ঘোষণা করিয়া সাড়া পাওয়া যায় নাই।' 'কবির জীবনে বহুব্যর্থতা গিয়াছে— কিন্তু জুজুৎসুর ব্যর্থতার মত এমন দুর্ঘটনা বোধ হয় দ্বিতীয়টি ঘটে নাই।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬১, পৃ. ৩৬২, ৩৯৭।

'বুড়ি'— মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতা।

'পুপুর সে' রবীন্দ্রনাথের 'সে' (১৯৩৭) বইয়ের গল্পের নায়ক।

পত্র ৬৭। 'অনুষ্ঠান ... কর্ত্তব্য'— নুটু (রমা মজুমদার)র সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহ-অনুষ্ঠান। কায়স্থ এবং বৈদ্যের এই অসবর্ণ বিবাহে কিছুটা গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল, অবৈধতার প্রশ্ন তুলেছিলেন ফণিভূষণ অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ফণিভূষণকে লিখেছিলেন : 'সমাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত মূঢ়তা ও অধর্ম্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব না।' বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯।

পত্র ৬৮। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের দিনই সুরেন্দ্রনাথ এবং রমার বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ দিনই প্রকাশিত হয় 'রাশিয়ার চিঠি'। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় সুরেন্দ্রনাথকে।

পত্র ৬৯। 'পারস্যকে ... না'— শারীরিক কারণে কবির পারস্যযাত্রা এবারকার

মতো স্থগিত থাকে।

'একটা গল্পের ... এঁকেছি'— গল্পটি 'সে' (১৯৩৭) গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত কাহিনী, ছবি দুটি এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

পত্র ৭০। কবি দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন মে মাসের শেষের দিকে। দ্র. নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠি (৩১ মে ১৯৩১), দেশ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩৮, পৃ. ১০৩৫।

পত্র ৭১। ৭১-সংখ্যক এই চিঠির বিষয়বস্তু ও উল্লিখিত কিছু কিছু ঘটনার সূত্রে এটি ১২ অক্টোবরের ১৯৩১ পরবর্তী দু চার দিনের মধ্যে লিখিত বলে অনুমিত।

লক্ষ করা যেতে পারে যে এ বছর প্রতিমা দেবী বারে বারে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ১৯৩১-এর মে মাসে গরমের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ সহ দার্জিলিং-এ ছিলেন। দার্জিলিং থেকে ৩১ মে কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে যে চিঠি লেখেন তাতে উল্লিখিত হয়, 'বৌমা প্রায় শয্যাগত' (দেশ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩৮, পৃ. ১০৩৫)। আবার জোড়াসাঁকো থেকে ৯ জুলাই তিনি নির্মলকুমারীকে লেখেন, 'আজ বউমারা এসেচেন— তাঁর শরীর বিশেষ খারাপ। উদ্বিগ্ন আছি।' (দেশ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩৯, পৃ. ১১২৫)। উল্লেখ্য, খড়দহের গঙ্গাতীরের বাড়িটি এই সময়েই প্রথম ভাড়া নেওয়া হয় তিন বছরের জন্য (দ্র. দেশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২৭)। তারপর এই চিঠিতে প্রতিমা দেবীর অসুস্থতার উল্লেখ, বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও অতিথি সমাগমের এবং শীতের আসন্ন আবির্ভাবের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে অনুমিত চিঠির রচনাকাল হচ্ছে শরৎকালীন ছুটি। এ বছর থেকে পুজোর ছুটি হয়েছিল ১২ অক্টোবর। ১০ অক্টোবর তিনি নির্মলকুমারীকে লেখেন, 'পরশুদিন এখানকার ছুটি। আজ হবে আনন্দবাজার— কাল হবে ছুটির গায়ে হলুদ, অর্থাৎ অগ্রিম পাওনা— বাক্স গোছাতে বোঁচকা বাঁধতে দিন কাটবে। ওরা চলে গেলে আরো দুচার দিন থাকব।' (দেশ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪০, পৃ. ২৩) এ থেকে মনে হয় ১২ অক্টোবর ছুটি হলে তার দু চার দিনের মধ্যেই এই চিঠি লিখিত।

পুজোর ছুটি সুরু হওয়ার দিন কয়েক আগে পুপেকে নিয়ে রথীন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ চলে গেছেন। সম্ভবত শরীর ভালো ছিল না বলে, বিশেষ করে গরমের ছুটিতে প্রতিমা দেবী সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলেই তিনি এবার একা খড়দহের গঙ্গাতীরের বাড়িতে রয়ে গেলেন।

১৯৩২ এর শারদীয় ছুটিতে প্রতিমা দেবী দার্জিলিংয়েই ছিলেন।

পত্র ৭২। পত্রে 'বিজয়া দশমী' তিথির উল্লেখ, 'গল্প' রচনা ও 'চাকরি নেয়া'র উল্লেখ থেকে এর রচনাকাল অনুমিত।

'ছোটো একটা গল্প লিখেছি'— 'দুই বোন' উপন্যাসটি কবির অভিপ্রেত। অগস্ট (১৯৩২) মাসেই এর খসড়া করা হয়েছিল। পুজোর ছুটিতে তাকেই নতুন করে রূপায়িত করা হল। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এর প্রকাশ ১৩৩৯-এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩৩৯-এ। এই প্রসঙ্গে কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন, 'সম্প্রতি একটা গল্প লিখেচি, তার নাম দুই বোন। খুব ছোট গল্প নয়। ওকে বলা যেতে পারে ঢ্যাঙা ছোটো গল্প কিম্বা বেঁটে বড়ো গল্প। ...ওটা না লিখে যোগাযোগটা কেন লিখলুম না যদি জিজ্ঞাসা করো তা হলে তার উত্তর ব্যাখ্যা করে লিখতে হলে এই চিঠির কাগজে যে জায়গাটুকু বাকি আছে কুলোবে না। ৬ কার্তিক ১৩৩৯। দ্র. দেশ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪১, পৃ. ১২৪।

'চাকরি নিয়ে ... চলবে না'— কবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপকরূপে তিনি প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', ডিসেম্বর ১৯৩২-এ এবং দ্বিতীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন 'শিক্ষার বিকিরণ' ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩-এ। বক্তৃতাদুটি প্রথমে পুস্তিকা আকারে ও পরে 'শিক্ষা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৪২) সংকলিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি নির্মলকুমারী মহলানবিশকেও পূর্বোক্ত চিঠিতে লেখেন, 'আগামীকল্য চলেচি খড়দহে। যদি জিজ্ঞাসা করো কেন চলেচি তার উত্তর এই যে পিপিসারীর তাগিদে। লেকচার লিখতে হবে। এখানে লেখা এগোয় না।' দ্র. দেশ, পূর্বোক্ত সংখ্যা ও পৃষ্ঠা।

'আমার ... মরে নি'— ইনি সম্ভবত তৎকালীন সংগীতভবনের অধ্যাপক সুশীলকুমার ভঞ্জ। আশ্রমবাসীদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তিনি রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই খ্যাতি অর্জন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে তিনি শান্তিনিকেতনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

পত্র ৭৩। এই পত্রে লক্ষ্ণৌয়ের আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক অসিতকুমার হালদারের বাড়িতে প্রতিমা দেবীর অবস্থানের কথা এবং 'নবীন' ও 'শাপমোচন'-এর অভিনয়ের প্রসঙ্গ থেকে পত্রের কাল অনুমিত।

১৯৩৩-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় লক্ষ্ণৌয়ের মরিস কলেজের সাংবৎসরিক উৎসবে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো নৃত্যাভিনয়ের প্রযোজনা করুক— লক্ষ্ণৌতে প্রতিমা দেবীর কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এই উৎসবের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রতিমা দেবী তখন অসিতকুমার হালদারের অতিথি হিসেবে লক্ষ্ণৌতেই ছিলেন। বিষয়টি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে জানানো হলে রবীন্দ্রনাথ স্থির করেন লক্ষ্ণৌতে 'নবীন' ও 'শাপমোচনে'র নৃত্যাভিনয় হবে। সেই অনুযায়ী একটি দল শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। লক্ষ্ণৌতে ২ মার্চ 'নবীন' এবং ৬ ও ৭ মার্চ 'শাপমোচন' অভিনীত হয়েছিল। দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য', ১৩৯০, পৃ. ১২২-২৩।

শান্তিদেবের উক্ত গ্রন্থ থেকে (পৃ. ১২৬) জানা যায়, 'শাপমোচনের গদ্যাংশগুলি পাঠ করতেন গুরুদেব নিজে। লক্ষ্ণৌয়ের অভিনয়ের সময় সাগরময় ঘোষের উপর পাঠের দায়িত্ব পড়েছিল, গুরুদেবের অনুপস্থিতির কারণে।'

'সুরেনের ... হই'— শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্র-ছাত্রীর যে দলটি লক্ষ্ণৌতে নৃত্যাভিনয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তার পরিচালনায় ছিলেন কলাভবনের অধ্যাপক শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. শান্তিদেব ঘোষ, 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য', ১৩৯০, পৃ. ১২২-২৬।

'দালিয়া ... না'— 'দালিয়া' গল্পটি প্রথম নাট্যরূপ লাভ করে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাতে এবং মধু বসুর পরিচালনায় ১৬ এপ্রিল, ১৯৩০-এ এটি 'ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স'-এর দ্বারা নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ হয়। এই পত্রে উল্লিখিত 'দালিয়া'র অভিনয় মধু বসু পরিচালিত 'ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স'-এর 'দালিয়া' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়। এটি ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে 'এম্পায়ার' থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। এবারকার নাট্যরূপটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত। এতে কয়েকটি নতুন দৃশ্য এবং একটি গান সংযোজিত হয়। এই অভিনয়ে তিন্নির ভূমিকায় ছিলেন সাধনা বসু এবং দালিয়ার ভূমিকায় ছিলেন মধু বসু। 'দালিয়া' পুনরায় অভিনীত হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি এম্পায়ার থিয়েটারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র হিসাবে 'দালিয়া'র আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৩০ এর ২৬-এ জুলাই 'ক্রাউন' সিনেমা হলে। 'দালিয়া' চলচ্চিত্রের পরিচালনায় ছিলেন ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রযোজক এবং মধু বসু। দ্র. মধু বসু, 'আমার জীবন', ১৯৬৭, পৃ. ১৪৫, ১৮২, ১৮৪-৮৫ ; অরুণকুমার রায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র, ১৯৮৬, পৃ. ১৮।

'মায়ার খেলা'— দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় ও নিখিল বঙ্গ নারী সঙ্ঘের (All Bengal Women's Union) উদ্যোগে 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়েছিল 'এম্পায়ার' থিয়েটারে ২৭ ও ২৮-এ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৩)।

'তোমরা ... করেছিলে'— ১৯৩৩ সালের আগে 'মায়ার খেলার যে অভিনয়টিতে প্রতিমা দেবী সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন সেটি ১৯২৭ সালের ১৭ ও ১৮ অগস্ট তারিখে 'এম্পায়ার' থিয়েটারে অনুষ্ঠিত সরলা দেবী পরিচালিত 'মায়ার খেলা'। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে ভ্রমণরত। হয়তো পত্রযোগে বা পরে লোকমুখে তিনি এই অভিনয়ের অসাধারণ সাফল্যের কথা শুনে থাকবেন। ১৯৩৩ সালের পূর্বে শান্তিনিকেতনে অভিনীত কোনো 'মায়ার খেলা'র সঙ্গে প্রতিমা দেবী যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায় না। দ্র. অমিয়া ঠাকুর, 'কী ধ্বনি বাজে', দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৬।

পত্র ৭৪। ১৯৩৩ এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইতে রবীন্দ্র সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। চিঠিটি এই সময়ে লিখিত। 'শাপমোচন' অনুষ্ঠিত হয় ২৫-এ নভেম্বর এবং 'তাসের দেশ' হয় ২৮-এ নভেম্বর।

'... গানটাতে যে নাচ ওরা লাগিয়েচে'— নতুন ধরনের এই নাচটির প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন, ' "সঙ্কোচের বিহ্বলতা" গানটি নাটকের শেষ দৃশ্যে গুরুদেব রাখতে বলেছিলেন। জাপানী কুস্তি, জুদো-প্রদর্শনীর উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে এ গানটি ১৯৩১-এ গুরুদেব রচনা করেছিলেন। গানটি জুদোর সঙ্গে জড়িত থাকার দরুণ তার প্রাথমিক ব্যায়ামের কতগুলি ভঙ্গীকে গানটির সঙ্গে মিলিয়ে তার চরিত্রোপযোগী একটি নাচ তৈরি করেছিলাম। নাচটি সকলে সহজেই তুলে নিতে পেরেছিল। কারণ নাচের ছাত্রীরা প্রায় সকলেই পূর্বে জুদোর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। নাচটি দর্শকদের সকলের কাছেই বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।' 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, ১৩৯০, পৃ. ৯০।

পত্র ৭৬। 'আমাদের এখানকার... হবে'— পত্রটি মাদ্রাজের অ্যাডিয়ার থেকে লেখা। এ বছর পূজাবকাশে কবি এখানে ছিলেন। কলাভবনের ছাত্রদের সহযোগিতায় নন্দলাল বসু ২৮-এ অক্টোবর এখানে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। পরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এখানে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় ২৭, ২৮, ৩০ ও ৩১-এ অক্টোবর।

পত্র ৭৭। 'তোমাদের পথকষ্টের... রেলপথের'— ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসের প্রথমে প্রতিমা দেবী, রথীন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রমোহন সেন ইংল্যান্ড রওনা হয়ে গেছেন। এই ভ্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল শ্রীনিকেতন পরিচালনার ব্যাপারে লেনার্ড. কে. এলমহার্স্টের সঙ্গে ইংলন্ডে দেখা করা। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী পরে ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে আঁদ্রে কারপেলেসের কাছে চলে যান।

'সিংহলের বন্ধুরা... ঘুরিয়েছিল'— ১৯৩৪ সালে কবির সিংহল ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন প্রতিমা দেবী, পুপে, মীরা দেবী, সস্ত্রীক অমিয় চক্রবর্তী প্রভৃতি। এই ভ্রমণের সরস ও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা কবির পত্রে : 'যাকে বলে চক্রবাত্যা। অর্থাৎ দমকা

আসচে চারদিক থেকে। অভ্যর্থনার তুফান। অবকাশ তলিয়ে গেল অগাধে। হাঁপিয়ে উঠেছি। সংক্ষেপে খবর দেওয়া যাক'। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য দেশ, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪৯ ও ৫০, পৃ. যথাক্রমে ৮৯৬ ও ৯৭৭।

'আমার মেটে কোঠার ছাদ... যান'— ১৯৩৫ সালে নির্মিত মাটির বাড়ি শ্যামলীর দেয়ালে উৎকীর্ণ সমস্ত ভাস্কর্যই নন্দলাল ও তাঁর ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ কর, রামকিঙ্কর বেজ প্রমুখ শিল্পীদের সৃষ্টি। স্থাপত্য-পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের।

পত্র ৭৮। ৭৭ ও ৭৮-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর জাপান ভ্রমণ কবির অভিপ্রেত হলেও তা কার্যত ঘটে নি।

'জন্মদিনে গৃহপ্রবেশ করতে পারব এমন আশা'— ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখ নবনির্মিত মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'-তে এই গৃহপ্রবেশ-অনুষ্ঠান হতে পেরেছিল। মূল স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশে লেখা একটি কবিতা সেদিন পাঠ করেন কবি। কবিতাটির জন্য দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০, পৃ. ৪৪৯।

পত্র ৭৯। এই পত্রে কবির নদীবক্ষে বাসের বিবরণের সূত্র থেকে চিঠির রচনা কাল অনুমিত। এই প্রসঙ্গে কবি ৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে ১৯৩৫) নির্মল-কুমারীকে লেখেন, 'যাব কালই। আহারান্তে উঠব গিয়ে বোটে, উত্তর-পাড়ার ঘাটে, জোয়ারের মুখে বেলা বারোটায়। সেখান থেকে যাব শ্রীরামপুরে... যদি ভালো লাগে তো ভালই। নইলে ওখান থেকে যাব চন্দননগরের ঘাটে। যদি সম্ভব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসটা এই রকম জলে জলে কাটাব।' তার (দেশ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৪, পৃ. ৩০৫) আবার ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৯৩৫) 'House boat Padma' থেকে নির্মলকুমারীকে লেখেন, 'অনেক দিন পরে এসেচি আমার পূর্ব পরিচিত নির্জন নিবাসে।... এই জায়গাটা মিশিয়েছে দুটো সময়কে, একটা হচ্চে আঠারো বছর বয়সের চন্দননগর গঙ্গাতীরের দিন, আর একটা হচ্চে ত্রিশ বছরের পদ্মাচরের বোটের যুগ। যে ঘাটে বোট বেঁধেছি ঠিক তার উপরেই সেই দোতলা বাড়ি যেখানে উতলা কিশোর বয়সে ছিলুম জ্যোতিদাদার সঙ্গে,

ঘন ঘোর বর্ষার অপরাহ্ণে সুর বসিয়েছিলুম বিদ্যাপতির কবিতায়। সে বাড়ি আজ জনশূন্য, জীর্ণ, জঙ্গলে ঢাকা।' দ্র. দেশ, পূর্বোক্ত সংখ্যা ও পৃষ্ঠা। এ থেকে দেখা যায়, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে উত্তরপাড়ার ঘাটে বাঁধা বোটে চেপে ঘুরে ঘুরে ১০ জ্যৈষ্ঠ, ২৪ মে কবি চন্দননগরে এসে পৌঁছন। ঐ দিনই ৭৯-সংখ্যক পত্রটি লিখিত। কবি এখানে ছিলেন ৩০ জুন অবধি।

'সেই দোতালা... কাটিয়েছি'— এই বাড়িটি সেকালে মোরান সাহেবের বাগান নামে পরিচিত ছিল। ১৮৮১ সালের জুন-জুলাই মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি এই বাড়িতে বাস করেছিলেন। এই দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করে তিনি 'জীবনস্মৃতি'-র (১৯১২) 'গঙ্গাতীর' অধ্যায়টি রচনা করেছেন। পরে 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) গ্রন্থে এবং একটি মৌখিক আলোচনায় কবি চন্দননগরে এই সময়কার বাসকালীন স্মৃতিচারণা করেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. হরিহর শেঠ, রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর, ১৯৬১ এবং রানী চন্দ, 'গুরুদেব', ১৩৮৭, পৃ. ৩৭; 'জীবনস্মৃতির জন্মকথা', শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৮৩, পৃ. ১৩।

'সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর হচ্চে এই'— ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ-বই নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। তৎকালীন বিপ্লবী রাজবন্দীদের অন্যতম সরোজ আচার্যের এই কথাগুলি থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে : '... আমরা যেন অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঘরে ঘরে নিদারুণ বিষাদের ছায়া, চাপা সুরে সকাতর প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ— আমাদের রবীন্দ্রনাথ, তিনি এই বই লিখলেন, কেন লিখলেন ঠিক এই সময়ে যখন কিনা বাংলাদেশ জুড়ে এন্ডারসনী তাণ্ডব চলছে?... রবীন্দ্রনাথ, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে, বিপ্লবী-চরিত্রকে কী করে এত লঘুভাবে প্রগল্‌ভ প্রণয়কাহিনীর সামিল করতে পারলেন?' দ্র. 'সরোজ আচার্য রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৬-৮৭।

'স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ নামক এক ব্যক্তির লেখা থেকে'— ১৩৩৭ সালের

আষাঢ় মাসে 'প্রবাসী কার্য্যালয়' থেকে ছাপা হয়েছিল ছোটো একটি উপন্যাস, স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দের 'ঊষার আলো'। এই উপন্যাসে কঠোর নিয়মব্রতে আবদ্ধ একটি 'মানব-সমিতি'র কথা বলা হয়েছে, যে-সমিতির উদ্দেশ্য মানবসমাজের সেবা ও শক্তি। লেখকের বর্ণনা মতো 'মূল চরিত্র উপন্যাসে চারটি— সুব্রত, চিরব্রত, রেণু আর দয়া।' সুব্রত হিসেবি, তার চরিত্রে মমতা আর নির্মমতা সমভাবে উপস্থিত; চিরব্রত খেয়ালি, রেণু সরল চতুর লাজুক সাহসী, দয়া 'নিজ জীবনের সুখ বোঝে না, সে বোঝে জাতির আনন্দ'। পরিণামে দয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় চিরব্রতর, সুব্রতর নাম বলতে বলতে মৃত্যু হয় রেণুর।

পত্র ৮১। ২৮-এ সেপ্টেম্বর ছিল শারদীয়া পূর্ণিমা। এই চিঠিতে লক্ষ্মী পূর্ণিমার (১৩৪২) উল্লেখ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে পুপেকে নিয়ে প্রতিমা দেবীর পুরী যাওয়ার কথা ও শান্তিনিকেতনে ডাকাতির উল্লেখ আছে। এ থেকে চিঠিটি ২৮ সেপ্টেম্বর লিখিত বলে অনুমিত।

'পুপের পোস্টকার্ডে... পারলে না'— কবির এই মন্তব্যের পিছনকার ইতিহাস পাওয়া যায় নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্রে— 'বউমা পুপেকে নিয়ে পুরিতে গেছেন। হাওড়া স্টেশন ছাড়ার অনতিকাল পরেই দুজন অনাহূত পুরুষ ওঁদের নিষেধ সত্ত্বেও জানলা দিয়ে গাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। অগত্যা ওরা কর্ড টেনে দিয়ে গাড়ি থামাতেই তারা পালিয়ে যায়। এদিকে শান্তিনিকেতনে অমাবস্যা রাত্রে হরিদাসবাবুর কুটিরে ডাকাত ঢুকে হরিদাসবাবুর পা দিয়েছে ভেঙে, মেয়েদের গা থেকে গয়না নিয়েছে খুলে, ওঁর স্ত্রীর প্রতি গর্হিতাচরণের চেষ্টা করেছে— চীৎকার শব্দে লোক এসে পড়াতেই পালিয়েছে। অবশেষে পুলিশের সন্ধানে প্রমাণ হয়েছে দস্যুদলের প্রধান ছিল বাসুদেব লালধারী প্রভৃতি এখানকার দীর্ঘকালের অনুচরবৃন্দ। তাদের প্রতি কেউ কিছুতে অবিশ্বাস করবে না এই ধ্রুব ধারণাই তাদের দুঃসাহসের হেতু। আমরা হতবুদ্ধি হয়ে আছি।' দেশ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ৬, পৃ. ৫০১।

'বরানগরের ইতিবৃত্ত'— ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে কবি যখন বরানগরে

প্রশান্তকুমার মহলানবিশের বাড়িতে ছিলেন তখন ২০ সেপ্টেম্বর গভীর রাত্রে একটি ভয়াবহ ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল। নির্মলকুমারীর আর্তনাদে কবির ঘুম ভেঙে যায় এবং কবির গলার আওয়াজ পেয়েই ডাকাতরা দ্রুত পালিয়ে যায়। বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. দেশ, ২৮ বর্ষ, সংখ্যা ৪৫, পৃ. ৫০৬-৭।

পত্র ৮২। কবি কলকাতায় ছিলেন ৫ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

'রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ'— পূর্বোক্ত কলকাতা-বাসের দশদিন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (*V. B. News*, Oct 1936) : 'It was a private visit and there were no public engagements'। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উৎপীড়িত মনে করেছেন।

'নতুন বাড়িতে মিস্ত্রির আক্রমণ'— মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'র পাশে নব নির্মিত 'পুনশ্চ' বাড়ি। সেপ্টেম্বর মাসে বাড়িটির কাজ সম্পূর্ণ না হতেই কবি প্রথমে এখানে এসে থাকতে সুরু করেছিলেন। দ্র. *V. B. News*, Nov-Dec 1936, pp. 37-38।

পত্র ৮৩। এই পত্রে ২৯ আশ্বিন ১৩৪৩ বা ১৫ অক্টোবর ১৯৩৬-এর স্থলে ২৯ আশ্বিন ১৯৩৬ লেখা হয়েছে।

'চিত্রাঙ্গদার রিহার্সল চলচে'— ১৯৩৬ সালের সূচনায় প্রতিমা দেবী 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটিকে নাচ এবং মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে মঞ্চস্থ করবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন। এরই থেকে ক্রমে গড়ে ওঠে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'। ১১ মার্চ নিউ এম্পায়ারে এর প্রথম অভিনয় হয়। সেই সময় থেকেই এর পরিচালনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল শান্তিদেব ঘোষের। বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, শান্তিদেব ঘোষ, 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য', ১৩৯০।

'স্টেটসম্যানে পরিশোধের ... সমালোচনা'— ১৪ অক্টোবর (১৯৩৬) স্টেটসম্যান কাগজে পরিশোধের যে বিস্তৃত সমালোচনা বের হয় সেটি এই বছরের বিশ্বভারতী নিউজ (নভেম্বর- ডিসেম্বর, ১৯৩৬, পৃ. ৩৭-৩৮)-এ প্রকাশিত হয়। তার কতকাংশ এই-রূপ : "All the beauty

of old fairy tales comes alive. The girls shine with the lustre of natural happiness. Their incredible clothes combine all the beautiful colours and shapes we have ever imagined ; each is an individual symphony. The height of the head-dresses recalls Java, the armlets and anklets haunt us from Ajanta frescoes, the scented garlands, skirts and bodices are traditional India (Sic). The men have the brave attitudes and free sweeping movements of old warriors. In the Indian dance hands play a more important part than legs, and they are hands to dream of ...A sense of happiness and harmony pervades the stage, ...the orchestra, delightfully grouped sitting behind low partitions of ornamental wood play and sing exquisitely in the background. Never are the nerves jarred by overloud music. ...The poet has brought a new joy in an old goblet. All the best in Ajanta tradition has flowered again here.'

পত্র ৮৪। ১৭ অক্টোবর ১৯৩৬-এ মীরা দেবীকে লেখা চিঠির সঙ্গে এই চিঠির বিষয়গত সাদৃশ্য থেকে চিঠির কাল অনুমিত। কবি ঐ তারিখেই মীরা দেবীকে লিখছেন— 'বুড়ির শরীরের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেম।... ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা কর্ত্তব্য হয় স্থির করে আমাকে জানাস। আমি সুরেনকে বলে দিয়েছি চিত্রাঙ্গদার দল নিয়ে বম্বে যাওয়া চলবে না। প্রথম থেকেই এতে আমার উৎসাহ ছিল না'— দ্র. চিঠিপত্র ৪ (১৩৫০), পৃ. ১৫৭।

পত্র ৮৫। চিঠিতে তারিখ উল্লেখ করে শ্রীনিকেতনে যাওয়ার ব্যাপারে কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন, 'আজ আমি চলেছি শ্রীনিকেতনে। দার্জিলিং দুর্গম— সুরুলের কুঠির তেতালাটাও কম নয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য— চারদিকে এখন ধানের ক্ষেতে সবুজের বন্যা

লেগেছে— চোখ দুটো দিগন্ত পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে বেড়াবে এই আমার সাধ। ইতি ২৬-১০-৩৬'।

'লেনর্ড রোড'— এলমহার্স্টের নামাঙ্কিত শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের পথ।

'নতুন বাড়িতে'— 'পুনশ্চ' বাড়ি।

পত্র ৮৭। রবীন্দ্রনাথ ২৭ জুলাই (১৯৩৭) রাত্রে পতিসরে পৌঁছেছিলেন। পুণ্যাহ ছিল ২৮ জুলাই। এই সূত্রে চিঠির অনুমিত তারিখ ২৮ জুলাই।

'আজ শুনতে পাই পুণ্যাহ'— পুণ্যাহের এইদিন মুসলমানবহুল প্রজাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার ঘটা দেখে সঙ্গী 'সুধোড়িয়া' (সুধাকান্ত রায়চৌধুরী) অভিভূত হয়ে লিখেছিলেন, 'অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে— আনন্দের অশ্রুবাষ্প। এ দৃশ্য দেখতে পাব কোনোদিন ভাবতে পারি নি।' প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪।

'বর্ষামঙ্গলের আয়োজন আশা করি এগোচ্চে'— ১৫ অগস্ট শান্তি-নিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' হবার কথা ছিল, হতে পারে নি। 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে ৪ এবং ৫ সেপ্টেম্বরে সেই উৎসব হয়েছিল। পরবর্তী সূত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৮৮। বর্ষামঙ্গলের প্রস্তুতির সূত্র থেকে চিঠির তারিখ অনুমিত। ১৫ অগস্ট শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর একমাত্র পুত্র বীরেশ্বরের আকস্মিক মৃত্যুতে অনুষ্ঠান স্থগিত থাকে। পরে কলকাতার 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী সূত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৮৯। 'দলের সঙ্গে'— চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের দল। কলকাতার 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ।

'মহাভারত লেখার... নিয়েছি'— এই প্রসঙ্গে কবি ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮-এ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন, 'সকলের চেয়ে বিরাট একটা তাগিদ আমার মাথার উপরে ঝুলচে— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্বীকার করেছি মহাভারতের উপর একখানা বই লিখব।' দেশ,

বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১৬, পৃ. ২৫৯।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে (MS 159, p. p. 1-7) ১৯৩৮ সালের একটি ডায়েরীর Memoranda অংশে মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু খণ্ড খণ্ড চিন্তা বিধৃত রয়েছে, যেমন 'গঙ্গা একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে মানবী... অলৌকিকে লৌকিক মিশাল' ইত্যাদি। ৮৯-সংখ্যক চিঠি লেখার প্রায় দেড় বছর পরে মহাভারত সম্পর্কে কবি মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন 'ও এক সমুদ্র। ওর মধ্যে যে কত কি আছে তার অন্ত নেই। একদিকে যেমন চিন্তা সুদুরপ্রসারী, গভীর, অন্যদিকে তেমনি অগাধ ছেলেমানুষি, ছেলেমানুষির শেষ নেই— পাশাপাশি রয়েছে গীতা আর ঠাকুরমার ঝুলি'। মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১৩৬৪, পৃ. ১৯৬-৯৭। এই সময়ে সুধীরচন্দ্র করকে কবি লেখেন 'চোখের দুর্বলতার জন্যে কোমর বেঁধে লিখতে পারছি নে— ছোটো অক্ষরের মহাভারত যেন কাঁকর বিছানো রাস্তা, তার উপর দিয়ে চোখ চালানো আরামের নয়।'— সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা, ১৯৫১, পৃ. ৮৯। শারীরিক কারণে মহাভারত সম্পর্কে বই লেখা কবির আর হয়ে ওঠে নি।

'মেয়েগুলোকে... থাকবে না'— সুরেন্দ্রনাথ কর ও সুধীরা দেবীর নেতৃত্বে এবং কালীমোহন ঘোষের ব্যবস্থাপনায় সংগীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের জন্য কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গ রওনা হয়েছিলেন ৯ মার্চ। খুলনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, শিলং প্রভৃতি স্থানে তাঁরা এই নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন। দ্র. *V. B. News*, April 1938, p.74 এবং শান্তিদেব ঘোষ, 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য', ১৩৯০ পৃ. ২২০-২১।

পত্র ৯০। 'খুলনা থেকে... যাত্রীদের'— পূর্ব পত্রে উল্লিখিত পূর্ববঙ্গ থেকে প্রত্যাগত নৃত্যনাট্যের দল।

'সেই সময়ে ... অবস্থিতি'— বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে। এই চিঠি লেখার দুদিন আগে, ৫ মার্চ তিনি নির্মলকুমারীকে লিখেছিলেন— 'অভিনয়ের কুষ্টিতে কুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে— দিনক্ষণ

নিয়ে কেবলি চলচে গোলমাল। অবশেষে স্থির করেছি পরশু অর্থাৎ সোমবার যাব। আপাতত তোমারই আশ্রয় স্বীকার করেছি। তারপর মেয়েরা যখন খুলনা থেকে ফিরে এসে কলকাতার অভিনয়ের জন্য তৈরি হবে তখন কয়েকদিন তাদের নিকটবর্তী হতে হবে। তার দেরি আছে।' দেশ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১৬, পৃ. ২৫৯।

পত্র ৯২। মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ি থেকে লিখিত। প্রতিমা দেবী আছেন কালিম্পং-এ।

'বাড়িটা তো রাজবাড়ি ... ইংরেজের বসতি'— মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামী ডক্টর মনোমোহন সেন গভর্নমেন্ট সিন্‌কোনা বিভাগের অধ্যক্ষ। সেই অধ্যক্ষের জন্য নির্ধারিত সুদৃশ্য এবং সুব্যবস্থাসম্পন্ন এই বাড়ি।

পত্র ৯৩। মংপু থেকে লিখিত।

পত্র ৯৪। 'অনিল... সংকল্প'— মংপু থেকে কবির কালিম্পং-এ যাওয়ার ইচ্ছে। 'লক্ষ্ণৌয়ের ঝুনু'— চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগিনেয়ী সাহানা দেবী। রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল অসামান্য। অগস্ট ১৯২৩-এ কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' নাটকের যে অভিনয় হয় (কবি জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন) কবিতাতে ১১টি নতুন গান সংযোজন করেন এবং এই ১১টি গানই তিনি এককভাবে সাহানা দেবীকে (ভৈরবীর ভূমিকায়) দিয়ে করিয়েছিলেন।

'কল্পিতা দেবী'— লেখিকারূপে প্রতিমাদেবীর ছদ্মনাম। 'প্রবাসী' ও 'কবিতা' পত্রিকায় এই নামেই তাঁর রচনা বের হত।

পত্র ৯৫। 'দিলীপ... লাগিয়েছিল'— এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপ কুমার রায়ের পত্রাংশ জুলাই ১৯৩৮ উল্লেখযোগ্য, 'যাব কি— ১৭ জুলাই তিনচার দিনের জন্যে? হাসি, তার বাবা, মা ও মাসি আমার সঙ্গ নিতে চান। আশা করি আপনার খুব অসুবিধে হবে না? জানাবেন একটু দয়া করে পত্রপাঠ?'

এই চিঠির ভিত্তিতে এবং বৃষ্টি ও বৃষ্টি ভালো লাগার প্রসঙ্গে চিঠিটি জুলাই মাসে শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত বলে অনুমিত।

পত্র ৯৬। একই তারিখে ২৪-৮-৩৮ এ কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন,

'সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কালিম্পং যাব মনে করচি— দেহের অবসাদ মনকেও আক্রমণ করেছে।... বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল দিচ্চি— উৎসাহ পাচ্চি নে মনে।'

'বর্ষামঙ্গলের জন্যে পরিশোধের রিহর্সল'— সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যে 'পরিশোধ'-এর অনুষ্ঠান হয়েছিল, তার আয়োজন।

পত্র ৯৭। কবির চোখ দেখানোর জন্য কলকাতায় যাওয়া ও ফলতায় থাকার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে নির্মলকুমারীকে লেখা ২৫-এ সেপ্টেম্বরের চিঠিতেও। দ্র. দেশ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১৯, পৃ. ৪৯৮।

পত্র ৯৮। সিন্ধি মেয়েটি— তৎকালীন শিক্ষাভবনের ছাত্রী ভিশ্‌নী জাগ্‌সিয়া (Visni Jagasia)।

'শান্তির সঙ্গে রফা করে নিয়েছি'— ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'বর্ষামঙ্গল'-এর প্রসঙ্গ। শান্তিদেব পরে লিখেছেন, 'বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান করা নিয়ে এবারে আরম্ভে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা দূর হওয়ার পর, অল্পদিনের চেষ্টায় নাচ ও গান তৈরী করে, গুরুদেবের সামনে কদিন মহড়া দিই।' শান্তিদেব ঘোষ, 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য', ১৩৯০ পৃ. ২২৫।

পত্র ৯৯। 'ডিসেম্বরের ... চলতে হবে'— এই কার্যসূচী শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হয় নি।

পত্র ১০০। ১৩৪৫ সালে বিজয়া দশমী ছিল ১৭ আশ্বিন বা ৪ অক্টোবর ১৯৩৮। এই চিঠি নবমীতে লেখা বলে এর তারিখ ১৬ আশ্বিন ১৩৪৫ বা ৩ অক্টোবর ১৯৩৮।

'বই ছাপার ব্যাপারে'— সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রকাশিতব্য কবির 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থটির ভূমিকা রচনায় কবি ব্যস্ত।

'খুকু'— অমিতা সেন। কিছুকাল পরে তিনি শান্তিনিকেতনে সংগীত-ভবনের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন।

'সুকুমার... দিয়েছেন'— সরকারী রেজিস্ট্রেশন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌সপেক্টর জেনারেল সুকুমার চ্যাটার্জী এই সময়ে শ্রীনিকেতনের

'পল্লী সংগঠন বিভাগে'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

'স্টেলা ক্রামরিশের... জানি নে'— রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত স্টেলা ক্র্যামরিশের ফাইলে দেখা যায় ১৯.১.৩৮-এ ৪, এসপ্লানেড ইস্ট থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন 'If you will allow me to see some more of your paintings, I shall be happy and grateful'। এ থেকে মনে হয় এর আগেই কলকাতায় তিনি কবির কিছু কিছু ছবি দেখেছিলেন বা দেখবার জন্য নিয়েছিলেন। পুনরায় ২৮.৩.৩৮-এ তিনি কবিকে লেখেন, 'Since I called on you when you were in Calcutta last time, I have been longing to go to Santiniketan'। হয়তো এরপর তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কবির কাছ থেকে কিছু ছবি নিয়ে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্টেলা ক্র্যামরিশ এর আগেও রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখতে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির একটি চিঠিতে রয়েছে— 'কাল এখানে স্টেলা ক্র্যামরিশ আসবে। আর একবার আমার ছবি দেখবে। কিছু বোধ করি লেখবার ইচ্ছে আছে।' ১২ অগ্রাণ ১৩৩৬, ২৮ নভেম্বর ১৯২৯।

আরো উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে ও কলাভবনে রক্ষিত নথিপত্রে স্টেলা ক্র্যামরিশকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের ছবির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

পত্র ১০১। "নবজাতক" কাব্যগ্রন্থে 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটির রচনা কাল দেওয়া আছে, 'বিজয়া দশমী ১৭ আশ্বিন ১৩৪৫' (৪ অক্টোবর ১৯৩৮)। এই পত্রেও 'বিজয়া দশমী' (১৩৪৫) হিসেবে রচনাকাল সূচিত। একই দিনে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকেও চিঠি দিয়েছেন (চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১২৩) যাতে 'বিজয়া দশমী' হিসেবে পত্ররচনার কাল সূচিত। চিঠিপত্র ৫-এর সম্পাদক উক্ত চিঠির ওপরে 'পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন, ৪ অক্টোবব, ১৯৩৮' বলে উল্লেখ করেছেন। এইসব সূত্রে ১০১ সংখ্যক পত্রটি ৪ অক্টোবর, ১৯৩৮-এ লিখিত বলে অনুমিত।

পত্র ১০২। একই বিষয় নিয়ে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ৭ অক্টোবর ১৯৩৮-এর

লেখা চিঠি থেকে এই পত্রের কাল নির্ধারিত। দ্র. দেশ, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ১৯, পৃ. ৪৯৮।

'উদয়নে... পড়েছে'— ৬ অক্টোবর ১৯৩৮-এ শান্তিনিকেতনে মৈত্রেয়ী দেবীর আকস্মিক আগমন এবং তাঁকে মংপুতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি।

পত্র ১০৩। এই পত্রের তারিখ নির্ণয়ের ব্যাপারে ৮ অক্টোবর ১৯৩৮-এ রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির চিঠি উল্লেখ্য, 'কল্যাণীয়েষু, মৈত্রেয়ী এসে কিছুতেই ছাড়ল না।... এখান থেকে নড়তে মন যাচ্চে না। কিন্তু এই মেয়েটির জেদ এড়ানো শক্ত। আমাকে মংপুতেই বন্দী করবে। সেই জন্যই ঐ আমাকে খরচ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মংপু জায়গাটা আমার ভালোই লাগে— কিন্তু কালিম্পং এড়িয়ে ওখেনে যাওয়া অদ্ভুত ঠেকচে।' (চিঠিটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে সংরক্ষিত)। ৭ অক্টোবর ছিল শুক্রবার। এই পত্রে শনিবারের উল্লেখ হেতু পত্রটি ৮ অক্টোবর ১৯৩৮-এ লিখিত মনে করা যেতে পারে।

কবির অন্যমনস্কতায় ৮-১০-৩৮ এর পরিবর্তে ৯-১০-১১ লিখিত হয়েছে।

পত্র ১০৪। মৈত্রেয়ী দেবী পরিকল্পিত কবির মংপু ভ্রমণ শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। কবি কলকাতা পর্যন্ত গিয়ে মত পরিবর্তন করেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার আগে কলকাতা থেকে কবি ১০ অক্টোবর ('৩৮) এই চিঠিটি লেখেন।

'কাল সকালের... করব'— প্রকৃতপক্ষে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন ১২ অক্টোবর। দ্র. *V. B. News*, Nov. 1938, p. 34।

পত্র ১০৫। 'যাওয়া... ধবলীতে'— পূর্ববর্তী দুটি পত্রে উল্লিখিত মংপু যাওয়া হয় নি কবির। ফিরে এসে তিনি বাস করছেন 'পুনশ্চ' বাড়িতে। 'শ্যামলী'র অনুষঙ্গে কৌতুক করে 'পুনশ্চ' বাড়িটির 'ধবলী' নামকরণ অন্য সব চিঠিতেও পাওয়া যায়— 'ছুটি ফুরোলে শান্তিনিকেতনে কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজব জানি নে, শ্যামলী না ধবলী না আর কোথাও।' চিঠিপত্র ৪, ১৩৫০, পৃ. ২৩২। পুনরায়, 'ধবলীতে এসেছি নিজের কোণের টানে,

ঈর্যা করতে পারি এমন ঠাণ্ডাতর জায়গা কাছাকাছি কোথাও নেই। ইতি ১৬-১০-৩৮'— নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা পত্র, দেশ, ২৯ বর্ষ, সংখ্যা ১৯, পৃ. ৪৯৮।

পত্র ১০৬। পত্রটি শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত।

পত্র ১০৭। কবি এবারে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি হয়েছিলেন ১৭ মে থেকে ১৭ জুন (১৯৩৯) পর্যন্ত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. মৈত্রেয়ী দেবী, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', ১৩৬৪।

পত্র ১০৮। এবারে কবি কলকাতা থেকে রওনা হয়ে মংপু পৌঁছেছেন ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৩৯)।

'গাড়িখানা... করছিলেন'— প্রকৃত বিবরণের জন্য দ্র. মৈত্রেয়ী দেবী, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', ১৩৬৪, পৃ ১৫৩-৫৪।

পত্র ১০৯। মংপু থেকে লেখা।

'মেয়েদের গৃহনির্মাণের... কী খবর?'— প্রতিমা দেবী তাঁর ১৮ সেপ্টেম্বরের (১৯৩৯) চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে মেয়েদের বোর্ডিং বাড়ি তৈরি শুরু হয়েছে। 'পুনশ্চ' বাড়িটি কবির পছন্দসই হয় নি বলে তখন কবির জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছিল।

'গল্প এক আধটা লিখব প্রতিশ্রুত ছিলুম... থম্‌কে থম্‌কে লেখা'— এই সময়ে 'শেষ কথা' গল্পটি লিখতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পটি শেষ হয় ৪ অক্টোবর তারিখে। পরে তা আবার সংশোধিত হয়েছে।

পত্র ১১০। পত্রটি মংপু থেকে লিখিত।

'তোমার এবারকার লেখাটাতে'— পরবর্তী পত্র-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

'আমার গল্প লেখার কাজ'— পূর্বসূত্রে উল্লিখিত 'শেষ কথা' গল্প।

পত্র ১১১। পত্রটি মংপু থেকে লিখিত।

'তোমার লেখাটা'— এই রচনাটি সম্ভবত প্রবাসী পত্রিকায় (মাঘ ১৩৪৬) প্রকাশিত গল্প 'মেজ বৌ'। কল্পিতা দেবী এই ছদ্মনাম ব্যবহৃত। কল্পিতা দেবী ছদ্মনামে প্রতিমা দেবীর আরো যে দুটি কবিতা এই বছর প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল তাহল 'নিশি পাওয়া' প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬,

পৃ. ৮৮; এবং 'অন্ধকারে' প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ. ৫৪২।

'তুমি তো... অভিমুখে'— পালিতা কন্যা নন্দিনীর বিবাহ সম্বন্ধ রচনা উপলক্ষে প্রতিমা দেবীর বোম্বাই যাত্রা।

'গল্পটা শেষ'— ১০৯-সংখ্যক চিঠির সূত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ১১২। 'অবাধে... হোক'— বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী অজিত সিং খাটাউর সঙ্গে দৌহিত্রী নন্দিনীর বিবাহ সংঘটন।

'আমার নতুন... চল্‌চে'— নির্মীয়মান 'উদীচী' বাড়ি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রতিমা দেবীর দুটি পত্রে পাওয়া যায়— 'আপনার বাড়ীর ভিত পত্তন হয়েছে, কাল থেকে দেখছি মাটী খুঁড়ছে। অনেকগুলি শিউলি গাছ কাটা গেছে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)। 'আপনার নতুন বাড়ীর জন্য ভিত আরম্ভ হয়েছে (২ অক্টোবর ১৯৩৯)।

পত্র ১১৩। চিঠিটি কালিম্পং থেকে লিখিত।

'লোকশিক্ষা সংসদের... manuscript'। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ পশুপতি ভট্টাচার্যের 'আহার ও আহার্য'-এর (১৩৪৭ ফাল্গুন) পাণ্ডুলিপি। পরবর্তীকালে বইটির তৃতীয় কভারে রবীন্দ্রনাথের অভিমত মুদ্রিত হয়েছিল : 'কল্যাণীয়েষু পশুপতি, পরিভাষা-বর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত, পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে বলে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশে কুপথ্যজীর্ন পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আশা করি তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে আপন অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রো। ইতি ৬।১।৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'সুকুমার সেনের ... বই' — সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, ১৯৪০)-এর ভূমিকায় উল্লিখিত হয় :

'বইটির মুদ্রিত কতক অংশ (৭৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে অভিমত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন তাহা বহুমান্য শিরোভূষণ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।' সুনীতিকুমারের কাছে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রটিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হয় :

Mangpoo P.O.
(Darjeeling Dist.)

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকে দৃষ্টিক্ষীণতাবশত ছাপার বা লেখার অক্ষর পড়ে ওঠা আমার পক্ষে দুঃখসাধ্য হয়েছে। তবু ডাক্তার সুকুমার সেনের রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র মুদ্রিত যে অংশটুকু আমার হাতে এসেছে ধীরে ধীরে তা আমি পড়ে শেষ করেছি। শেষ পর্যন্ত আমার ঔৎসুক্য জাগরূক ছিল। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র ইতিপূর্বে আমি পড়ি নি। গ্রন্থকার তাঁর বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তকগুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন· তাতে করে তাঁর গ্রন্থ একসঙ্গে ইতিহাসে এবং সংকলনে সম্পূর্ণরূপ ধরেছে। সেই কারণে এই গ্রন্থ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্যরস সন্ধানীদের পরিতৃপ্তি দেবে। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্ণিত হওয়াতে রচনার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই। ইতি ৪-৫-৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র ১১৪। প্রতিমা দেবীর পরিচালনায় শান্তিনিকেতনে ১৩৪৭-এর বর্ষামঙ্গল উৎসবের প্রস্তুতি সুরু হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য প্রতিমা দেবীকে উৎসবের পূর্বেই কালিম্পং চলে যেতে হয়েছিল। পত্রে উল্লিখিত বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠান হয়েছিল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪০-এ।

পত্রটি এই দিনেই লেখা। এটি প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' (১৩৪৯) গ্রন্থে সংকলিত।

'মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায়'— কবি এবার শেষবারের মতো কালিম্পং যাত্রা করেন ১৯-এ সেপ্টেম্বর (১৯৪০)। পরে অসুস্থ অবস্থায় তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ২৯-এ সেপ্টেম্বর।

'গল্পটা' ... 'ল্যাবরেটরি'— আনন্দবাজার শারদীয়া সংখ্যায় (১৫ আশ্বিন ১৩৪৭) গল্পটির প্রথম প্রকাশ, পরে এটি "তিনসঙ্গী" গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ১১৫। ১১৫-সংখ্যক চিঠিটি প্রতিমাদেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ চিঠি। ১৯৪১-এর ৩০-এ জুলাই বেলা সাড়ে দশটায় জোড়াসাঁকোয় তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার হয়। অস্ত্রোপচারের আধ ঘণ্টা আগে রানী চন্দকে দিয়ে তিনি এই চিঠিটি লেখান এবং শেষবারের মতো লেখনী ধারণ করে 'বাবামশায়' কথাটি লেখেন। দ্র. প্রতিমা ঠাকুর, নির্বাণ, ১৩৪৯, পৃ. ৬৯।

ব্যক্তি-পরিচিতি

পরিচিতির শেষে প্রাসঙ্গিক পত্রসংখ্যা উল্লিখিত

অজিত	অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬ ১৯১৮), শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের আদর্শবাদী, কৃতী অধ্যাপক। তাঁর রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯১২) ও 'কাব্যপরিক্রমা' (১৯১৫) রবীন্দ্র বিষয়ক মূল্যবান আকর গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ— 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯১৬) 'খ্রীষ্ট' (১৯১১) ব্রহ্মবিদ্যালয় (১৯১১), বাতায়ন (১৯১৫)। ক্ষিতিমোহন সেন -সংকলিত কবীরের দোঁহার অনেকগুলিই তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এরই ভিত্তিতে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *One Hundred Poems of Kabir*। শিক্ষকতা ও সাহিত্য-চর্চা ছাড়া সংগীত ও অভিনয়েও ছিল তাঁর একান্ত অনুরাগ ও দক্ষতা/ ১, ৩।
অজিন	অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র/৫৯।
অনিল	অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬-৭৬), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৩২ সালে অধ্যাপক হিসেবে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন এবং ১৯৩৩ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৮-৫২ সাল পর্যন্ত তিনি শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন/৭৭, ৯০, ৯৪, ৯৫।
অনিলানী	অনিলকুমার চন্দের স্ত্রী রানী চন্দ। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে তিনি যে-সব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম— 'ঘরোয়া' (১৯৪১) 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) 'গুরুদেব' (১৯৬২), 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬২) উল্লিখিত প্রথম বইদুটি অবনীন্দ্রনাথের বলা, রানী চন্দের হাতে লিপিবদ্ধ/৯৯।
অন্নদা	অন্নদাচরণ মজুমদার, ঠাকুর এস্টেটের কর্মী/১০৩।
অপূর্ব	অপূর্বকুমার চন্দ (১৮৯২-১৯৬৬), অনিলকুমার চন্দের অগ্রজ,

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক। ১৯২৯ সালে কবির জাপান ও ক্যানাডা ভ্রমণকালে তিনি সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর সঙ্গী হন/ ৪৩, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮।

অবন — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, বিংশ শতকের প্রথম ভাগের অদ্বিতীয় শিল্পী, শিল্পাচার্য ভারতীয় শিল্পের নব-জাগরণের উদ্‌গাতা। অনবদ্য বাংলা গদ্যের রচয়িতা অবনীন্দ্রনাথের রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯১৫), 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১), 'আলোর ফুলকি' (১৯৪৭), 'মাসি' (১৯৫৪) ; 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯), 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১), 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৭)। 'শ্রুতিধরী' রানী চন্দের লেখনীতে ধৃত তাঁর দুটি স্মৃতিকথা 'ঘরোয়া' (১৯৪১) আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪)। আকারনিষ্ঠ বিমূর্ত রূপসৃষ্টি 'কুটুমকাটাম' তাঁর শেষ জীবনের একটি অনন্য অবদান/ ১৮।

অবলা বসু — আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর (১৮৫৮-১৯৩৭) স্ত্রী লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১)। স্ত্রীশিক্ষা প্রসার এবং বিধবা নারীদের অর্থকরী শিক্ষা দেবার চেষ্টায় নারীশিক্ষাসমিতি গঠন করেছিলেন। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন/ ৫১।

অমিতা — বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অমিতা ঠাকুর (১৯১০-৯২)। অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) ও লাবণ্যলেখার কন্যা এবং অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী/ ৬৪।

অমিয় — কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬)। দীর্ঘকাল কবির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি অধ্যাপনাও করেছেন। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে কবির বিদেশ

ভ্রমণকালে তিনি ছিলেন কবির অন্যতম সঙ্গী। কবির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন পত্রালাপের জন্য দ্রষ্টব্য 'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ড (১৯৭৪) এবং শ্রীনরেশ গুহ সম্পাদিত 'কবির চিঠি কবিকে' (১৯৯৫) /৫৮, ৬৯, ৭৬, ৯৫, ৯৯, ১০০।

অমিয়া — অমিয়া ঠাকুর (১৯০৮-৮৬), সংগীত রসিক সুরেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা, হৃদিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, সেকালের বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। রবীন্দ্রসংগীত তিনি শিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই /৭১।

অমূল্যবাবু — অমূল্যকৃষ্ণ বিশ্বাস, দ্র. পত্র-পরিচয় ৬৫/৬৫।

অম্বালাল — অম্বালাল সারাভাই, ধনী গুজরাতি ব্যবসায়ী, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিক্রম সারাভাই-এর পিতা। এঁর পিতা ভোলানাথ সারাভাই ছিলেন বোম্বাই-এর প্রার্থনা সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য /৩৩, ৫০।

অরবিন্দ (১) — অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০), বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা, দার্শনিক, কবি, পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। দ্র. পত্র-পরিচয় ৪৫/৪৫, ৪৬।

অরবিন্দ (২) — অরবিন্দ বসু (১৮৯৫-১৯৭৭), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, আনন্দমোহন বসুর পুত্র। দ্র. পত্র-পরিচয় ৬১/৬১।

অসিত — অসিতকুমার হালদার (১৮৯০-১৯৬৪), দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্র। কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে ও অবনীন্দ্রনাথের কাছে তিনি চিত্রকলার পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে চিত্রকলার শিক্ষকরূপে যোগ দেন। পরে তিনি জয়পুর শিল্প বিদ্যালয়ের এবং লক্ষ্ণৌ সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। শান্তিনিকেতনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন মুকুল দে, রমেন চক্রবর্তী, প্রতিমা দেবী /৭৩।

আগা খাঁ — তৃতীয় আগা খাঁ (১৮৭৭-১৯৫৭), ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। আগা খাঁ একটি উপাধি। তৃতীয় আগা খাঁর প্রকৃত

নাম মহম্মদ শাহ্। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি বিংশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নে এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৩০-৩১ সালে তিনি লন্ডনের 'গোলটেবিল বৈঠকে' আহূত হয়েছিলেন এবং ১৯৩৭-এ 'লীগ অব নেশনস্'-এ অ্যাসেমব্লির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শান্তিবাদী এই মানুষটি ছিলেন পৃথিবীর বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম/৬১।

আন্দ্রে — ফরাসী শিল্পী আঁদ্রে কারপেলেস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ দীর্ঘকালের। কারপেলেস প্রথমে ১৯২২ সালের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং কলাভবনে অধ্যাপিকার কাজে যোগ দেন/৪৯, ৬০, ৭৭।

আরিয়াম (উইলিয়মস) — ই. এইচ. আর্যনায়কম, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক। ইনি ছিলেন সিংহল দেশীয় তামিল। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২৫ সালে/৩৩, ৪১, ৪৪, ৬৩, ৬৯।

আলু (গোলআলু) — সচ্চিদানন্দ রায়, আশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র/৭৪, ১১০, ১১১, ১১৩।

আশা — ফণিভূষণ অধিকারীর চার কন্যার একজন। অন্য তিনজন রাণু, শান্তি, ভক্তি। আশা দেবী— পাঠভবনের শিক্ষিকা। ১৯৩১ সালের (৩ ফেব্রুয়ারি) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ফণিভূষণকে লিখেছিলেন, 'আশা সমস্ত বিদ্যালয়ের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে আছে, দেখে আনন্দ হয়।' আশা আরিয়ামের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁরা ১৯৩৩ সালে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন/৭৬।

উমাচরণ — রবীন্দ্রনাথের পরিচারক/২, ৭, ১৭।

একজন বিখ্যাত মহিলা	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (১৮৯০-১৯৭৯), দ্র. পত্র-পরিচয় ২৮/২৮
এন্ড্রুজ	চার্লস্ ফ্রিয়ার এন্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০)। কবির সঙ্গে এন্ড্রুজের প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরিচয় ১৯১২ সালে লন্ডনে গীতাঞ্জলি কাব্য পাঠের আসরে। ১৯১৩-র ফেব্রুয়ারিতে এন্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে প্রথম আসেন ও অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এখান থেকেই ডিসেম্বরের ৩ তারিখে কবির শুভেচ্ছা নিয়ে পিয়ার্সন ও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন সেখানকার দুর্গত ভারতীয়দের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের জন্য এবং সেখানেই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের কল্যাণকর্মে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং আমৃত্যু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাঁর স্মরণার্থে শান্তিনিকেতনের একটি পল্লী ও একটি হাসপাতাল তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে এখনও বর্তমান। কবিই তাঁকে বিশেষিত করেছিলেন 'দীনবন্ধু' রূপে। তাঁর মহিমাময় জীবনের বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Benarsidas Chaturvedi and Marjorie Sykes: *Charles Freer Andrews* (1949), Hugh Tinker, *The Ordeal of Love। C. F. Andrews and India* (1979)/১৮, ৪৩, ৪৪।
ওকুরা	কবির জাপানি বন্ধু/৫৯।
কমলা	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কমলা দেবী/২৪।
কান	অ্যালবার্ট কান, ফ্রান্সের বিখ্যাত ধনী ও শিল্পরসিক। দ্র. পত্র-পরিচয় ৩২/৩২
কানাই	রবীন্দ্রনাথের পরিচারক/১১৩।
কালিদাস	প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তাদেবীর স্বামী। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, *Art and Archaeology Abroad* (1937), *India and the Pacific World* (1942),

Tagore in China (1944), *Discovery of Asia* (1957), *Greater India* (1960) কবির সঙ্গে একশো দিন (১৩৯৪) /২৪, ২৬।

কালীমোহন — কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২-১৯৪০)। শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের পিতা/৭৪।

কালু — রবীন্দ্রনাথের পরিচারক/৮৭।

কিশোরী — কিশোরীমোহন সাঁতরা (?— ১৯৪০)। ১৯৩২ এপ্রিল থেকে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সহকারী সচিব, কর্মসচিব তখন রথীন্দ্রনাথ। প্রকাশন বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ-তত্ত্বাবধান করেন /৭৪, ৯০।

ক্রামরিশ, স্টেলা — প্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক স্টেলা ক্র্যামরিশ (১৮৯৬-১৯৭৩), রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতী কলাভবনে আসেন। চিত্রবিদ্যা-সম্পর্কিত তাঁর ক্লাসে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই যাতে উপস্থিত থাকেন সেজন্য রবীন্দ্রনাথের বিশেষ নির্দেশ ছিল /১০০।

ক্ষিতিবাবু — পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০), রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন ১৯০৮ সালে। পরে তিনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ও উপাচার্য হিসেবেও কাজ করেন। তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় মধ্যযুগের সাধকদের সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক কাজের জন্য। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম— 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা' (১৩৩৭), 'দাদূ' (১৩৪২), 'ভারতের সংস্কৃতি' (১৩৫০), 'ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত-সাধনা' (১৩৫৬) *Medieval Mysticism of India* (1936)। তাঁর সম্পাদিত 'কবীর' (১৩১৭) অবলম্বনেই রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত *One Hundred*

	Poems of Kabir (1915) প্রকাশিত হয়। ক্ষিতিমোহনের *Hinduism* (1961) গ্রন্থটি ফরাসি, জার্মান ও ডাচ ভাষায় এবং অন্য কিছু গ্রন্থ হিন্দি গুজরাতি ও অসমিয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমৃত্যু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ছিল তাঁর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক /২৫।
ক্ষিতীশ সেন	ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য যখন তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটির অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। 'এখানকার একজন ছেলে 'রাজা' তর্জ্জমা করে দিয়েছেন'— এই মর্মে জগদানন্দ রায়কে লিখছেন (২ কার্তিক ১৩১৯) রবীন্দ্রনাথ। *The King of the Dark Chamber* নামে গ্রন্থাকারে এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে /৫০।
খুকু	অমিতা সেন (১৯১৪-৪০), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ও পরে সংগীতভবনের অধ্যাপিকা/ ৯০।
গগন	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮), গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র এবং অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ। বিংশ শতকের প্রথমার্ধের এক বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রভারতী, শান্তিনিকেতনের কলাভবন, রবীন্দ্রভবন ও কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর চিত্রাবলী রক্ষিত। গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্রও রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত / ১৮।
গাঙ্গুলি	প্রমোদলাল গাঙ্গুলি, শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অতিথিশালার তত্ত্বাবধায়ক /৭, ৯।
গোপাল	ঠাকুর এস্টেটের সরকার /৫০।
গোবিন্দ	শান্তিনিকেতনের কর্মী /৭০।
গোরা	গৌরগোপাল ঘোষ (১৮৯৩-১৯৪০), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরবর্তীকালের একজন বিশিষ্ট কর্মী। শান্তিনিকেতনের বর্তমান 'গৌর প্রাঙ্গন' তাঁরই নামে চিহ্নিত /৬৮, ৬৯, ৭০।

ঘুরণ — জনৈক পরিচারক/৭।

চন্দ্রেশ্বরানন্দ — 'উষার আলো' গ্রন্থ প্রণেতা স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ/৭৯।

চারুবাবু — চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৩-১৯৬১), পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় অনেক লিখেছেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের দায়িত্বে ছিলেন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত /৯৫।

চিত্রিতা — চিত্রিতা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবীর ভগিনী, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কন্যা /৯৫।

জ্ঞান — জ্ঞান গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা /৭।

জ্যোতিদাদা — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র, সাহিত্যিক, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতবিদ, চিত্রশিল্পী ও সুরকার। বাংলাভাষায় আকার মাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবক। 'হিন্দুমেলা' ও 'সঞ্জীবনী সভার' সঙ্গে সংশিষ্ট থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নানা স্বদেশী শিল্পোদ্যোগে সক্রিয় হয়েছিলেন। সংস্কৃত মারাঠি ও ফরাসি ভাষার চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত 'পুরু বিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), পরে 'অলীকবাবু' (১৯০০) প্রভৃতি নাটক খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল /৭৯।

ঝগড়ু — পরিচারক /৮৪।

ঝুনু — সাহানা দেবী (১৮৯৭-১৯৯০), প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগিনেয়ী /দ্র. পত্র-পরিচয় ৯৪।

টাকাগাকি — নকুজো তাকাগাকি (Nakujo Takagaki)— জাপান থেকে আনীত জুজুৎসু বিশারদ। জুজুৎসুর শিক্ষক হিসেবে দুই বছরের চুক্তিতে তিনি বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিলেন নভেম্বর ১৯২৯ সালে। দ্র. পত্র-পরিচয় ৬৬/৬৬।

টাকার — Boyed W. Tucker (১৯০২-৭২), আমেরিকার মেথডিস্ট

	মিশনারি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে টাকার ১৯২৭ সালে বিশ্বভারতীতে ইংরেজির অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছিলেন, থেকেছিলেন ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত/ ৫০, ৫৩, ৫৬।
ঠাকুরজামাই	রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর (১৮৯৪-১৯৬৯) স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৫৪) /৯।
ঠাকুরঝি	মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯) /৭।
ঠাকুরপো	রথীন্দ্রনাথের সুহৃদ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬) /২, ৩।
ডাল	ডাল হগম্যান, আঁদ্রে কার্পেলেসের স্বামী /৬০।
দিনু	রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। দ্র. পত্র-পরিচয় ১১/১১, ৪৪, ৫৯, ৬৭, ৬৮, ৭১।
দিলীপ	দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)। প্রখ্যাত গায়ক, সুরকার ও সাহিত্যিক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র /৯৫।
দ্বিপু	দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬২-১৯২২) /৬।
ধীরেন (১)	ত্রিপুরা থেকে আগত, কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যক্ষ, শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা (১৯০১-৯৫) /৪২।
ধীরেন (২)	শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষাবিদ ধীরেন্দ্রমোহন সেন (১৯০২-৮৭) /৬৯, ৭৭, ১০৫।
নগেন (১)	নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৫৪), রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর স্বামী /৬, ১১, ১২, ১৩, ২৮।
নগেন (২)	রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী /১২।
নন্দলাল	শিল্পী নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬)। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য, গুরুর সান্নিধ্য ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন ১৯১৯ সালে এবং আজীবন সেখানেই থাকেন। ১৯২২ সাল থেকে কলাভবনের অধ্যক্ষতা করেন। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন-জাপান ভ্রমণ করেন। বিশ্বভারতী

	তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেন ১৯৫২ সালে /১৬।
নাতজামাই	শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক কৃষ্ণকৃপালনী (১৯০৭-৯২), বিবাহ করেছিলেন (১২ বৈশাখ ১৩৪৩), রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতাকে। পরে শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সেক্রেটারি এবং তারও পরে সাহিত্য আকাদেমির সেক্রেটারি হন। এঁর অন্যতম বিশিষ্ট কাজ ইংরেজিতে দ্বারকানাথের জীবনী (*Dwarakanath Tagore : A Forgotten Pioneer : A Life*, 1981) এবং রবীন্দ্রজীবনী (*Rabindranath Tagore : A Biography*, 2nd Ed. 1980) রচনা /১০০।
নাথু	পরিচারক /১১৪।
নীতু	নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১-৩২)। মীরা দেবীর একমাত্র পুত্র /২৮, ৬৬।
নীলমণি	পরিচারক বনমালীর নামান্তর /৫০, ৬১, ৬৩।
নীলরতনবাবু	সেকালের স্বনামধন্য চিকিৎসক নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) /৭০।
নুটু	রমা মজুমদার (১৯০৩-৩৫), সুগায়িকা। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভাগিনী এবং সুরেন্দ্রনাথ করের স্ত্রী /৬৭, ৬৮, ৬৯।
পট (মিস্)	লিজা ফন পট। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের অস্ট্রিয়া ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে মিস পটের পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য মিস পট তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং শিশু বিভাগের কাজে যোগদান করেন। দ্র. পত্র-পরিচয় ৩২ /৩২।
পত্তুলাল	পরিচারক /৭০।
পিসিমা	রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর সম্পর্কিত পিসিমা /৬।
পুপু, পুপে	রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা নন্দিনী (১৯২১-

১৯৯৫)। ড: গিরিধারী লালার পত্নী, শান্তিনিকেতনেরই অধিবাসী : ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৫, ৪৪, ৪৫, ৫৪, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮১, ৮৪, ১১২।

পুষ্প — পুপের কাল্পনিক বন্ধু /৬৫।

প্রতাপ — প্রতাপচন্দ্র তলাপাত্র, ঠাকুর এস্টেটের কর্মী /৬৫।

প্রতিমা — প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা দেবীর জা /৭৫।

প্রভাতের মা — রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মা গিরিবালা দেবী /৫।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ — ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত (১৮৬৫-১৯৪৪)। ভারত সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষতা করেন। বহু মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থের প্রণেতা। সমাজ সংস্কারে তাঁর মনোভাব ছিল প্রগতিশীল /৬৭।

প্রশান্ত — প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২), বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি হিসেবে তিনি কাজ করেছেন অনেককাল /২৪, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৭৩, ৭৮।

ফাউন্ডর প্রেসিডেন্ট — কবি স্বয়ং /১০৯।

বঙ্গ মহিলা — মৈত্রেয়ী দেবী /১০২।

বড়দাদা — কবি, দার্শনিক ও গাণিতিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে থাকেন আমৃত্যু। তাঁর অনুবাদগ্রন্থে 'মেঘদূত' (১৮৬০), কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যা' (চার খণ্ড, ১৮৬৬-৬৭-৬৮-৬৯), 'অদ্বৈত মতের সমালোচনা' (১৮৯৬) বিশেষভাবে উল্লেখ্য /৮।

বড়দিদি — সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা /১১।

বনমালী (লীলমণি)	রবীন্দ্রনাথের পরিচারক /৪৬, ৬৫, ৮৬, ৮৭, ১০৩, ১১২।
বব্‌লি	মাদ্রাজের অন্তর্গত তৎকালীন ববিলির রাজা /৭৬।
বসনেক	ক্রিস্টিন বসনেক (Christiana Bossenec), ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং শ্রীভবনের প্র-নেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালের প্রথমভাগে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন /৮৫।
বাকে	সংগীতজ্ঞ আর্নল্ড বাকে, দ্র. পত্র-পরিচয় ৩৫ /৩৫।
বামনজি	বোম্বাই-এর ধনী ব্যবসায়ী এম. আর. বামনজি, ১৯৩০ সালে কবির ইউরোপযাত্রার সঙ্গী /৬১।
বাসুদেব লালধারী	আশ্রমের প্রহরী।
বিনয়িনী	প্রতিমা দেবীর মা বিনয়িনী দেবী (১৮৭৩-১৯২৪)—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী /২৭।
বিবি	ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রী। বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের নিববচ্ছিন্ন চর্চা, নানা পত্রিকা সম্পাদনা, রবীন্দ্র-রচনার ইংরেজি রূপান্তর, রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি প্রণয়ন, রবীন্দ্রসংগীত ও বিভিন্ন যন্ত্র সংগীতে তাঁর দক্ষতা ইত্যাদি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতন ছিল তাঁর শেষ জীবনের বাসভূমি /১০১।
বীরলা	ধনী ব্যবসায়ী যুগলকিশোর বিড়লা, দ্র. পত্র-পরিচয় ৪৩/৪৩।
বীরেশ্বর	বিশ্বভারতীর কর্মী /৭৪।
বুড়ি	মীরা দেবীর একমাত্র কন্যা নন্দিতা দেবী (১৯১৬-৬৮) / ৬৬, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৯৯, ১০১।
বুড়ি কৃষ্ণ	নন্দিতা দেবী ও তাঁর স্বামী শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক কৃষ্ণ কৃপালনি (১৯০৭-১৯৯২) /৮৫।
বুবু	পূর্ণিমা ঠাকুর (১৯০৮-১৯৯২), দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

দৌহিত্রী, সুহৃদনাথ চৌধুরীর কন্যা এবং সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, পাঠভবনের প্রাক্তন শিক্ষিকা /৭১।

বুর্ডেট — আমেরিকা থেকে আগত গৃহ-শিক্ষিকা Miss Bourdette / ৬।

বেলা — রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮) / ২২।

ভিক্টোরিয়া — ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (১৮৯০-১৯৭৯), দ্র. পত্র-পরিচয় ৩২/ ৩২।

ভোলা — কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, সন্তোষচন্দ্রের ভ্রাতা, সরোজচন্দ্র মজুমদার /৩।

মমতা — আশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের নাতনী মমতা দেবী /৯৯।

মরিস — এইচ. পি. মরিস, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক। /৫০

মহাত্মাজি — মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় শান্তিনিকেতনে, ৬ মার্চ ১৯১৫ সালে। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের শেষ মিলন শান্তিনিকেতনে ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০-এ /৭২।

মীরা, মীরু — রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯) / ৬, ১১, ১৩, ১৪, ১৮, ২২, ২৬, ৩২, ৩৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৮৫।

মুকুল — শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯৮৯), কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র, কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ /১৪, ১৭, ১৮, ৪৯, ৬৮, ৯৬।

মৃণালিনী — মৃণালিনী স্বামীনাথন (সারাভাই), বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই-এর পত্নী /৯৬।

মেজবৌঠান — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩), পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১) /৯।

মেসোপটেমিয়া — মিস্ (লিজা ফন) পটের কবিকৃত নামান্তর /৩৫।

মোবারক	পরিচারক /৫০, ৬৫।
মৈত্রেয়ী / মাংপবী	মৈত্রেয়ী দেবী, (১৯১৪-১৯৯০), লেখিকা ও বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের কন্যা। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৩) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ। 'ন হন্যতে' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান ১৯৭৬ সালে /৭৮, ৯২, ৯৪, ১০০, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১১৪।
রথী	রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১), প্রতিমা দেবীর (১৮৯৩-১৯৬৯) স্বামী, আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি ও গো-পালন বিদ্যায় স্নাতক। তাছাড়া চিত্রকলা ও দারুশিল্পেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত' (১৩৫১, ১৩৫৮), 'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩), *On the Edges of Time* (1958)। দ্র. অনাথনাথ দাস সম্পাদিত রথীন্দ্রনাথ /২, ৫, ৬, ৯, ১১, ১২, ১৭, ১৮, ৩১, ৩২, ৩৭, ৪৩, ৫০, ৫২, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪।
রানী	নির্মলকুমারী মহলানবিশ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্ত্রী। তাঁর কাছে লেখা কবির প্রায় পাঁচশত চিঠি পাওয়া যায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে (১৩৬৩), বাইশে শ্রাবণ (১৩৬৭), 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' (১৩৭৬)/ ৪৪, ৪৮, ৫৯, ৭০, ৭৩, ৭৮, ৮৫।
রাণু	ফণিভূষণ অধিকারীর চার কন্যার একজন। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন। পরে লেডি রাণু মুখার্জি— শিল্পপতি স্যার বীরেন মুখার্জির পত্নী, ভানুসিংহের পত্রাবলীর প্রাপক /১৭৩।
রামচরিত	পরিচারক /১০৩
রোটেনস্টাইন	বিখ্যাত ব্রিটিশ শিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইন (১৮৭২-১৯৪৫), দ্র. পত্র-পরিচয় ৬১/৬১।
লসিতা	মিস লিজা ফন পটের (Lisa Von Pott) কবিকৃত নামান্তর /৩৫।

লাবণ্য	লাবণ্যলেখা গুহঠাকুরতা, পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্নী /২।
নীলমণি	পরিচারক বনমালীর নামান্তর /৩০।
লেডি বোস	আবলা বসু দ্রষ্টব্য।
লেনার্ড	Leonard Knight Elmhirst (১৮৯২-১৯৭৪), ১৯২০ সালে আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আদর্শবাদী ইংরেজ তরুণটির পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় এলমহার্স্ট ১৯২১-এ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠন বিভাগের কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে গিয়ে ডিভনশায়রের টটনেসে 'শ্রীনিকেতনের' আদর্শে 'ডার্টিংটন হল' নামে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বরাবর সংযোগ রক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ *Poet and Plowman* (1975) বিশেষ উল্লেখযোগ্য /৬১।
শান্তি (১)	রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথের ভ্রাতা শান্তি গঙ্গোপাধ্যায় /৭।
শান্তি (২)	প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯), কালীমোহন ঘোষের পুত্র, সংগীতভবনের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যক্ষ /৮৩, ৮৮, ৯৮।
শাস্ত্রীমশায়	শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য (১৮৭৮-১৯৫৭)। ন্যায় ও বেদান্তে পারঙ্গমতার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেছিলেন। ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি, তিব্বতী ও চীনা ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল। উপনিষদ, ন্যায় ও বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন /৪৭, ৬৭।
শৈলজা	বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও রবীন্দ্রসংগীতাচার্য শান্তি-নিকেতনের সংগীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার (১৯০০-১৯৯২) /৮৮।

শ্রীমতী	শ্রীমতী হাতি সিং (১৯০৩-৭৮), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৯০১-১৯৭৪) পত্নী /৭৪।
সংজ্ঞা	সংজ্ঞা দেবী (১৮৯১-১৯৭৬), প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কন্যা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সংজ্ঞা দেবী সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করে 'সাধু মা' নামে পরিচিতা হন। শান্তিনিকেতনেই তিনি দেহত্যাগ করেন /২৪।
সন্তোষ	সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬), কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীনিকেতনের বিশিষ্ট সংগঠক কর্মী, কৃষি ও গো-পালন বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ / ৩, ১২।
সমর	গুণেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র চিত্রশিল্পী সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৯৫১), গগনেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের মতো প্রখ্যাত না হলেও, ছবি আঁকায় এঁর বিশেষ একটা শৈলী-বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮।
সাগর	কালীমোহন ঘোষের পুত্র সাগরময় ঘোষ (১৯১২—?) /৭৩।
সিন্ধি মেয়েটি সুধোড়িয়া	বোম্বে থেকে আগত ভিশ্নী জাগ্সিয়া, তৎকালীন শিক্ষাভবনের ছাত্রী /৯৮।
সুকুমার	সুকুমার চ্যাটার্জী, দ্র. পত্র-পরিচয় ১০০ /১০০।
সুধাকান্ত, সুধাসমুদ্র,	সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৬৯), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, পরবর্তীকালে কবির কর্মসচিব /৫০, ৫১, ৭১, ৮০, ৮১, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৫, ১১০।
সুধীন্দ্র	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বিশিষ্ট কবি, সাহিত্য সমালোচক ও সাংবাদিক /৫০, ৫৩, ৫৬, ১০০।
সুধীরঞ্জন	সুধীরঞ্জন দাশ (১৮৯৪-১৯৭৭), শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য /৭।

সুনন্দা	রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর কন্যা /৭৭, ৮০।
সুনীতি	ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), দ্র. পত্র-পরিচয় ৩৪-৪০ /৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০।
সুবীর	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, সুরেন্দ্রনাথের পুত্র, সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫-১৯৫৩) /৫৫।
সুভোঠাকুর	সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১২-১৯৮৫), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র। হেমেন্দ্রনাথের পৌত্র, ঋতেন্দ্রনাথের পুত্র, চিত্রশিল্পী, লেখক, শিল্পসংগ্রাহক, শিল্পবিষয়ক পত্রিকা সম্পাদক /৭৯।
সুরমা	সুরমা দেবী, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী /২৪।
সুরেন	সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯৪-১৯৭০), বিশিষ্ট শিল্পী ও স্থপতি। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির অনুগামী। ১৯১৯-এ তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগদান করেন এবং পরে এর অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উদয়ন বাড়িটি এবং শান্তিনিকেতনের আরো অনেক পুরোনো বাড়ি তাঁরই পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতনেই বাস করেছেন /৬৮, ৭০, ৭৩।
সু-সী-মো	চীন ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থেকে দোভাষীর কাজ করেছিলেন এই Xu Zhimo (1895-1931)। চীনদেশের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Talks in China* (1925) বইটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর এই ভক্তকে, তাঁর নিজস্ব নামকরণে : 'My Friend Susima'। এঁরই নামে শান্তিনিকেতনে 'সুশীমা চা-চক্র' খোলা হয়েছিল। দ্রষ্টব্য পত্র-পরিচয় ৪৯/৪৯।
সুহৃদ	ডাক্তার সুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা /৭১।
সৌম্য	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪), দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র ও সুধীন্দ্রনাথের পুত্র। সৌম্যেন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী যেমন শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতচর্চায় রত ছিলেন

তেমনি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশ ও বিদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরাধীন ভারত ও জার্মানীর কারাগারে আবদ্ধ থাকেন। ১৯৩৭ সালে তিনি 'দি রেভলিউশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (R.C.P.I) নামক সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জার্মান, ফরাসি, রুশীয়, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন /৫৫, ৭৯।

স্যু — সু-সী-মো দ্রষ্টব্য।

হারাসান — জাপানি ছাত্রী /৫৯।

হিরণ — ক্ষিতিমোহন সেনের বন্ধু, ড. প্রসন্নকুমার সেনের কন্যা হিরণ্ময়ী /৩।

হেমলতা বৌমা — হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৩-১৯৬৭), দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী, শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের বালকদের 'বড়োমা'। শান্তিনিকেতনে থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা সুরু করেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামে একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। পরে সমাজ সেবায় অগ্রসর হয়ে তিনি সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'র সম্পাদিকা এবং 'বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে'র পরিচালিকার ভার গ্রহণ করেন / ১, ২, ৭, ৮।

হৈমন্তী — ডেনিশ মহিলা হিয়রডিস সিগরের (১৯০৫-১৯৯১) কবিদত্ত নাম। ১৯২৬ সালে কবির ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে আঁদ্রে কার-পেলেসের মারফৎ কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বিশ্বভারতীর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৭-এর জানুয়ারিতে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং ঐ বছরেই কবির একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই উপলক্ষে কবি একটি কবিতাও রচনা করেন। শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে একসময়ে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন /৫৮।

হেচিসান — জাপানি ছাত্রী /৬৬, ৬৭।

সাময়িক পত্রে কয়েকটি চিঠির প্রকাশের সূচী

	বর্তমান পত্র সংখ্যা
বিচিত্রা	
অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৩৪	৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০
বিশ্বভারতী পত্রিকা	
মাঘ-চৈত্র ১৩৭০	১০
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২	৯, ১৪, ১৫, ১৭, ২৪, ২৫, ৩৩, ৩৫, ৪৩
কার্তিক-পৌষ ১৩৭২	৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮
মাঘ-চৈত্র ১৩৭২	৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮১
বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৩	৭১, ৭৬, ৮৪, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১১
মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫	৪, ৮, ১১, ২১, ২৩

বিজ্ঞপ্তি

প্রতিমা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ৩-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্খ ঘোষ এটি প্রস্তুত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন বর্তমান সংকলয়িতাকে। চিঠিপত্র ৩-এর প্রথম সংস্করণ প্রয়াত পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩৪৯-এ। তখন এতে ৬৭ খানা চিঠি সংকলিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণের পত্রসংখ্যা ১১৫। এর মধ্যে ১১০টি মূল পত্র রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। সেগুলি ছাড়া ৩৬, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ সংখ্যক চিঠি চারটি রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রী' গ্রন্থ থেকে এবং ১১৫ সংখ্যক চিঠিটি প্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

চিঠির উপরে বাঁদিকে যে ইংরেজি তারিখ তা পত্রে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী নির্ধারিত। বাংলা তারিখের ইংরেজি রূপান্তর হয়েছে *100 Years Indian Calendar* (J. G. Jethabhai Limbdi Kathiawar, 3rd ed. 1932) অনুযায়ী। তৃতীয় বন্ধনীর দ্বারা চিহ্নিত তারিখ পত্রের প্রসঙ্গ থেকে অনুমিত। পত্রে অনুল্লিখিত বা ভুল তারিখের মীমাংসার সূত্র উল্লিখিত হয়েছে প্রত্যেকটি প্রাসঙ্গিক পত্রের পরিচিতি অংশে। চিঠির মধ্যে কোনো শব্দ তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত হলে বুঝতে হবে, সেটি অনুমিত। শ্রীশঙ্খ ঘোষ পত্র-পরিচিতি পরামর্শ দিয়ে আনুকূল্য করেছেন।

৯৮ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'সিন্ধি মেয়েটি'র পরিচয় পাওয়া গেছে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ ও সুবীরময় ঘোষের কাছ থেকে। এজন্য তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

মূল পত্র থেকে জেরক্স প্রেসকপি প্রস্তুতির ব্যাপারে ভবনের প্রাক্তন অবেক্ষক সনৎকুমার বাগচী এবং সর্বশ্রী তুষার সিংহ, দিলীপ হাজরা, অজিতকুমার পোদ্দার, নন্দকুমার মুখার্জী, স্বপন চক্রবর্তী এবং পত্র-পরিচিতি প্রস্তুত করবার ব্যাপারে গ্রন্থাগার কর্মী শ্রীমতী সুচিস্মিতা সরকার ও শ্রীআশিস হাজরার অকুণ্ঠ সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধনা মজুমদার